শ্রীঅতুল্য ঘোষ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের

বাঁকাস্রোত
জটিলতা
সর্বংসহা
প্রহরী
বাঁশীওলা
মহানদী
জায়া ও জননী
সুদূরের পিয়াসী
অহল্যার স্বর্গ
পরপূর্বা
দিগন্তের ডাক
শ্রেষ্ঠ গল্প

মনবিনিময়
রাগলতা
নীলাঞ্জনা
বহুমঞ্জরী
মধুকরী
রোশনাই
গল্পসঞ্চয়ন
সোহাগরাত
মেঘভাঙা রোদ
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
যখন পলাশ ফোটে
উত্তরবাহিনী (যন্ত্রস্থ)

যেখানে দুর্গম পাহাড় আর দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বনস্পতির জটাজটিল শাখাপ্রশাখায় স্তব্ধ ছায়া, অরণ্যের সুড়ঙ্গ-অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের চক্ষু জ্বলে অহর্নিশি, অকস্মাৎ হায়েনার বিকট হা-হা রবে ছিন্নভিন্ন নিশীথরাত্রির জমাট অন্ধকার, ভয়ার্ত জানোয়ারের দ্রুতপদধ্বনিতে থরথর বনভূমির হৃৎপিণ্ড—লোকালয়ের বাইরে. অনেক দূরে, নাগরিক জীবনের গণ্ডী ছাড়িয়ে সে এক বিচিত্র জগৎ। ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর! সভ্যতার কোন স্পর্শ লাগে নি আজো তার গায়ে। সেখানে প্রকৃতি আজো তেমনি আছে, অটুটযৌবনা, অক্ষতকৌমার্য—যেমন ছিল সেই সৃষ্টির আদিম যুগে। অনাঘ্রাত কুসুম এখনো ঝরে পড়ে তার দেহে, বনমর্মর ফেলে যায় দীর্ঘশ্বাস, তটিনীর কলস্বনে পাথর-চাপা বক্ষের আকুতি!

সেখানে চীহড়লতা জড়ানো শাল অর্জুন ও সোঁদালি বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে, পাহাড়ের সানুদেশে, সংকীর্ণ উপত্যকায় এখানে সেখানে, সামান্য কটিবাস মাত্র সম্বল প্রায় উলঙ্গ আজো যে সব নরনারী তীরধনুক হাতে ঘুরে বেড়ায়, হিংস্র জানোয়াররা যাদের ভয়ে ভীত, তারা প্রকৃতির আদিম সন্তান, আমাদেরই পূর্বপুরুষ। আপাতদৃষ্টিতে তাদের বর্বর, উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী আদিম-রিপুসর্বস্বজীব মনে হলেও তাদেরও জীবনে আছে একটা ছন্দ, যার অন্য নাম শৃঙ্খলা বা সমাজ-জীবন এবং তা আমাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

বনরাজিনীলা

॥ ১ ॥

ঝুলডিহী পাহাড়ের পিছন দিকটায় দুর্ভেদ্য জঙ্গল। শাল, মহুয়ার সঙ্গে অর্জুন, হরিতকী, আমলকী, আরো কত কি নাম না জানা গাছের জড়াজড়ি, ছড়াছড়ি। এরই মধ্যে কোথাও নীচু খাদ অনেকখানি, কোথাও বা কালো কালো পাথরের চাঁই উঁচু হয়ে রয়েছে গাছের ওপরে মাথা তুলে। দূর থেকে দেখলে ভুল হয়, বুঝি কতকগুলো শিশু হাতী হামাগুড়ি দিতে গিয়ে বার বার দাঁড়াবার বৃথা চেষ্টা করে অবশেষে পা পিছলে হাত পা ভেঙে পড়ে আছে এখানে ওখানে।

ওদিকটায় সাঁওতালদের বাস। অর্ধনগ্ন জংলী হলে কি হয়, তাদের ছোট ছোট ঝোপড়াগুলো পাহাড়ের ওপর থেকে বড় সুন্দর দেখায়। কালো পাথরের সঙ্গে সবুজ গাছ আর তারই ফাঁকে ফাঁকে নানা রঙের কৌটার মত ওই ঘরগুলো, মনে হয় যেন বিশ্ব শিল্পীর তুলি থেকে অজ্ঞাতসারে ঝরে-পড়া কতকগুলো রঙের বিন্দু।

আগে কেউ ভয়ে আসতো না এদিকে।

ভদ্রলোকেরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শুধু উচ্ছ্বাস করতো। ভাবতো ও যেন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির একটা খেয়াল। নেকড়ে, ভাল্লুক, হায়না থেকে শুরু করে হাতী পর্যন্ত নাকি আছে ওখানে। যখন তখন সাঁওতালদের বাঘ তাড়ানোর চীৎকার ও হাতীখেদানোর শোরগোল ওঠে জঙ্গল ভেদ করে। কখনো বা দু'একটা সাঁওতাল ছেলেমেয়েকে বাঘে ধরে নিয়ে চলে যায়। যখন কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে পাহাড় থেকে তারা ফেরে না তখন তীর ধনুক ও দলবল নিয়ে গোটা পাহাড়টা চষে ফেলে দেয় সাঁওতালরা।

কোন গহ্বর থেকে কখনো বা মানুষের দেহের টুকরো বিশেষ আবিষ্কৃত হয়। কখনো বা ব-মাল সমেত ধরা পড়ে [illegible] সেই নর খাদক, আদমখোর। চারিদিক থেকে সাঁওতালদের বিষ[illegible] কয়েকজন মেরে বেচারী তখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ আমাদেরই মত বেড়াতে বেরিয়েছে। ওরাও

অনেক বাকী। [illegible]টি দুর্ঘটনার 'কেস্' প্রতি

ওরা কি করবে না করবে, তা জেনে আমাদের[illegible], পল্লবিত হয়ে লোকের [illegible]। বলে পিছন ফিরে সবে কয়েক পা এগিয়েছেন, এ

ছোট্ট জায়গা। ওই ফুলডিহী পাহাড়টাকে ঘিরে উত্তর দক্ষিণ, পূব, পশ্চিমে আয়তন সাকুল্যে বোধহয় চার পাঁচ বর্গ মাইলের বেশী হবে না। সামান্য একটা রেলস্টেশন, ডাকঘর, হাসপাতাল, আর স্টেশনের কাছে কয়েকটা চালাঘরে ছোট ছোট কিছু দোকান। এছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কতকগুলো বাড়ীঘর এধার ওধারে। তার কিছু চোখে পড়ে, কিছু বা পড়ে না, বন জঙ্গলে ঢাকা থাকে। সব জড়িয়ে কিন্তু মন্দ লাগে না। বিশেষত শহরের কোলাহল থেকে যারা পালিয়ে আসে এখানে কয়েকদিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে তাদের কাছে এটা বেশী প্রিয়।

বছরের মধ্যে পুজোর সময়টা তাই এখানে বাহিরের দু'চারটে লোকের মুখ একটু আধটু দেখা যায়। নইলে বারোমাস কিছু স্থানীয় লোক, কয়েকজন কাঠ ব্যবসায়ী, বাঙ্গালী বিহারী, মাড়োয়ারী, দোকানদার, গরুরগাড়ীর গাড়োয়ান ও সাঁওতাল মজুর—স্ত্রী পুরুষ নিয়েই যা কিছু জমজমাট, শোরগোল গাড়ী ঘোড়া দূরের কথা, একটা সাইকেল রিক্সা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। পাকাসড়ক বলতে যা বোঝায়, কোথাও তার চিহ্ন নেই। একটা মোটা কাঁচা রাস্তা, ওখানকার লালরঙের মাটির ওপর পথচারীদের পায়ের চাপে আপনাআপনি তৈরী হয়ে গেছে। বড় ছোট রাস্তা বলতে ওই এক এবং অদ্বিতীয়।

গরুর গাড়ীগুলো পাহাড় থেকে কাঠ বোঝাই করে ওই পথেই নেমে আসে এবং একেবারে স্টেশনের পাশে মাড়োয়াড়ীদের গোলায় মাল খালাস করে ফিরে যায় সন্ধ্যার আগে।

বড় দিঘীর পাড়ে ও প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় প্রতি সোমবার হাট বসে ওই রাস্তাটা ধরে এগিয়ে গেলে স্টেশন থেকে আরো একটু দূরে। সাঁওতাল পুরুষ ও মেয়েরা কেউ মাথায় করে, কেউ বা বাঁকে ঝুলিয়ে নিয়ে আসে, যার যেটুকু পণ্য।

শহরের বাবুরা সবচেয়ে অসুবিধা বোধক[illegible] এই বাজারের। প্রতিদি[illegible] সকালে বিকেলে যাদের পয়সা ফেললেই ইচ্ছামত জিনিস কেনা অভ্যাস। তার অর্থ হাতে থাকা সত্ত্বেও খাওয়া দা[illegible] [illegible]র কষ্ট সহ্য করতে নারাজ। একদিনে সাত দিনের খাবার—তা[illegible] [illegible]।

সাঁওতালদের অনুগ্রহের [illegible]
আনে, তাই নিয়ে কাজ[illegible]
আমদানীও তেমনি ক[illegible]

॥ ২ ॥

লোকটাকে দেখলে বুকের ভেতরটা দুর দুর করে ওঠে! কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য সরমার যে তার সঙ্গে দেখা হবেই হবে। ওর পায়ের তলায় যেন চাকা আছে, ঘুরছে ত ঘুরছেই। সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, রাত নেই, দিন নেই। টো টো করে শুধু ঘুরে চলেছে। কখন কোথায় তার সঙ্গে যে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে, তার যেমন ঠিক ঠিকানা নেই তেমনি জানেও না কেউ।

ওই পাহাড়ী অঞ্চলটায়, কে যেন ওকে দিনরাত্তির 'ডিউটি' দেবার জন্যে পাহারা নিযুক্ত করেছে। চোখে ঘুম নেই, বিশ্রাম কাকে বলে জানে না। ভয়ডরও বুঝি নেই ওর দেহের কোথাও, এতটুকু। কারণ ও নিজেই যে ভয়ঙ্কর! ছ'ফুটের অধিক লম্বা একটা পাকা শালের খুঁটি যেন চলে বেড়ায় নিঃশব্দে। অতবড় মানুষটার দেহেরও যেন কোন ওজন নেই। পাশে এসে দাঁড়ালে কেউ টের পায় না, শুধু পলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সারা দেহ!

প্রথম যেদিন ওকে দেখেছিল সরমা, আঁৎকে উঠে মায়ের আঁচলটা চেপে ধরেছিল। অথচ তখন রাত্রি নয়। সূর্যাস্তের শেষ আলো পাহাড়ের বুকে ও শালমহুয়ায় মাথায় ঝলমল করছে।

বেলা থাকতে থাকতেই ওরা বাসায় ফিরবে বলে, পাহাড়ের মাথায় না উঠে নেমে আসছিল। সরমা আর তার মা। যদিচ সরমার ইচ্ছা ছিল না, আর দু'টো পাক মাত্র বাকী, তাহলেই একেবারে 'এভারেষ্ট্' বিজয়ের গৌরব সে অর্জন করতে পারতো অন্ততঃ ওইটুকু পাহাড়ে না চড়ার লজ্জা থেকে বাঁচতো কিন্তু ওর মা বাদ সাধলেন, কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, আবার একদিন এলেই হবেখন। এখানে, আমরা দু'তিন মাসের জন্যে 'চেঞ্জে' এসেছি। পাহাড় ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না। নতুন জায়গা, কি দরকার!

তবু সরমা আপত্তি করতে ছাড়ে না। বলে, নতুন জায়গা ত ভয় কি? ওইতো পাহাড়ের মাথায় কয়েকজন মেয়ে পুরুষ দেখা যাচ্ছে। ওরা বোধহয় আমাদেরই মত বেড়াতে বেরিয়েছে। ওরাও ত ফিরবে? সন্ধ্যে হতে এখনো অনেক বাকী!

ওরা কি করবে না করবে, তা জেনে আমাদের লাভ কি? এখন নেমে চল তু! বলে পিছন ফিরে সবে কয়েক পা এগিয়েছেন, এমন সময় রোমাঞ্চিত

দেহে ওরা দু'জনেই থমকে দাঁড়ালো! মাত্র কয়েক হাত তফাতে একটা জারুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে সেই মূর্তিমান! মিশমিশে কালো রং, লেংটিপরা উলঙ্গ দেহ, হাতের মুঠিতে একটা লম্বা লাঠি, চোখ দু'টো রক্তাভ বললে ভুল হবে, যেন দুটো জমাট রক্তপিণ্ড! দেহের কোথায় এতটুকু মেদের আতিশয্য নেই বরং অভাব এবং অতিরিক্ত অভাব। বহু রাত্রি জাগরণের ফলে গলার স্বর যেন একেবারে বসে গেছে। কথা কইলে মনে হয় ভাঙা হাঁড়ির ভেতরে থেকে যেন শব্দ আসছে। ভাঙা ধরা-ধরা গলায় সেই প্রথম কথা কয়ে উঠলো, ভয় নেই, চলে যাও খুঁকি। ডরাচ্ছিস্ কেনে আমায়।

সত্যিকথা বলতে কি ওকে দেখে সরমার মায়েরও হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ও কথা বল্‌তে তবে যেন তিনি কতকটা আশ্বস্ত হলেন!

লোকটা বোধহয় ওদের মুখ দেখেই তা অনুমান করতে পেরেছিল। তাই দু'পা এগিয়ে এসে বললে, ভয় করছিস্ কেনে! আমার নাম দুল্‌হা সর্দার। এখানকার সব লোক আমায় চেনে? ওই সাঁওতাল পাড়ায় আমার ঘর। তুদের বাসাটা কোন দিকে হচ্ছেক মা?

সরমার মা উত্তর দিলেন, উই দিকে।

কোনদিকে মা?

আমরা নতুন এসেছি। চিনি কি ছাই কিছু যে তোমায় বলবো!

আমি সবকে চিনছি মা, কন্ বাসাটা বল্ না? কেমন একটা নাছোড়বন্দ ভঙ্গী, যেন ওই খবরটা জেনে তার চারটে হাত বেরুবে।

সরমার মা এবার হাতটা একদিকে দেখিয়ে বললেন, ওই দিকে যে নবাব কুঠিটা আছে তার পিছনে খানিকটা যেতে হয়।

উখানকে, কোন্ বাংলা মা।

সরমা যেন ওর কাছ থেকে পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচে। মনের রাগ প্রকাশ করতে না পেরে, মায়ের আঁচলটাতে টান দিয়ে বলে, তুমি চলে এসো ত মা, সাতগুষ্টির হিসেব এখন ওকে দিতে হবে। 'কোন্ মাসিমার কুটুম এলেন উনি!'

সরমার কথার অর্থ বোধহয় সে বুঝতে পেরেছিল। তাই বললে, রাগ করছিস্ কেনে! কুছু ভর নেই। তামাম পাথরডিহীতে সব আদমী চেনে এই দুলহা সর্দারকে!

সরমার মা এর জবাব দিলেন। আমরা এই ক'দিন হলো এসেছি, এখানে 'চেঞ্জে'—আমরা আর কাকে চিনি!

তা কোন্ বাংলাটায় তোরা আছিস্ মা?

ওই যে গোয়ালাদের কুঁড়েগুলোর পিছনে। ফুলবাংলা থেকে সরু যে পথটা শালবনের ভেতর দিয়ে বেঁকে গেছে—টালির ঘর, ফটকের সামনেই একটা বড় কুল গাছ। আর পাচীলটার খানিকটা ভেঙে পড়েছে সেই বাড়ীতে।

ওঃ সেই খোলা বাংলাটা! হাঁ হাঁ চিনছি বটেক। উটা ওভারসিয়ার বাবুর জামাই বানিয়েছিল। কিন্তুক বেশী দিন বাস করলে না। বিক্রি করলে কলকাতার এক বাবুকে! যেমন মোটা তেমনি গোরো দেখতে ছিল বাবুটাকে, নামটা কি মনে নাই। একদিন গরুর গাড়ী করে জঙ্গল থেকে শিকার করে ফিরছিল। রেলের ফটক থেকে গাড়ীটা যেমন নামতে যাবে এমনি গাড়ীটা ভেঙে বাবুটা পড়ে গেল মাটিতে! গাড়ীর চাকাটা বাবুর পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। ওঃ খুব দরদ লাগল বাবুটার। এত ভারী বাবুটা যে গাড়ীওলা একলা তাকে টেনে তুলতে নারলো। আমি বাবুটাকে গাড়ীর তলা থেকে বার করলাম। এই বলে একটু থেমে, হঠাৎ কণ্ঠস্বরকে একেবারে খাদে নামিয়ে দিয়ে, বললে, বাবুটা নেশা করেছিল মা খুব—বহত্ সরাব পিয়েছিল। পচাই খেতে বাবুটা খুব ভালবাসতো। কত দিন আমি পচাই এনে দিয়েছে। কত বকশিস্ করছিল আমায়! আচ্ছা সে বাবুটার কি হলো, বলতে পারিস্ মা? আজ দশ বারো বছর, আর বাবুটাকে ত ইদিকে দেখছি নাই!

সরমা এবার চটে উঠলো, তা আমরা কি জানি?

তুমি বড় গোঁসা হচ্ছো দিদিমণি! ও আদমীটা বড় সাচ্চা ছিল। খুব দিলদরিয়া। গরীব, দুঃখীদের, কত পয়সা দিলে! একটা আমাদের সাঁওতালকে রেখেছিল, ওর বাড়ীটা দেখাশুনা করতে। দুবরষ ওকে টাকাও ভেজলে, তারপর আর টাকা দিলে না ওভি কাম ছেড়ে দিলে। বাংলাটা ত এখন ভেঙে পড়ছে। বাবুটার কি হলো মা?

তা আমরা কি জানি!

তোমরা তার জান্পছন্ আদমী নয়?

এমনি ভাবে সরমাদের পিছনে বক্বক্ করতে করতে সে আসছিল। প্রত্যেক বারই জবাব দেবার আগে সরমার মা মনে করেন হয়তো, এই উত্তরট

পেলেই থামবে এবং চলে যাবে লোকটা। কিন্তু সেটা যেমন শেষ হয় অমনি আর একটা প্রশ্ন করে বসে এবং তাদের সঙ্গ ছাড়ে না!

বিরক্তির সঙ্গে তাই এবার বলে ওঠেন সরমার মা, না আমাদের সঙ্গে তাঁদের কোন আলাপ পরিচয় নেই। চিনিনা। জানিনা!

তাহলে এ বাড়ীটা তুদের কে দিলে মা?

তাও জানি না!

সরমা রুখে উঠলো এবার। এত সব খবর নিয়ে তোমার কি হবে বলতে পারো?

আদ্মীটা বড্ড সাচ্চা ছিল দিদিমণি!

হ্যাঁ, সে আদ্মীটা সাচ্চা ছিল, কিন্তুক আমরা খুব বদ্মাস আছি। তুমি এখন যেতে পারো।

আঃ। তুই চুপ করতো সর। বলে হঠাৎ গলাটা নামিয়ে মোলায়েম সুরে সরমার মা বলেন, তুমি ওই ছেলেমানুষের কথায় রাগ করোনা সর্দার! আমার স্বামী আছেন বাসায় তুমি তাঁর সঙ্গে কথা বললে জানতে পারবে সব। আমরা কিছু জানি না। এ বাড়ী ওর অফিসের এক বাবু জোগাড় করে দিয়েছিল শুনেছি। ভাড়াটাড়া কিছু দিতে হয়নি!

হাঁ। তবে ত ঠিক আছে! এ বাড়ি ভাড়া লিবেক কে পয়সা দিয়ে মা!

তখনো তাদের অনুসরণ করতে দেখে, সরমা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা, আরো কি কিছু তোমার জানার আছে! দয়া করে এখন বিদেয় হও—তোমার বক্‌বকানি অসহ্য হয়ে উঠেছে!

দিদিমণি তুমি আমার ওপর গোঁসা হচ্ছো কেন? কুছ্ ডর নেই আমায়।

না-না গোঁসা হবে কেন? আমাদের একটু কাজ আছে কিনা তাই বলছি। তুমি এখন কোনদিকে যাবে সর্দার?

যাবো। ওই রেল কলোনিতে। কেনে মা? তোমরা কি উইখানে যাবেক?

না-না! বলতে বলতে সেই পথে একজন দেশী লোককে আসতে দেখে তুল্‌হা তার দেশীয় ভাষায় বিড়বিড় করে কত কি বললে। লোকটার মাথার ওপর এক বোঝা কাঠ ছিল। ঝপ্ করে মাটিতে ফেলে এগিয়ে এলো সে তুল্‌হার কাছে। তারপর কাঁচা শালপাতার তৈরী লম্বা এক ধরণের বিড়ি 'পিকা' ট্যাঁক থেকে বার করে তুল্‌হার হাতে একটা দিয়ে, নিজে একটাতে

আগুন ধরালে। এবং একটা গাছের তলায় বসে আপসে কি সব আলোচনা করতে লাগল।

এই অবসরে সরমারা যেন ওর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচল।

অনেকগুলো চড়াই উৎরাই ভেঙে, শালমহুয়ার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে চলতে চলতে তারা মায়ে ঝিয়ে এসে পৌছল রেললাইনের কাছে। কয়েকগজ দূরেই 'লেভেল ক্রশিং' দেখা যাচ্ছে, লোহার গেটটা বন্ধ। বোধহয় কোন মালগাডীটাড়ী এখনি আসবে। তাই দ্রুত পা চালালো ওরা। ওটা পেরিয়ে যে পায়ে চলা পথটা ওপারে বড় আমগাছ তলায় যে পান বিড়ির দোকানটা বাঁশবাঁধা ছোট্ট চালার নীচে, তার পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে নদীর দিকে বরাবর ওইটা ধরে আরো কিছু দূর অগ্রসর হলেই গোয়ালা পাড়া। সেটা পিছনে রেখে সাঁওতালদের কয়েকটা চালা ঘর ডাইনে বাঁয়ে ছেড়ে এগিয়ে গেলেই ওদের সেই খোলা বাংলা।

সেখানে পৌছতে বেশ সময় লাগবে।

কিন্তু 'লেভেল ক্রশিং'টার কাছে আসতেই তারা আর একবার চমকে উঠলো। দেখে দুল্‌হা সর্দার কখন আগেভাগে, কোন পথ দিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

ভয়ে এবার সরমার মুখ শুকিয়ে উঠলো। কি জানি লোকটা কোন বদ্ মতলবে ওদের অনুসরণ করছে না কি!

ওর মা চুপিচুপি বললে, মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতে।

দুল্‌হার দৃষ্টি কিন্তু এবার ওদের দিকে ছিল না। অদূরে যে সিগ্‌ন্যালটা ঘাড হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল, ও যেন দুইচোখে গিলছিল তাকে। দূর থেকে একটা ট্রেনের শব্দ যেন ক্রমশ কাছে আসছিল।

দেখতে দেখতে একটা মেল ট্রেন হুড়মুড় করে কাছে এসে পড়লো এবং চোখের পলকে যেন দূরে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লেভেল ক্রশিংয়ের ওপর থেকে খানিকটা লালধুলো ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে চারিদিক যেন আচ্ছন্ন করে দিলে। সরমা দেখলে ইঞ্জিনটা কাছে আসতেই দুল্‌হা সর্দার দু'হাত উঁচুতে তুলে ছোট ছেলের মত নাড়তে লাগল। ওই ধুলোতে তার চোখ মুখ মাথা সব ভরে গেল তবু তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। হাতটা নেড়েই চলেছে। ওই ইঞ্জিনটার দিকে চেয়ে।

॥ ৩ ॥

পরের দিন আবার এক অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ তুল্‌হার সঙ্গে।

সরমা মাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল বিকালে। আজ পাহাড়ের দিকে যায় নি, নদীটা দেখবে কেমন বলে বড় বাঁধটা অতিক্রম করে, শালগাছের তলায় বিছানো ছোট বড় পাথরের চাঁইগুলো সযত্নে ডিঙতে ডিঙতে যেমন নেমেছে তারা ঢালু বালির চরে, দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায় তুল্‌হা সর্দ্দার, তার হাতের সেই লম্বা লাঠিটার ওপর ভর দিয়ে।

হঠাৎ চমক লাগে। কোন একটা অদ্ভুত জানোয়ার বুঝি খাড়াপায়ে শিকারের অপেক্ষায় রয়েছে। দৃষ্টি ভ্রম হয়।

ওদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে তুল্‌হা কাছে। তারপর কালো কালো, ফাঁক ফাঁক গোটাকতক দাঁত বার করে বলে, দিদিমণি তোরা বেড়াতে যাচ্ছিস ?

হ্যাঁ, 'নাইতে' যাচ্ছি না যে নদীতে দেখতে তো পাচ্ছিস ! বলে মুখটা তার দিকে থেকে ঘুরিয়ে নেয় সরমা।

পাহাড়ের পিছনে তখন সূর্য নেমেছে অস্তাচলে। পশ্চিমের আকাশটা যেন সিঁদুর মাখানো। তারই আভায় সরমার মুখখানা যেন ক্রোধে ভারী দেখাচ্ছিল।

হাঁ। খুব ভাল। যত নদীর হাওয়া খাবি, তত তাকত্ বাড়বে শরীরে। এখানে সব আদ্‌মি ত আসে জল হাওয়া খেতে !

সরমার মা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, এর জবাব দিলেন, খপ্ করে। তোমাদের এ পোড়া দেশে ও ছাড়া আর কি আছে যে খাবে শুনি !

কেনে উ-কুথা বলছিস মা ? হাটে ত সব কিছু মিলবেক।

ছাই মেলে ! সরমার চোখ থেকে যেন একটুকরো অগ্নিকনা ছিটকে পড়লো। ওর মা তাতে আরো ইন্ধন জোগালেন। তোমাদের এখানে সপ্তাহে একটা দিন ত হাট, ওই সোমবারে। তা একটু দেরী হলে আর কিছু পাবার উপায় নেই। কতকগুলো পাকা ঢেঁড়স্, পাকা বরবটি, আর শুকনো কচুর মুখী খেয়ে মরো। এমন পোড়া দেশে আবার মানুষ আসে 'চেঞ্জে' ! নেহাৎ

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, এখানকার জল হাওয়া ভাল, মেয়েটার পেটের রোগ সারবে, তাই এত জায়গা থাকতে এখানে এসেছি মরতে!

ঘাড়টা সানন্দে দুলিয়ে সর্দার বলে, হাঁ, মাজি, ডাগ্‌দারবাবু ত ঠিকই বলছে। এই খুঁকি ত এতো দুবলা তুমি দু'মাস থাকবে ত দেখবে কি রকম মোটা বনে যাবে।

কি খেয়ে মোটা হবে! শুধু জল আর হাওয়া। না আছে মাছ, না মাংস, না ডিম তরিতরকারী। ভাগ্যিস গোয়ালাদের ঘরগুলো কাছে ছিল তাই গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একটু যা হোক ভাল দুধ পাই। ওইটুকু মাত্র ভরসা।

না-না সব কিছু মিলবেক্। একটু জল্‌দি জল্‌দি হাটকে যাবি মা!

বিকৃত স্বরে জবাব দিলেন সরমার মা। হাঁ, তোদের এই হাট বসে যেন দোরের কাছে, যেতে আসতে পাক্কা তিন মাইলের কম নয়! আর এমনি পোড়া দেশ যে কাজের সময় না পাওয়া যায় একটা সাইকেল রিক্সা, না কিছু! যেখানেই যাও হাঁটো আর হাঁটো।

তাও কি পথ ঘাট আছে। উঁচু, নীচু খোলা খোঁদল—ওরি নাম রাস্তা। কোথাও শাল বনের ভেতর দিয়ে, কোথাও বা এর ওর বাড়ীর আনাচ কানাচ দিয়ে গিয়েছে। আমরা কলকাতার লোক, আমাদের কি এসব জায়গায় পোষায় বাবা। তোমাদের সাঁওতালদের দেশ তোমাদের কাছেই ভাল!

নিজের দেশের নিন্দে বুঝি সহ্য হয় না! দুল্‌হা সর্দার ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলে ওঠে, তোমার মত কলকাতার কত লোক ত এখানে আসে মা!

প্রাণের দায়ে আসে। নইলে সখ করে যে কেউ আসে এ আমি দিব্যি করে বললেও বিশ্বাস করি না! বলি, কি আছে, তোমাদের এ দেশে। গুচ্ছির পাথর আর বন জঙ্গল! এর নাম পথ। এই ওঠো, এই নামো। পাথুরে মাটিতে পা হড়কে যায়! পথ চলা মানে রীতিমত কসরৎ করা। খুকীর বাবার ত একদিন হাটে গিয়ে এমন হাঁটু ও কোমরে ব্যথা, যে ঘর থেকে বেরুতে পারে না। দিন রাত বন্দী হয়ে আছে ঘরের ভেতরে।

দুল্‌হা বলে, ইখানটা ত সেই রকম আছে, মাজি! এটা ত শহর লয়। এখানে যা বাড়ী ঘর দেখছিস সব একদিন জঙ্গল ছিল বড় বড় গাছ কেটে, জঙ্গল সাফ্ করে এখানে ঘর বানিয়েছে আদ্‌মীরা। বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে যায় দুল্‌হা সর্দার। বাতাসে কান পেতে যেন কি শোনবার চেষ্টা করে। তারপর সরমার দিকে তাকিয়ে বলে, দিদিমণি কত 'টাইম্' হয়েছে ঘড়িতে।

চট্ করে হাত ঘড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে সরমা বলে, ছ'টা বাজে।

আরে ব্যস্, এখনি মেল এসে পড়বেক্। বলতে বলতে হন্ হন্ করে একেবারে উঁচু বাঁধের ওপর উঠে পড়লো। তারপর দ্রুত পা চালালো সেই শাল বনটার দিকে। যেন ওই ট্রেনে বিশেষ কেউ আসছে, যাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে এখনি।

নিমেষে বোম্বাই মেল্-এর কু—শব্দ নদীর তট, শালবন, আকাশ বাতাস, পাহাড়ের বুক সব ভেদ করে কেঁপে উঠলো! এবং দেখতে দেখতে অদূরে, নদীর ওপর যে রেলের লাল রঙের পুলটা তার ওপর দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ করে মেল্ ট্রেনটা ছুটে চলে গেল।

সরমা স্পষ্ট দেখতে পেলে তুলহা সর্দার ছুটছে লাঠিটা কাঁধে ফেলে সেই রেল লাইনের দিকে। কেন, ছুটছে কি জন্যে ছুটছে, সে নিয়ে বৃথা মাথা না ঘামিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে সে। ট্রেনটা যেন বাঁচালে তাদের!

পরদিন ভোরে তখনো ভাল করে সকাল হয়নি। সরমা 'মর্ণিংওয়াক্' করতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় হঠাৎ তার চোখ দুটো উঠলো জ্বলে। দেখে ভাঙা পাঁচীলটার ভেতর দিয়ে সেই লেংটিপরা সর্দারটা এগিয়ে আসছে তাদের বাড়ীর ভেতরে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল সরমা, ছুটে ভেতরে চলে গেল। কম্পিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, মা, দেখো সেই লোকটা আমাদের বাড়ীর ভেতর ঢুকছে।

সরমার বাবা তখনো ঘুমচ্ছিলেন।

ওর মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ঢুকছে ত কি হয়েছে, তোকে কি খেয়ে ফেলবে! ও ত একটা মানুষ! ভয়ে মলি একেবারে।

মানুষ না ছাই—সাক্ষাত একটা জানোয়ার। শুধু তোমাকে কেন, আমাদের সবাইকে ইচ্ছে করলে ও খেয়ে ফেলতে পারে।

সরমার মুখের কথা সবে শেষ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তুল্হা হাঁকলে, দিদিমণি!

সরমা কোন সাড়া দিলে না।

ওর মা বেরিয়ে এলেন। তুলহা তখন ছোট্ট একটি পুঁটলির ভেতর থেকে একটা মুরগির ডিম, দু'টো বেগুন, গোটা দশবারো উচ্ছে বার করে রাখলে রকটার ওপর।

কি হবে, এসব? প্রশ্ন করেন সরমার মা।

খাবি তোরা। দিদিমনির জন্যে আনলুম।

তা ভাল। কত দাম দিতে হবে শুনি ?

দাম দিবি কেনে ? কিছু দিতে হবেক নাই।

সে কিরে! না-না-তাহলে আমরা নেবো না। তুই নিয়ে যা তোর জিনিস।

একথা বলছিস কেনে ?

তুই গরীব মানুষ কোথায় পাবি। তোর নিজের ত ঘরের জিনিস নয়।

তাতে কি! আমার নেই কিন্তুক আমার আপনা আদিমদের ত আছে!

সরমার মার কণ্ঠ থেকে এবার এক ঝলক বিষ যেন উথলে পড়ে। তোর আপনা আদ্মীদের কথা আর বলিসনি! বাবা কি সব লোক! ওদের সব বাড়িতে কত ক্ষেত খামার রয়েছে, অথচ পয়সা দিয়ে মাথা ঠুকলেও একটা জিনিস কেউ বিক্রী করবে না! অথচ সেইসব জিনিসই হাটে নিয়ে গিয়ে হয়ত কমদামেই বেচে আসবে।

হ্যাঁ, এতো সব ঠিক আছে মা! মুখে একটা সরলভঙ্গী করে উত্তর দেয় দুলহা।

এবার যেন অগ্নিমূর্তিতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সরমা। বলে, একে তুই ঠিক বলছিস! দু তিন দিন বেড়িয়ে আসবার সময় আমি পয়সা নিয়ে সাধাসাধি করেছি সাঁওতালদের বাড়িতে গিয়ে, একটা ডিম কি দু'টো বেগুন উচ্ছে কেউ বিক্রী করতে রাজী হয়নি। কেন আমরা কি পয়সা দেবো না, না ভিক্ষে করতে গেছি!

উ-কথা বুলছিস কেনে দিদিমনি।

কেন বলবো না। ওরা এখানে আমাদের বেচবে না আর হাটে গিয়ে সেই জিনিস আরো কম দামে বেচবে! তার মানে ওরা বাঙ্গালী হেটার, বাঙ্গালীদের ঘেন্না করে। শুনেছি আমরা একথা অনেকের কাছে! আগে বিশ্বাস করিনি। এখন হাতে হাতে প্রমাণ পাচ্ছি।

বলে একটু থেমে সরমা আর এক পর্দা গলা চড়িয়ে দিলে। বাঙ্গালীদের জন্যে আজ তোমরা খেতে পাচ্ছো ভুলে যেয়ো না। এখানে যত কাঠ, পাথর আর বালির ব্যবসা সবই ত বাঙ্গালীদের, তোমাদের দেশের মেয়ে মদ্দ সেখানে মজুরী করে তবে বেঁচে আছে। নইলে আজ খেতে পেতো না।

সরমার বাবা ঘর থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন, এই সরো চুপকর। ওর কাছে এসব লেক্‌চার দিয়ে কি হবে শুনি, ও এসবের কি বোঝে!

তুমি জানো না বাবা। সব বোঝে এরা, প্রত্যেকটি এক একটি মিটমিটে শয়তান দেখো না, আমরা যখন বেড়াতে বেরোই, কেমন ভাবে তাকায় আমাদের দিকে। যেন কিছু জানে না। নিরীহ ভালমানুষ গোবেচারী ভাব।

ঢুল্‌হা বলে, দিদিমণি তুমি ঝুটমুট্ গোঁসা হচ্ছো আমার ওপর।

তোর ওপর রাগ করতে যাবো কেন? তোদের এখানের মানুষগুলোর কথা বলছি। বলে সহসা যেন নরম হয়ে যায় সরমা।

দিকুকে আমাদের লোক কেউ ঘর থেকে কিছু বিকতে নাই।

দিকু, দিকু কি?

এই তোরা ত পরদেশী আদমী। তাই আমাদের লোক তোদের দিকু বলে।

ওঃ তার মানে আমরা বিদেশী, বাঙ্গালী, তোমাদের চোখে পর, শত্রু তাই যাতে না খেতে পেয়ে মরি, তারই চক্রান্ত। এইত?

সঙ্গে সঙ্গে ঢুল্‌হা জিব কেটে বলে। না—না, দিদিমনি ওটা আমাদের জাতের কাছে একটা ইজ্জতের কথা। ওতে আমার লোকের মান যাবেক্। তুমি এমনি কিছু চাও, ওরা দিবেক। কেউ আর কথা বলবেক না। কিন্তুক বিকবে নাই ঘর থেকে।

ওঃ ভারী তোদের মান। একেবারে কচুগাছ তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। বলি মান তোদের একার আছে, আর আমাদের বুঝি কিছু নেই। আমরা তাই তোদের দোরে মাগতে যাবো, ভিক্ষে করতে যাবো, কেমন?

ফোঁস করে উঠলেন সরমার মা। তোদের মানের ডালা দেখলে গা জ্বালা করে। এদিকে পরনে, নেংটি আর দুটো ভাত তাও কারুর একবেলা জোটে কেউ বা আমানি খেয়ে দিন কাটায়। কিন্তু লেজভরা মানটুকু আছে—ষোল আনার ওপর আঠারো আনা। ভাঙবে তবু মচ্‌কাবে না।

হ্যাঁ। উসব যা বলছিস মা, আমার জাতের আছে। সত্যি কথা। ভুখা থাকবে তবু ইজ্জত দিবেক না।

তা জানি। বেশ মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছি সেদিন। নইলে তোমায় আজ এতকথা বলতুম না। তোমাদের দেশের লোকের যে কত ইজ্জত, তা সেদিন জেনেছি। একটা ছোট মুরগীর জন্যে এখান থেকে সেই ফুলডিহী পাহাড়ের পিছন দিক পর্যন্ত সমস্ত সাঁওতাল পাড়াটা চুঁড়ে ফেলেছি, কারুর ঘরে যেতে বাকি রাখিনি। পয়সা নিয়ে সাধাসাধি করেছি। কিন্তু কেউ বেচতে রাজী

হলো না। অথচ চোখের সামনে দেখছি প্রত্যেকের বাড়ীতেই ছোট বড় মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে দলে দলে!

উচিত আমার জাতের নিয়ম হচ্ছে দিদিমনি, কেউ বিকবে না ঘর থেকে— আগেই বুলেছি!

তার কণ্ঠস্বরকে ভেংচে সরমা বলে, কিন্তুক এটা তুদের কি রকম নিয়মরে। ঘরকে বিকবে না অথচ সেই মুরগিটা যখন হাটকে যাবে দিকুকে বেচতে তাদের ইজ্জত যায় না?

সেটি আমি বুলতে নারবো দিদিমণি!

এত সব জানিস্ আর আসল কথাটি বলবার সময় নারবো কেন—তার বেলা পারবো না কেন? আমরা সব জানি, আমাদের এতো বোকা ভাবিসনি, বুছলি।

আঃ সরো তুই থামবি না কি? চেঁচিয়ে ওঠেন সরমার বাবা বিছানা থেকে।

তুই চুপ কর সরো। বলে সরমার মা আবার শুরু করলেন, আচ্ছা সর্দার বুঝলুম না হয় ওটা তোদের ইজ্জত। কিন্তু আজ সাতদিন ধরে খুঁজছি, একটা বাসান মাজার লোক পেলুম না। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলুম। কেউ ঝুটা ছুঁতে রাজী নয়। অথচ রাত্রে যে ভাত তরকারী থাকে খেতে দিলে তো কেউ আপত্তি করে না। কত মেয়েছেলের তোসামোদ করেছি তোদের এই পাড়ায়। তোর জানাশোনা কোন লোক আছে, দিবি একটা ঠিক করে, যা মাইনে চায় দেবো।

কাম ত কেউ করবেক না মাঁ আমার লোক। না—না—না। বলে ব রবার মাথা হেলাতে থাকে দুল্‌হা।

কেন করবেক না। সরমার কণ্ঠ আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আমরা কি তোদের চেয়ে নীচু জাত? জানিস আমরা ব্রাহ্মণ, সবচেয়ে উঁচু জাত।

উসব তো জানছি দিদিমণি। কিন্তুক, বলে ধরাগলায় একপ্রকার স্বর টেনে হঠাৎ যেন মৌন হয়ে যায় দুলহা সর্দার!

চুপ করে রইলিযে! তোরা কি জাত যে এতো তোদের ডপডপানি, এত দেমাক, শুনি? সরমার রাগ আরো বেড়ে ওঠে।

তা ত বুলতে পারবো না দিদিমণি! ক্ষণেক চিন্তা করে জবাব দেয় সর্দার। আমরা ত জংলী, আদমী, সাঁওতাল, ওসব জাতটাতের খবর বুলতে পারবো না।

তোর দেশ কোথায়? এবার প্রশ্ন করে সরমা।

সেটা পারবো না বলতে। কি যেন সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করে সে। তারপর আবার নিজেই জবাব দেয়। ইটাই ত দেশ আমার। ওই পাহাড় জঙ্গল সব তামাম পাথরডিহী। বলে হাতটা ঘুরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখিয়ে দেয়।

তোর বাপ-মা তাহলে এখানকার লোক ?

খানিকটা চুপ করে থেকে জবাব দেয় তুল্হা, তা জানি না। আমি তাদের কখনো দেখিনি। যখন এইটুকু ছিলুম, তখন এইদিকে চলে এসেছি কাজকাম করতে।

সরমার কণ্ঠে বিদ্রূপ যেন ঝলসে ওঠে। তা তোর বাপ-মাকে মনে নেই !

তখন আমি খুব ছোট এতটুকু লেড়কা পাঁচ বরষ ওমর হবে !

তা কি করে সম্ভব ? পাঁচ বছরের ছেলের মা-বাপকে মনে থাকে না ?

হাঁ থাকে। কিন্তুক বেশী থাকে না দিদিমণি !

তা তুই তাদের সঙ্গে আসিসনি এখানে ?

না ওরা চলে গেল কোনদিকে কাজকাম করতে মনে নেই। সরমা কণ্ঠে বিদ্রূপ চেপে প্রশ্ন করে, তা তারা চলে গেল, তোকে একা ফেলে রেখে ?

একা কেন ? আমার একটা কাকা ছিল। উয়ার কাছে রেখে। তারপর আর তাদের দেখিনি কখনো। কোন দেশে কলিয়ারীতে কাম করতে গিয়ে মরে যায় খাদের ভেতর কয়লা চাপা পড়ে, শুনেছি।

আহা ! সরমার মায়ের কণ্ঠে সহানুভূতি উথলে ওঠে, তিনি একটু থেমে জিজ্ঞেস করেন, তা তোমার এখন কত বয়েস হলো সর্দার ?

তা হচ্ছে অনেক মা ! এসব জায়গায় ত তখন অনেক জঙ্গল ছিল মা গুঁড়া ভাল্লুক কত শিকার করেছি ! বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। তারপর মাথা তুলে অনেক ভেবে চিন্তে উত্তর দেয়, তা তিন কুড়ি কি চারি কুড়ি হবে মা।

খিল খিল করে এমন শব্দ করে হেসে উঠলো সরমা যে ঘরে থেকে ওর বাবা ধমক দিয়ে উঠলেন। কেন ওই সব অকাজে বাজে কথা তুলছিস সরে জানিস ওরা কি রকম হিংস্র। না সর্দার তুমি চলে যাও তো তোমার কাছে ও মেয়ের কথায় তুমি কিছু মনে করো না।

বলতে বলতে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

জানি, ও ছোট খুকী আছে। বলে শিশুর মতো একটা সরল ভঙ্গী করে উঠে দাঁড়ালো। তারপর কানের ওপর গোঁজাছিল যে আধপোড়া 'পিকা' সেটা মুখে গুঁজে বললে, একটু আগুন দে তো মা !

যা—না, রান্নাঘর থেকে দেশলাইটা এনে দে না। সরমার মা হুকুম করেন সরমাকে।

সরমা দেশলাইটা এনে দূর থেকে ছুঁড়ে দিলে সর্দারকে। একটা কাঠি জ্বালিয়ে মুখের আধপোড়া বিড়িটাকে ধরিয়ে নিয়ে দেশলাইটা ফেরত দিয়ে ভাঙা ধরা গলায় সে বলে উঠলো, ভয় নেই। আমায় ভয় করিস না খুঁকি। বলতে বলতে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে যেমন উঠে দাঁড়িয়েছে অমনি ওয়াক্ ওয়াক্ থুঃ—কি বিশ্রীগন্ধ বিড়ির, এখনি বমি হয়ে যাবে মা আমার, বলে নাকে কাপড় চেপে ছুটটে বাথরুমে চলে গেল সরমা। ওঃ এই জিনিস মানুষ খায়?

ওর মা বলেন। ওরা জংলী, অসভ্য, ওদের কি আর ভাল মন্দের কিছু জ্ঞানগম্যি আছে? শুনেছি ওরা গোসাপ, গোহাড়গিলের মাংস পর্যন্ত আগুনে ঝলসে কাঁচা-কাঁচা খেয়ে নেয়!

ওয়াক! তুমি চুপ করো মা। বলে নাক থেকে কাপড়টা সরিয়ে সরমা মন্তব্য করে, আমার বিশ্বাস ওরা মানুষ পেলেও ছাড়ে না মা!

॥ ৪ ॥

সাঁওতালদের আসল যেটা বস্তী, সরমাদের এই খোলা বাংলা থেকে অনেকটা দূরে। রেললাইন পেরিয়ে, চড়াই উৎরাই পথে বেশ খানিকটা ছোট বড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু ছোটখাটো বস্তী, দু'দশঘর এদিক ওদিকে যে নজরে না পড়ে, তা নয়। হাটের দিকে, নদীর পথে কিংবা গোয়ালপাড়ার কাছাকাছি, এদের সব লাল মাটির নিকানোমুছানো খটখটে পরিচ্ছন্ন চালাঘরগুলো সরমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আসাযাওয়ার পথে এই কুঁড়েগুলোর কাছাকাছি এলেই সরমার বুকের ভেতরটা যেন কিসের আতঙ্কে কাঁপতে থাকে। ওরই মধ্যে বাস করে, দুল্‌হা সর্দারের মত আরো কতগুলো অসভ্য, বর্বর। যাদের হিংস্র মূর্তিগুলোকে সে একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না। চোখে চোখ পড়লেই তৎক্ষণাৎ মুখটা ঘুরিয়ে নেয় অন্যদিকে। ল্যাংটিপরা, উলঙ্গদেহ সেই পুরুষগুলোর কি কদর্যরূপ—পুরু ঠোঁট, আবলুশের মত রং, পেশীবহুল বেঁটে ধরণের নিরেট চেহারা। মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো কাফ্রীদের মত। একেবারে অনার্য চেহারা।

ছেলেবেলায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় যে সব ছবি মুদ্রিত দেখেছিল, তাদের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

সরমাদের বাড়ীটার কাছাকাছি, দু'চারঘর থাকলেও, ঈশ্বর রক্ষা করেছেন তাদের মেয়েপুরুষরা বড় একটা কেউ ঘরে থাকে না। খেটে খাবার সমর্থ যার আছে, রাত পোয়াতে তর সয় না, পেটের ধান্দায় বেরিয়ে পড়ে।

সারাদিন ওদের কুঁড়েগুলো যেন ঝিমিয়ে থাকে। কোন মানুষ আছে বলে মনেই হয় না। কেউ যায় পাহাড়ে পাথর ভাঙতে, কেউ যায় নদী থেকে বালি তুলে গোরুর গাড়ী বোঝাই দিতে, কেউ বা জঙ্গলে সারাদিন পরিশ্রম করে কাঠ কেটে ইজারাদারের চুক্তি পূরণ করতে।

মেয়েরা কোলের শিশুটাকে কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে পথ হাঁটে। কোন কোন পুরুষ কাঁধের ওপর ছোট ছেলেটাকে বসিয়ে নেয়। লেংটিপরা সাঁওতাল ছেলেগুলো কেউ ছাগল গরু নিয়ে, কেউ বা মহিষের পিঠে চড়ে বন-জঙ্গলে চরাতে যায়। টুং টাং করে ঘণ্টা বাজে এইসব জন্তুদের গলায়। যাতে ওই শব্দ শুনে নেকড়েরা আগে থাকতেই ভয়ে পালিয়ে যায় এ তারই সঙ্কেত। মধ্যাহ্নে যখন ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ,নীরব নিস্তব্ধ চারিদিক, দূর পাহাড়ের কোল থেকে মহুয়ার জঙ্গল ভেদ করে সেই ঘণ্টার ধ্বনি কানে আসে, ভারি মিষ্টি লাগে। জঙ্গলের মধ্যে এ যেন এক নতুন রাগিনীর সৃষ্টি করে। এরই সঙ্গে মিলিত হয় আবার মধ্যে মধ্যে বাঁশির সুর। গরু ছাগল ছেড়ে দিয়ে, কোন একটা ছায়া তরুর তলায় বসে হয়ত এক রাখাল বালক উদাস দৃষ্টিতে রৌদ্রোজ্জ্বল নীল নিস্তব্ধ আকাশের পানে চেয়ে ফুঁ দেয় তার বাঁশিতে।

দিনান্তে ওরা যখন ফিরে আসে, জানোয়ারদের গলায় বাঁধা সেই ঘণ্টাগুলোর মিলিত টুং টাং আওয়াজ স্মরণ করিয়ে দেয়, আসন্ন সন্ধ্যার কথা। পশ্চিম আকাশে উঁচু পাহাড়ের আড়ালে সূর্য মুখ লুকবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাঁওতালদের কুটীর-গুলোতে আবার নরনারীর কোলাহল শোনা যায়। স্বামী, স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের কলকণ্ঠে মুখর হয়ে ওঠে সেই কুঁড়েগুলো। কিন্তু সেও বেশিক্ষণের জন্যে নয়।

কেরোসিনের আলো জ্বলে না ওদের কারো ঘরে। ওটা ওদের অভাব, কি স্বভাব কে জানে। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে থমথমে কালো জমাট অন্ধকার শুধু যেন ওই ঘরগুলোর ওপরে চেপে বসে। আর তারই সঙ্গে চারিপাশের বনজঙ্গলও উঁচু পাহাড়ের মাথাগুলোকে মনে হয় কে যেন অন্ধকারের পাঁচীল তুলে ঘিরে দিয়েছে।

অন্ধকার ঘন থেকে ঘনতর হতে থাকে।

রাত ঝাঁ ঝাঁ করে।

কলকাতা শহরের পথে ঘাটে যখন গাড়ীঘোড়ার ভীড়,লোকজনের ঠেলাঠেলি পেশাপিশি, ওখানে মনে হয় যেন মধ্যরাত্রি। নিঝুম, নিস্তব্ধ।

সরমার চোখে ঘুম আসে না। এত সকাল সকাল ঘুমনো তার ধাতে সয়না। ওর বাপ মা তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়ে, ও তখন জেগে থাকে একা। বই নিয়ে হ্যারিকেন লণ্ঠনটার সামনে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তারপর একসময় আলোটা নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আরো জেগে থাকতে হয়ত পারে সে কিন্তু চারিদিকে বনজঙ্গল তারওপর ঘরে বাইরে সবাই নিদ্রামগ্ন, সহসা এই কথাটা যখন মনে পড়ে যায়, তখন কেমন যেন গা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। মনে হয় খস্‌খস করে বইরে শুকনো পাতার ওপর বুঝি কে হাঁটছে! হাওয়ায় জানলার কপাটটা একটু নড়ে উঠলে ভয়ে শিউরে ওঠে। বুঝি কোন দুষ্ট সাঁওতাল তার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

একদিন গভীর রাত্রে সাঁওতালদের ভীষণ চীৎকার চেঁচামেচি ও গোলমালে সরমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখে ওর মা বাবা অনেক আগেই জেগেছেন। তাঁরা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার দিকে।

এদিক ওদিক থেকে লাঠি সড়কি হাতে নিয়ে ছুটে আসছে সাঁওতাল। মেয়ে মদ্দ—অনেকে। তাদের কাছাকাছি সাঁওতাল পাড়াতেই গণ্ডগোলটা লেগেছে। কিসের গণ্ডগোল, কেন এত সাঁওতাল ছুটছে কিছুই সরমারা বুঝতে পারলে না।

শুধু পরদিন সকালে শুনলে কার বউয়ের সঙ্গে অপর কোন পুরুষের নাকি আস্‌নাই ছিল, স্বামীটাকে মেরে পুরুষটাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে বৌটা। লাঠি সড়কী নিয়ে সবাই আসবার আগেই তারা ভেগে পড়েছে। রাত্রির ওই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে, বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কোথায়, কোন পথে যে তারা পালিয়েছে কেউ জানে না।

॥ ৫ ॥

সেদিন কাঁচা শালপাতায় মুড়ে কয়েকটা পুঁটি চেলা ও বাটা মাছ নিয়ে এলো ঝুমা।

সরমার মা ওই জ্যান্ত মাছগুলো দেখে বলাবাহুল্য মনে মনে খুব-ই খুশি হলেন। তবু মুখে কিছু প্রকাশ না করে বললেন, কি হবে এসব !

কি হবেক মা তোরা খাবি তাই আনছি।

তা ভাল করেছিস কিন্তু এর দাম কত ?

দাম কত, তা আমি জানি না। আমি ত মাছ বিকতে আসিনি !

তবে ? না-না তাকি হয়। রোজ রোজ তুমি এমনি করে জিনিস দিয়ে যাবে আর এক পয়সা দাম নেবে না ! তুমি গরীব মানুষ কোথায় পাবে !

দুল্‌হাকে গরীব বললে যেন ওর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তাই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় গরীব, বুলছিস কেনে ? আমার এত সব আপর্নার আদমী রয়েছে। এ মাছ ত আমায় পয়সা দিয়ে কিনতে হয়নি। আমার লোকেরা নদীতে ধরছিল, তোদের জন্যে দু'চারটে মেঙে আনলুম। তোরা এসেছিস আমার দেশে। মাছ পাচ্ছিস না খেতে, তাই আনছিরে—

তা বেশ ভাল করেছিস্। আজ দু'তিন দিন একটা মাছ চোখে দেখিনি। আর মেয়েটা হয়েছে তেমনি। একটু যা হোক মাছের গন্ধ না হলে আর ভাত খাবে না !

সরমা ঘরের ভেতর থেকে গজগজ করে, মা যেন কি। এসব কথা ওর কাছে তোমার বলার কি দরকার !

হাঁ-হাঁ আমি জানি খুঁকী তোরা মাছটা খুব ভালবাসছিস। উ বছর এমনি কলকাতার একটা মেয়ে এসেছিল সেই মল্লিক বাংলায়। আমায় দেখতে পেলেই ছুটে আসতো। বলতো, মাছ দিবিত কাল সর্দার !

সে ওই কথাটা বলেছিল কিনা তার সাক্ষীসাবুদ ত কেউ নেই মোটকথা আমি তোমায় বলিনি ! এই নাও বাপু পয়সা। শেষকালে পাঁচটা লোকের কাছে বলে বেড়াবে যে ওই বাংলার মেয়েটাকে বিনা পয়সায় মাছ খাইয়েছি, তা চলবে না। বলে একটা সিকি এনে ওর গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিলে সরমা।

কি তুই বুলছিস, দিদিমনি। বলতে বলতে সিকিটা হাত দিয়ে ঠেলে দিল দুল্‌হা।

ঠিকই বলছি। ওই এখনি যেমন একটি মেয়ের কথা বলেছিস্, তেমনি আবার আমার কথাটা বলবি অন্য কাউকে !

না-না এটা আমি লিবেক না। [illegible] কিনছেকনা দিদিমণি।

বলে সিকিটা ফেরত দেবার জন্যে যেমন হাতটা বাড়ালো, সরমার মা বললেন আচ্ছা, ওটা মাছের দাম নয়, রেখে দাও তোমার ছেলেমেয়েকে মিষ্টি কিনে দিয়ো।

জ্বলন্ত আগুনের ওপর কে যেন ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে।

সর্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা মায়েঝিয়ে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। হঠাৎ তার কি হলো বুঝতে পারে না।

একটু পরে সর্দার ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, ছেলেমেয়ে কুথাকে পাবো মা। উসব আমার কিছু লেই!

তাহলে বৌকে দিয়ো, তোমার জনানা আছে ত?

না মা। ওভি নেই। বলেই সহসা কেমন যেন বিষন্ন হয়ে যায়!

সরমা ও তার মায়ের মুখে ও যেন আর কোন কথা জোগায় না।

এইভাবে নীরব ও বাক্যহীন কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাবার পর সরমার মা প্রথম কথা বলেন, তোমার ঘরে তা হলে আর কে আছে সর্দার?

কে থাকবেক মা, কেউ নেই। খুব সহজ সরল কণ্ঠে উত্তর দিলে সে।

চায়ের জল বসিয়ে এসেছিল সরমা। তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল।

ওর মার সব কথাই তার কানে যাচ্ছিল।

মা প্রশ্ন করলেন। তোমার বৌ বুঝি মরে গেছে—কি অসুখ করেছিল সর্দার?

অসুখ করবেক কেন মা। উ আমার ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল মা।

আপন মনে এবার খিল খিল করে হেসে ওঠে সরমা। চায়ের লিকার কাপে ঢালতে ঢালতে বলে, পালাবে না! যা মূর্তি। তোমার সঙ্গে কেউ আবার ঘর করতে পারে!

সরমার মা একটু চুপ করে থেকে আবার শুধালেন, তা তোমাদের জাতের মধ্যে ত শুনেছি আবার বিয়ে করতে পারে। আর একটা করলেই পারতে।

হাঁ-হাঁ—সেও করেছিলুম মা। কিন্তুক, সেটা ভি পালিয়ে গেল!

সরমা এবার হাসি চাপতে চাপতে বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, এরকম কটা বিয়ে করেছিলে। ঠিক করে বলো ত সর্দার?

একটু চিন্তা করে সে উত্তর দিলে। তা চারটা হবেক।

এ্যাঁ। চারজনেই পালাল? বলে মুখে কাপড় গুঁজে হাসির বেগ দমন করতে করতে আবার ভেতরে চলে গেল সরমা বাবাকে চা দিতে। একটু পরে

বেরিয়ে এসে সে জিজ্ঞেস করলে, তুই ওদের মদ খেয়ে মার ধোর করবি, আর তারা তোর ঘর করবে কেন!

সবাই ত মারে দিদিমণি।

এবার হাসিতে ফেটে পড়ে যেন সরমা।

হাঁ সত্যি সত্যি বলছি দিদিমণি। সব মরদাই ত সরাব পিয়ে কত মারে তাদের বৌকে। সাঁওতালী নয়—হিন্দী বাংলায় মেশানো জগাখিচুড়ী ভাষায় কথা বলে তুলহা।

যা যা ওকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে হবে না। আহা বেচারী! বলে প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেন সরমার মা। বলেন, তাহলে তুমি দুটো মাছের ঝোল ভাত আজ আমাদের এখানে খেয়ে যেয়ো সর্দার। কেমন?

না-না মা। তোমার ঝুটা আমি খাবো না।

সরমা বলে, তাহলে একটু চা খেয়ে যাও—ওটা ত ঝুটা নয়।

হাঁ—ওটা খেলে কিছু হবেক না! তা দে দিদিমণি।

সরমা চা এনে দিয়ে বললে। তুই বুঝি খুব চা খেতে ভালবাসিস্।

একটা চুমুক দিয়ে সর্দার বললে, হাঁ, উ তো বাসছি। কিন্তুক উসব দোকানে যে চা বিকছে, ভাল লাগে না।

আমার চাটা কেমন, ভাল লাগছে খেতে—

খুব ভাল।

এ রকম চা তাহলে এর আগে খেয়েছিস।

হাঁ। মিথ্যা কথা বুলবো না দিদিমণি। খেয়েছি।

কোন বাড়ীতে খেয়েছিস।

সেই জন্‌সাহেবের বাংলায়।

সেটা আবার কোথায়?

উই যে পুল পেরিয়ে—উপারকে। উঁচু পাহাড়ের বুকে লালরঙের বাংলা বটে—উইখানে। মুহূর্তের জন্যে এক অজ্ঞাত পুলকে যেন তার চোখমুখ ঝলমল করে ওঠে, গোপন করতে পারে না কণ্ঠের সে আবেগ।

সরমার কাছে এটা খুব অস্বাভাবিক ঠেকে। ওই অসভ্য, জংলী লোকটার চোখ মুখের সহসা এই পরিবর্তন। কেমন যেন তার মনে ধাক্কা দেয়।

একটু থেমে সরমা প্রশ্ন করে, ওখানে বুঝি তুই চাকরী করতিস্?

তাড়াতাড়ি কি যেন বলতে যাচ্ছিল সর্দার হঠাৎ সরমার চোখের দিকে

তাকিয়ে থেমে গেল। তারপর আম্‌তা আম্‌তা করে উত্তর দিলে, হাঁ, কাজকাম করতুম উথানে, জঙ্গলে।

তা সাহেব বুঝি তোকে খুব চা খাওয়াতো।

না, মিথ্যে কথা বুলবো না, সাহেব ভাল আদমী ছিল না দিদিমণি। মেমসাহেবটা চা খেতে দিতো! কথাটা কেমন একটা ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেই তুল্‌হার মুখের রেখাগুলো সব একসঙ্গে যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লো। তারপর কি মনে হলো, চট করে জিজ্ঞেস করলে, ক'টা বেজেছে দিদিমণি তুমার ঘড়িতে। বেলাটা আজ ঠিক ঠাওর হচ্ছে না। আকাশে মেঘ করছে যে।

এখন সাড়ে সাতটা।

আরে বাপ্‌ প্যাসেঞ্জার আসবার 'টাইম' হয়ে গেল।

কেন, এই গাড়ীতে কি তোর কেউ আসবে?

সে কথায় কোন জবাব না দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলতে ফেলতে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে গেল তুল্‌হা সর্দার। যেন সেই গাড়ীটা 'মিস্' করলে তার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে!

বিকেলেও ট্রেণের সময় হলে ছোটে, আবার সকালেও তাই। তাহলে কি স্টেশনে কুলিগিরি করে নাকি তুল্‌হা। হবেও বা। নইলে এত তাড়া কিসের প্রতিদিন! সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার রেলস্টেশনটার ছবি ভেসে ওঠে সরমা চোখের সামনে।

না ছিরি, না ছাঁদ! স্টেশন বললে কেবল ভুল হয় না, আপমান করা হয় ওই নামটাকে। যেদিন প্রথম আসে, ট্রেণটা যেই থামলো স্টেশনে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে সে হতাশ হলো! কোথায় প্ল্যাটফর্ম, কোথায় রেল স্টেশন খুঁজে পায় না সরমা। মাটির ওপর কিছু ইঞ্জিনের ছাই আর পোড়াকয়লা ছড়ানো। এ ছাড়া আর কোথায় কোন চিহ্ন নেই প্ল্যাটফর্মের। না স্টেশন মাস্টারের ঘর, না কোন মাথার উপর টিনের ছাউনি। একপাশে টিম্‌টিম্ করছে একটা ছোট ঘর। একটি মাত্র লোক যিনি টিকিটও দেন, আবার ঘণ্টাও বাজান, আবার একপাশে দাঁড়িয়ে টিকিটও নেন! আর তাঁর সহায়ক আর একটি ব্যক্তি যে সিগ্‌ন্যাল দেয়, গেট বন্ধ করে, ছুটে গিয়ে যদি কোন মাল থাকে পার্শ্বেলে, তা মাথায় করে নামায়!

সারা দিনে তু'খানি ট্রেণ মাত্র থামে, রাত্রেও তাই। কামরার ভেতর থেকে, লাফ দিয়ে তবে নামতে হয় প্লাটফর্মে। কাজেই লাল জামাপরা, বুকে প্লেট-

আটা, কুলির কোন প্রশ্নই ওঠে না। ট্রেণ চলে গেলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর নেংটিপরা, রোগা রোগা চেহারার তিন চারটে লোক এসে তাদের বিছানা, সুটকেশগুলো মাথায় করে নিয়ে বাড়ীতে পৌছে দেয়। ভদ্রলোক যাত্রীদের জন্যে কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। এতদিনে নাকি মাত্র তুখানা সাইকেল রিক্সা হয়েছে ওখানে। তারা সবদিন হাজির থাকে না ট্রেণের সময়। হয়ত অনেক দূর পথে কোথাও লোক নিয়ে গিয়েছে তাই পৌছতে পারেনি! কে জানে। তাছাড়া পথও সোজা নয়। উঁচু নীচু চড়াই উৎরাই। একজনে সাইকেল রিক্সা এখানে চলে না, তুটো লোক লাগে। চড়াই এলে পিছন থেকে ঠেলতে হয়, যেমন আবার উৎরাই পথে গাড়িটা ছুটে চলে, অমনি সেই লোকটাই লাফিয়ে সাইকেল আরোহীর পায়ের কাছে বসে পড়ে। তার পা তুটো ঝুলতে থাকে গাড়ী থেকে মাটির ওপর। সাইকেল চালকের সিটটার ঠিক পিছনে, ওর মুখটা থাকে।

এখনো একদিনও চাপেনি সরমা সাইকেল রিক্সায়। শুধু পথে ঘাটে অন্যলোককে চড়তে দেখেছে! তাও মাত্র একদিন কি তুদিন! অবশ্য সত্যি কথা বলতে কি, ওর ইচ্ছাও করে না। এখানে হেঁটে চলতেই ওর ভাল লাগে। শালবনের তলা দিয়ে, ঝরে পড়া শুকনো পাতাগুলো পা দিয়ে মাড়িয়ে যখন সে চলে, কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি যেন জাগে তার মনে। বন্যপত্র পুষ্পের বিচিত্র গন্ধ ও তার সঙ্গে মাটির নিজস্ব এক প্রকার অদ্ভুত সৌরভ, তাকে কেমন আনমনা করে তোলে! চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সে কোন এক বিরাট বিপুলায়তন বৃক্ষের তলায়। তারপর ঘাড়টা যতদূর সম্ভব পিছনে হেলিয়ে উঁচু দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চোখের যেন পলক পড়ে না। এতবড় গাছটা এই মাটির বুকে একদিন অঙ্কুরিত হয়েছিল। তার আশে-পাশের শিশু তরুগুলোর মত একদিন সেও ছোট ছিল। হাত দিয়ে ধরা যেতো, ছোঁয়া যেতো! একথা বিশ্বাস করতে যেন আজ ভয় হয়। কত যুগ লেগেছে ওই বিরাট বনস্পতিকে এত উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়াতে। সরমা তখন জন্মায়নি এমনকি তার বাবা মাও হয়ত কেউ জন্মগ্রহণ করেননি এ পৃথিবীতে, তারও আগে থেকেই এ বৃক্ষটা ছিল এখানে। ডালপালা, শাখা প্রশাখা চতুর্দিকে বিস্তার করতে করতে তিলে তিলে সে বেড়েছে। এত উর্দ্ধে উঠেছে। কত বর্ষা, বসন্ত, কত ঝড়বৃষ্টি ভূমিকম্প তুর্যোগ গিয়েছে এর মাথার ওপর দিয়ে। যুগ যুগ ধরে কত অজানা পাখী উড়ে এসে বসেছে ওর ডালে। গান গেয়ে উঠেছে

মনের আনন্দে। সঙ্গিনীকে নিয়ে বাসা বেঁধেছে ওর কোটরে। এরই ফল খেয়ে হয়ত জীবন ধারণ করেছে। তারপর আবার একদিন হয়ত চির বিদায় নিয়েছে, এই গাছেরই বুকে কে জানে! হঠাৎ গাছগুলো যেন রহস্যময় হয়ে ওঠে তার চোখে! এর ইতিহাস ত কেউ লেখে না। মানুষের যেমন ইতিহাস আছে, এই গাছপালা পশুপাখীদেরও ঠিক তেমনি আছে। কিন্তু কে তার খোঁজ রাখে। এমনি সব বড় বড় বনস্পতির দিকে তাকিয়ে, তারা উপস্থিত হয় সরমার মনে

আর ওই যে পাহাড়গুলো ওই দূরে যারা আকাশের গাঁয়ে হেলান দিয়ে মৌন হয়ে রয়েছে, ধ্যানমগ্ন ঋষির মত, গম্ভীর নীরব ও নিস্তব্ধ, ওরা বুঝি আরো প্রাচীন। আরো জ্ঞানবৃদ্ধ। বনস্পতির মাথা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বলোক থেকে যেন তারা দেখছে, পর্যবেক্ষণ করছে এই পৃথিবীর সব কিছু। এর বনজঙ্গল, নদীনালা, এর জন্তুজানোয়ার, এর প্রতিটি মানুষ। কত যুগ যুগান্তে মিশে গেছে কিন্তু ওরা ঠিক তেমনি আছে দাঁড়িয়ে। এই মাটির কত অলিখিত ইতিহাসের সাক্ষ্য ওরা। কত ভালমন্দ, কত অন্যায় অবিচার, কত সুখ দুঃখের কাহিনী রয়েছে ওদের নীরব দৃষ্টিতে। বইয়ের পাতায় যে ইতিহাস কোন কালে কখনো লেখা হয়নি ও হবে না, ওরা যেন জানে সেই সব। তাই সর্বজ্ঞ ঋষির মত সব কিছু জেনে শুনে নিশ্চুপ হয়ে আছে। ওরা যেন এই পৃথিবীর নীরব ইতিহাস।

পাহাড় জঙ্গল এর আগে কখনো দেখেনি সরমা। এই প্রথম চাক্ষুষ করলে। প্রথম বলেই কি তার মনে এমনি সব চিন্তা জাগে! ওর মা বাবাকে ওই বিরাট বনস্পতি ও পাহাড়গুলো এমনি করে কি ভাবায়! প্রথম এ জায়গাটায় পা দিয়ে ভালো লাগেনি সরমার। চতুর্দিকে বনজঙ্গল পাহাড় আর ওই নগ্ন অসভ্য লোক! তাদের ভেতর থেকে কবে পালিয়ে যাবে, তার জন্যে মন ছটফট করতো। ভগ্ন স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে ডাক্তারের নির্দেশে চুপ করে থাকতো। কিন্তু যত দিন যেতে থাকে তত যেন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে তার প্রতি।

অবশ্য এর আগে পাহাড় জঙ্গল কখনো দেখেনি বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। দূর থেকে দেখেছিল সরমা পাহাড় জঙ্গল। ট্রেণের কামরায় বসে চা খেতে খেতে। কাশীতে যাচ্ছিল বড় মামীর সঙ্গে বড়দিনের ছুটিতে বেড়াতে, তখন দেখেছিল।

সেবছর সে ক্লাশ ট্রেণ-এ ওঠে। জীবনে সেই প্রথম শহর ছেড়ে তার বিদেশযাত্রা। প্রথম হাওড়া স্টেশন দর্শন, প্রথম বিখ্যাত পাঞ্জাব মেল-এ আরোহণ। হু-হু করে মেল-গাড়ী ছুটে, অসংখ্য স্টেশন পেরিয়ে চলে যায়, থামে না কোথাও তারপর একেবারে যাট কি সত্তোর মাইল দূরবর্তী বড় একটা স্টেশনে গিয়ে দাঁড়ায়, যদিও এসবই তার প্রথম অভিজ্ঞতা এবং তাতে সেদিন প্রচুর রোমাঞ্চ ও আনন্দ অনুভব করেছিল সরমা, তবু এ আনন্দের সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

এ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ। মানুষের হাতে গড়া সৃষ্টি নয় প্রকৃতির দান! এর আনন্দ, এর বিস্ময়, এর রসানুভূতি সবই কেবল আলাদা নয় বোধহয় সম্পূর্ণ নিজস্ব—অন্য কোন কিছুর সঙ্গে যার তুলনা দেওয়া সম্ভব নয়।

সত্যিকথা বলতে কি নিবিড় অরণ্যের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় কজনের হয়! এইভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, গায়ে হাত দিয়ে, চোখে চোখ রেখে ছোঁয়া-ছুঁয়ি মেলামেশা!

সরমার জীবনে এই প্রথম! কেবল প্রথম স্পর্শের হর্ষ পুলক নয় তার সঙ্গে আরো কিছু! এই প্রথম সে উপলব্ধি করে, অরণ্যের একটা নিজস্ব সচেতন সত্তা আছে। ওরা বোবা, মূক, নিষ্প্রাণ নয়। মানুষের মত উদ্ভিদরাও একত্র দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে ভালবাসে। বিভিন্ন বৃক্ষের সমন্বয়ে গঠিত ওদের সমাজ। সেখানে ছোট বড়র নানা দল, নানা গোষ্ঠি, আর সেই সব মিলিয়ে অখণ্ড এক বনময় জগত!

বৃহদাকার বনস্পতিগুলোর দিকে তাকিয়ে সরমার এক এক সময় মনে হয় ওরা বুঝি আরণ্যক পরিবারের কর্তাব্যক্তি বিশেষ। আর তারই সঙ্গে লতানে গাছগুলোকে দেখে আপন মনেই হেসে ওঠে। ওরা বুঝি ওই সংসারের সব নারী। কমজুরী, ছোট বড় আরো যে সব তরুলতা তারই আশেপাশে ভীড় করে থাকে, তাদের দেখে মনে হয় ওদেরই যেন সব ভাই বোন, ছেলেমেয়ের দল। কেউ বালক, কেউ যুবক, কেউ প্রৌঢ় কেউ বা বৃদ্ধ! ছোটয় বড়য় মিলিয়ে মিশিয়ে যেন এক একটি জায়গায় এক একটি পরিবার সংসার পেতে বসেছে।

ঘরে বাইরে আমাদের যেমন আত্মীয়স্বজন কত পরিচিত অপরিচিতের সঙ্গে আনাগোনা মেলামেশা, ওদেরও ঠিক তেমনি। উৎসবের ঋতুতে তাই ভীড় লেগে যায়। ছুটে আসে প্রজাপতি, ভ্রমর, মৌমাছির দল, কত দূর দূরান্ত থেকে। আসে পোকামাকড়, কীট পতঙ্গ, আত্মীয় বন্ধু। শত্রু, মানুষের মত ওদের আছে কত

শত। একজন আর একজনের যেমন ক্ষতি করে তেমনি রক্ষাও করে তারা বন্ধুর মত। মেরে তাড়ায় ওরা শত্রুকে। কাঠঠোকরা, গিরগিটী, বহুরূপীদের কার্যকলাপ এক একদিন অলসমধ্যাহ্নে বাগানে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে করতে সরমার এই কথা মনে জাগে। কেউ গাছের ডাল থেকে ফুল ভাঙতে গেলে পিঁপড়েরা এসে অসংখ্য কামড়ে দেয়, উন্‌কী মাছির মত অসংখ্য পোকারা চোখেমুখে আক্রমণ করে!

আবার হঠাৎ এদিক সেদিকে নিঃসঙ্গ কয়েকটা উঁচু শালগাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কোনদিন ওর মনে হয় যেন ওরা সেই বনভূমির প্রহরী। দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

আবার কোন কোন দিন এক জঙ্গল ছেড়ে আর একটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সহসা মনে হয় নিজেকে অবাঞ্ছিত অতিথির মত—সেখানে যেন তার প্রবেশ নিষেধ। সেই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সে ঢুকে পড়েছে এক নিষিদ্ধ এলাকায়! তাকে দেখামাত্র গাছেদের মুখ সব নিমেষে বন্ধ হয়ে যায়। এতক্ষণ পত্রপুষ্পে, লতায় পাতায় যে মধুর আলাপ আলোচনা চলছিল, ওর পদশব্দে সচকিত হয়ে সবাই যেন একসঙ্গে নিশ্চুপ হয়ে যায়। ছট্‌ফট্‌ ডানার শব্দ সরমার কানে আসে। তাকে দেখে বুঝি পাখীরা এডাল ওডাল থেকে উড়ে গোপন স্থানে গিয়ে গা ঢাকা দেয়। ফুলেরা লুকতে পারে না তাদের সৌরভ। পাতারা গম্ভীর হয়ে থাকবার চেষ্টা করলেও তাদের বুকের স্পন্দন চাপতে পারে না, প্রকাশ হয়ে পড়ে। কতকগুলো তরুণী যুবতী একজায়গায় মিলিত হয়ে নিজেরা যখন কলহাস্যে মুখরিত হয়ে ওঠে, তখন কোন বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনকে দেখে নিমেষে রসনা স্তব্ধ করে কৃত্রিম গাম্ভীর্য আনবার চেষ্টা করলেও তাদের চোখ মুখ থেকে আনন্দের রেশটুকু যেমন মেলায় না। সরমার মনে ঠিক তেমনি অনুভূতি জাগে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ কোন একটা ফুলফোটা উপবনের মধ্যে যদি কোনদিন গিয়ে পড়ে!

একদিন বেড়াতে গিয়ে ছোট্ট একটা পাহাড়ে উঠেছিল সরমা তার মাকে নিয়ে। পিছন দিকের ঘোরানো পথটা দিয়ে নামতে যাবে, হঠাৎ তাদের পায়ের শব্দ পেয়ে হাজার হাজার ছোট্ট ছোট প্রজাপতি একসঙ্গে ডানা মেলে উড়ে গেল। দূর থেকে সামনের ছোট ছোট ফুল গাছে ফুলফুটে আছে ভেবেছিল সরমা। কাছে আসামাত্র বিস্ময়ে ওর চক্ষুস্থির হয়ে যায় যখন দেখে যে সেই ফুলগুলো সব উড়তে শুরু করেছে।

এমনি অপ্রত্যাশিত সব বিস্ময় এক একদিন যেন তার চোখের সামনে, এক একটা রহস্যের জগত উদ্ঘাটিত করে দেয়।

সেদিন বেড়াতে গিয়ে সরমা উঠেছিল, একটা উঁচু পাহাড়ের উপর! আশ্চর্য হয়ে যায় দেখে যে সেখানে হাজার হাজার বনশিউলি ফুটে আছে ও তার তলায় শুকিয়ে ঝড়ে পড়ে আছে তার দশগুণ। পাহাড়টার সারা মাথা বনশিউলি গাছে ঢাকা। অথচ নীচে থেকে তার কিছু দেখা যায় না, কিছু বোঝা যায় না।

আবার একদিন বেডাতে বেডাতে যখন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে সরমা একটা পাহাড়ের ওপর হঠাৎ ওর মা ওকে সতর্ক করে দিলেন, এই সরো শিগ্গির পা তুলে বোস্, ভীষণ পিঁপড়ে ওই ছ্যাখ।

নীচে তাকিয়ে দেখে সে আর এক বিস্ময়! লক্ষ লক্ষ লাল পিঁপড়ে ওই মোরামের মাটির সঙ্গে যেন মিলিয়ে আছে। ওই মাটির মধ্যে তাদের বাসা।

তেমনি ওদের বাড়ীর সামনে সে মাঠটুকু নরম ঘাসে সবুজ কার্পেটের মত হয়ে আছে। সেদিন সতরঞ্চি পেতে তার ওপর বসে চা খেতে খেতে ওর বাবা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যখন মাটির দিকে তখন সরমার মুখে যেন কথা ফোটে না। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। লক্ষ লক্ষ ছোট্ট ছোট্ট ফুল ফুটে আছে ঘাসের মধ্যে সেখানে। এত ছোট সেফুল যে চোখে দেখা যায় না। আলপিনের মাথার মত ক্ষুদ্র কিন্তু কি সুন্দর রং, তার প্রতিটি পাপ্ড়ি কোন নিপুণ শিল্পী কখন সকলের অলক্ষ্যে যে তৈরী করে রেখেছে, কল্পনা করতে যেন গায়ে রোমাঞ্চ জাগে।

এছাড়া এক এক দিকে যেন এক এক রকমের দৃশ্য বিশ্বশিল্পী তুলি দিয়ে এঁকে রেখেছে। নিত্য নূতন রূপে তাদের আবিষ্কার করে সরমা।

কোথাও বা জঙ্গলের মধ্যে বিরাট হ্রদ। তার আয়নার মত স্বচ্ছ জলের ওপর আকাশের টুকরোর সঙ্গে ছোট বড় গাছের প্রতিচ্ছবি স্তব্ধ হয়ে আছে।

কোথাও আবার উঁচু নীচু ঢেউখেলানো মাটি। তার মাঝে মাঝে যেমন সবুজ ফসলের ক্ষেত তেমনি রুক্ষ বন্ধ্য জমিও পড়ে আছে ওরই ফাঁকে ফাঁকে। দূর থেকে মনে হয় যেন—কোন ছোট ছেলে রঙের তুলি নিয়ে ছবি আঁকার খেলা খেলতে হঠাৎ বাড়ী চলে গেছে।

এক এক দিন আবার আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে সরমার মন ওই গণ্ডী ছাড়িয়ে, অনেক অনেক দূরে চলে যায়। মনে হয় বুঝি কে তার চোখের সামনে সুইজ্যারল্যাণ্ডের ছবি এঁকে রেখেছে।

আবার কখনো বা সুবর্ণরেখার দিকে তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। চোখের পলক পড়ে না। মনে হয় যেন হরিদ্বারের গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে ওপারের শিবালিক রেঞ্জ-এর মাথায় অস্তগামী সূর্যের বিদায় দৃশ্য দেখছে। কখনো বা হ্রদের দিকে তাকালে ওর চোখের সামনে কাশ্মীরের ছবি ফুটে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের দিকে মুখ ফিরলে মনে হয় বুঝি শিলঙের ছবি দেখছে। এসব কোন জায়গায় যায়নি সরমা। শুধু সিনেমার ছবিতে দেখেছে, ওই সব স্থানের যেসব মনোমুগ্ধকর দৃশ্য এখানে এই জায়গায়, এই নদী পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ বনভূমিতে তাদের সবগুলোকে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করে যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না সরমার।

বড় অদ্ভুত লাগে সরমার। চোখ ক্লান্ত হয় না। যেদিকে তাকাও নূতন নূতন দৃশ্য। একই প্রকৃতি কিন্তু তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কোথাও একঘেয়েমী নেই। একদিকের দৃশ্যের সঙ্গে আর দিকের কোন মিল নেই। প্রকৃতি এখানে যেন বিচিত্ররূপিণী, রহস্যময়ী সুন্দরী তরুণীর মত! যত তাকে দেখে তত আকর্ষণ বাড়ে তার প্রতি!

॥ ৬ ॥

ডাক্তারের নির্দেশ মত রোজ ভোরে 'মর্নিংওয়াক্' করতে বেরোয় সরমা, কোন দিন সঙ্গে যায় তার বাবা, কোনদিন মা। কদাচিৎ তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে বেরোন। মা বেশী হাঁটতে গররাজী, সেইজন্যে বাবাকে তার পছন্দ বেশী। ভোর থেকেই সে তাঁকে ডাকাডাকি শুরু করে। ঘুম ভাঙাবার জন্যে জনতা স্টোভটা জ্বেলে এক পেয়ালা চা তৈরী করে তাঁকে ঘুষ দেয় সরমা। বলে, চলো শিগ্‌গির দেরী হলে, সান্‌রাইজ্‌টা দেখা হবে না।

বাবার লাঠিটা ঘর থেকে এনে হাতে দেয় জুগিয়ে, জুতো জোড়া পায়ের কাছে রেখে উৎসাহে ছট্‌ফট্ করে।

এই কদিনেই অভ্যাস পাল্‌টে গেছে। প্রথম মুরগীর ডাক কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় সরমার। অনেক দূরে কোন পাহাড়তলী থেকে প্রথম এক মুরগীটা ডেকে ওঠে জানে না। তবে অদ্ভুত ভাল লাগে যখন ওই ডাকটা থামতে না থামতেই, মিনিট কয়েকের মধ্যে আরো গোটা দু'তিন মুরগী সাড়া দিয়ে ওঠে, কোঁক্—কোঁ—কোঁর—কোঁ—

ওরা যেন ওকে জানিয়ে দেয়, আমরাও উঠেছি, তোমার আগে!

তারপর আর রক্ষা নেই। জবাবের বিরুদ্ধে জবাব। প্রতিবাদের ওপর প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। সরব ঘোষণা এখান, ওখান, সেখান থেকে, মোরগ-মুরগীর কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে। একদল আর একদলকে টেক্কা দেবার জন্যে ডাকছেড়ে চীৎকার করে ওঠে—কোঁক্—কোঁ—কোঁর—কোঁ…। তারপর সবাই যেন কোমর বেঁধে প্রতিযোগীতায় নামে—আমরাও আছি।

তাদের সেই মিলিত চীৎকার ধ্বনিতে নিস্তব্ধ পাহাড় বনজঙ্গল, সাঁওতাল পল্লীর সকলের বুঝি ঘুম ভেঙে যায়।

ঠিক এই সময় সরমা হাঁটতে থাকে আঁকাবাঁকা, ভাঙাচোরা পথে—ছোট বড় জঙ্গল অতিক্রম করে এগিয়ে চলে।

ভোরের হাওয়ায় ঠাণ্ডার আমেজ। গা শিরশির করলেও ভাল লাগে চলতে। পায়ের তলা থেকে কাঁকুরে মোরাম মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ নাকে আসে। কখন বা বুনো লতাপাতার এক বিশেষধরণের সুবাস ভেসে আসে বাতাসে। অকস্মাৎ কোন অচেনা ফুলের সৌরভে মন উল্লসিত হয়ে ওঠে। যেন চারিপাশের বাতাসে ভরে থাকে সে সুগন্ধ। মনে হয় বুঝি কে দামী আতরের শিশি ভেঙে ফেলেছে এইমাত্র কোথাও!

এরই সঙ্গে চলে হরেক রকমের পাখীর গান। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে ঐক্যতান ধরে যেন তাড়া কখনো নিকটে কখনো বা দূর বনান্তের আড়ালে।

এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা সরমার জীবনে। প্রভাত যে এত সুন্দর, এত মধুর এর আগে কখনো তার আস্বাদ পায়নি। এই প্রথম শুধু চোখে দেখা নয়, কানে শোনা নয়, ওর মনের গোপন পেয়ালাটা কে যেন ভরিয়ে তোলে একই সঙ্গে।

রাত্রির শেষ ও দিনের শুরু! দু'য়ের মিলনের সেই সন্ধিক্ষণ অপূর্ব ও অনির্বচনীয় বুঝি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাকিয়ে থাকে বিহ্বল দৃষ্টিতে সরমা! সুবর্ণরেখার ওপারে তামা পাহাড় রেঞ্জ ও ময়ূরভঞ্জের নীলগিরি রেঞ্জ-এর তরঙ্গায়িত পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয় যেন কালো চাদরে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে তারা শুয়ে আছে—জড়াজড়ি করে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে। ঘুম ভেঙে গেছে কিন্তু উঠছে না ইচ্ছা করে। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে একজন আর একজনকে অনুভব করছে। রজনীর শেষ অন্ধকারটুকুকে যেন বিদায় দেবার পূর্বে নিঙড়ে মুষড়ে, দু'জনে দুজনকে উপভোগ করে নিতে চায় আসন্ন বিচ্ছেদ মুহূর্তের শেষ আনন্দটুকু।

কিন্তু তবু একসময় বিদায় দিতে হয়। সেই নিষ্ঠুর মুহূর্তটা সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন শাশুড়ী ননদের গঞ্জনার ভয়ে ভীত নববধূর মুখে চোখে যেমন ভীরু অথচ সলজ্জ মধুর ভঙ্গী ফুটে ওঠে—শয্যাত্যাগ করতে গিয়েও পা যেন আটকে যায়, থমকে দাঁড়িয়ে, সম্ভোগতৃপ্ত স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে থাকে অপলক নেত্রে। গত রাত্রির মধুযামিনীর যে স্মৃতি তার বুকে সহসা যে হর্ষ শিহরণ জাগায়, তাকে সংযত করে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে নিজের নিরাভরণ দেহটা স্বামীর আলিঙ্গন পাশ থেকে মুক্ত করে নিয়ে নিঃশব্দে শয্যার প্রান্তে উঠে বসে শিথিল কবরী ও বেশবাস সংস্বরণ করে, শেষবারের মত আলতো ভাবে আপন ওষ্ঠ দুটি দিয়ে স্বামীর অধরের শেষ সুধাটুকু পান করে নিয়ে যেমন পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে এই পাহাড়ের ওপর থেকে অন্ধকার অন্তর্হিত হয়, দিনের আলো ক্রমশঃ স্ফুটতর হয়ে ওঠে!

এমনি সব অনির্বচনীয় মুহূর্তেও সরমার সঙ্গে এক একদিন দেখা হয়ে যায় এই দুল্‌হা সর্দারের নাটকীয় ভাবে। কোথা দিয়ে কখন যে তার আবির্ভাব ঘটবে কেউ জানে না!

একদিন দেখে বিরাটা একটা কাঠের গুঁড়ি কাঁধে চাপিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছে সে। বোঝার ভারে ঘাড়টা নুয়ে পড়লেও মুখে চোখে কোথাও কষ্টের চিহ্ন মাত্র নেই। একটা ধারালো কুড়ুলের ওপর কাঠটা লম্বাভাবে শুইয়ে তার বাঁটটা এক হাতে চেপে ধরে, ভারসাম্য রক্ষা করে কেমন সহজে হেঁটে চলেছে। চোখাচোখি হতেই মুখে সেই সরল হাসি ও প্রশ্ন, বেড়াতে বেরিয়েছিস দিদি?

আবার কোনদিন হয়ত দেখে সরমা, কোন একটা ধানের ক্ষেতের ভেঙে-যাওয়া আলটা সে মেরামত করছে। কোদাল দিয়ে মাটির চাঁই কেটে কেটে সেখানে রাখছে যাতে জলটা না বেরিয়ে যায়।

কৌতূহল বশত জিজ্ঞেস করে সরমা, এটা বুঝি তোমার ক্ষেত!

না!

তবে এখানে যে কাজ করছো?

দুল্‌হা উত্তর দেয় তেমনি সহজ সরল কণ্ঠে, এ আপনার লোকের ক্ষেতে, জলটা বেরিয়ে যাচ্ছিল, দেখলুম তাই বন্ধ করে দিচ্ছি।

তার মানে মজুরি খাটছো?

মুজুরি খাটবো কেন? দুলহার গলা চড়ে ওঠে। ওতে যেন সে অপমান বোধ করে। সরমা ভাবে, হয়ত ওর কথার অর্থটা ঠিকমত ধরতে পারিনি দুলহা, তাই আবার বলে, তুই ত এর জন্যে পয়সা নিবি?

কেন নেবো?

তাহলে কি তুই এমনি খাটছিস এই ভোর রাত থাকতে এসে!

হ্যাঁ। ইসব তো আমার আপন লোকের জমিন্ হচ্ছে বটে!

সরমার কাছে ওর কথাগুলো কেমন দুর্বোধ্য, সঙ্গতিহীন, হেঁয়ালীর মত ঠেকে! একদিন বেড়িয়ে ফিরছে, দেখে, এক সাঁওতাল বাড়ীর উঠানে কুড়ুল দিয়ে যে কাঠ চেলা করছে।

সরমা প্রশ্ন করে কি দুল্হা, তুমি বুঝি এইখানে থাকো। এইটা তোমার ঘর?

না!

তবে?

কোন জবাব না দিয়ে দুল্হা চুপ করে থাকে। তখনো সরমার মুখে চোখে তেমনি নীরব প্রশ্ন দেখে সে ঝেঁজে ওঠে, তুমার কি দরকার। আমার এত খবর লিচ্ছ।

এই অহেতুক কৌতুহলের জন্যে মায়ের কাছে একদিন বকুনি খায় সরমা, সব তাতে তুই নাক গলাতে যাস কেন? কি দরকার তোর, এটা ওর ঘর কিনা জেনে।

সরমা বিরক্ত হয়। বারে, লোকটা কোথায় থাকে সেটা জানা বুঝি দোষের হলো।

বলি জেনে কি তোর চাপটে হাত বেরুবে? ওকে নিয়ে কেন খোঁচাখুঁচি করতে যাস্।

সরমা এবার ফিক করে হেসে জবাব দেয়, আর ও যখন আমাদের সাতগুষ্টির খবর নেয়, তার বেলা বুঝি কিছু হয় না?

তা তুই কি তার প্রতিশোধ নিচ্ছিস, এইভাবে?

হ্যাঁ।

আসলে সরমার কৌতূহল ওই মানুষটার প্রতি নয়। ওদের জাতটার ধরণ-ধারণ ওদের জীবন যাত্রা প্রণালীর সব কিছু যেন সে জানতে চায়, বুঝতে চায়। এমন স্বল্পে খুশি, আত্মতৃপ্ত জাত যে আজও আছে কোথাও তা চোখে

না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। একবার মনে ভাবে সরমা, বুঝি ও জাতটা অলস কর্মভীরু, তাই এত দরিদ্র! বাস্তবিক যত দেখে তত ওর বিস্ময় বাড়ে! ওদের জীবনে কোথাও স্বচ্ছলতা বা এতটুকু সঞ্চয় বা বাহুল্য নেই। ঘর ও বাহির সমান। নিঃস্ব বললে ভুল হয় না! নেংটি সর্বস্ব প্রায় উলঙ্গ দেহ, যেমন বাহিরটা ভেতরটাও তেমনি। ঘরেও গৃহশয্যা বা আসবাব পত্র বলতে, কোথাও কিছু নজরে পড়ে না। মাটির দেওয়ালের ওপর শুকনো লতা পাতাও উলুখড়ের চাল। ঐহিক সুখ যার জন্যে পৃথিবীর সকল মানুষ উন্মত্ত, লালয়িত, ওরাই শুধু তার ব্যতিক্রম! ওদের কাছে সব কিছু তুচ্ছ। বিলাসব্যসন কিছু গ্রাহ্য করে না। সকল অবস্থাতেই যেন ওরা নিরাসক্ত, নিস্পৃহ ও উদাসীন। সব চেয়ে বড় কথা এরজন্যে কোন ক্ষোভ নেই ওদের মনে।

ওরা যেন ওর চেয়ে আরো অনেক বড় ধনে ধনী! যে মাটির গর্ভে জন্মেছে সেই মায়ের বুকে শুয়ে অসংখ্য মনিমাণিক্য খচিত অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে যে নিদ্রা যেতে পারে তার চেয়ে বড সুখ বুঝি ওরা চায় না, জানে না। ওরা যে সম্পদের অধিকারী, জগতের যেন আর কারো তা নেই! এই মনো-ভাবটা ওদের সহজাত! ওই জঙ্গল পাহাড ও হিংস্র জীবজন্তু অধ্যুষিত নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কি এমন ঐশ্চর্যের সন্ধান তারা পেয়েছে যার কাছে সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়! বুঝতে পারে না সরমা।

অথচ ওরা গৃহ-বিবাগী সন্ন্যাসীও নয়। বরং পুরোদস্তর সংসারী! স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় পরিজন পরিবৃত হয়ে বাস করে! কত দিন খাবার সময় গিয়ে পডেছে, সরমা ওদের বাড়ী. দেখেছে আমানি সমেত শুধু পান্তা ভাত নুন দিয়ে খাচ্ছে, উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে। ছোট ছেলে মেয়েগুলোও খাচ্ছে ওদেরই সঙ্গে একই পাত্র থেকে। আশে পাশে মুরগী গুলোও মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে বুঝি সেই খাদ্যেরই দু'চারটে দানা। ওই মুরগীগুলোকে দেখে যেমন খুশি মনে হয় ওদের মুখে চোখেও যেন তারই প্রতিচ্ছায়া।

সরমা ভাবতে থাকে, তবে কিঁ ওদের সত্যিকারের জীবন দর্শন হয়েছে! ওরা বুঝেছে এসংসারটা খেলা ঘরের মত। সব কিছুই অসার। বুঝি তাই আসক্তি নেই ওদের কোন কিছুতেই, যা ক্ষণস্থায়ী তাকে আঁকডে ধরে থাকতে চায় না। জীবনের সঙ্গে কোথাও তাই ওরা গ্রন্থিবন্ধন করে না।

তবে কি মাথার ওপরে ওই যে সীমাহীন অনন্ত আকাশ, উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে বৃক্ষলতা পাহাড় পর্বত, নদী নালা ওদের কাছ থেকেই এই শিক্ষা লাভ

করেছে ওরা যে কিছুই বেশীদিন থাকে না, সবই ক্ষণস্থায়ী! আজ ফুলে ফলে যে গাছ ভরে ওঠে, তা সে যত সুন্দর হোক্ মধুর হোক বেশীদিন থাকে না। আজ যে আকাশে আলোর হাসি ঝলমল করে, কাল তার মুখ মেঘাবৃত থমথম করে। আজ বৃষ্টির যে ধারা সমস্ত বনভূমিকে আনন্দে সিঞ্চিত করে, কাল কোথায় সে যায় হারিয়ে! আজকের আকাশের রং কালকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকের পাখীর গানে বাজে যে সুর কাল ত শোনা যায় না তাকে। তবে কি শিক্ষক—এই প্রকৃতিই। প্রকৃতির কাছ থেকেই ওরা এই শিক্ষালাভ করেছে। তাই কি মহুয়া খেয়ে পাই খেয়ে মাদল বাজিয়ে, নেচে, গান গেয়ে, জীবনটাকে ওরা এমনিভাবে উপভোগ করে নেয়। হারাতে চায় না তার কোন রং কোন রূপ কোন সুর! তাই কি প্রতিটি দিনকে ওরা খরচ করে এমনিভাবে দেউলিয়া হয়ে যায়!

॥ ৭ ॥

সাঁওতাল পল্লীটা ছাড়িয়ে, দুটো রাস্তার ঠিক মোড়ে একজায়গায় জবাফুলের সঙ্গে কিছুটা আগুনের ছাই, আলোচাল একটু রক্ত ও একখানা লোহার ছোট ছুরী পড়ে থাকতে দেখে সরমার মা ওর হাতটা পিছন দিক থেকে টেনে ধরলেন, এই সাবধান! ডিঙোস্‌নি যেন, কে কি সব গুণ তুক করে গেছে, দেখতে পাচ্ছিস না? আতঙ্কে সরমার মার গলা কেঁপে ওঠে।

ওরা প্রতিভ্রমণে বেরিয়েছিল। সরমার দৃষ্টি তখন সামনের পাহাড়ের যে চুড়োটার ওপর উদয় সূর্যের সোনলী আলোর লুকোচুরি খেলা চলেছে সেখানে আবদ্ধ। থমকে দাঁড়িয়ে যায় সরমা। প্রশ্ন করে, কেন ওটা কি?

কি তা কে জানো শুনেছি সাঁওতালরা অনেক তুক তাক জানে। কিসের জন্যে কে কি করে রেখেছে এত শত জানি না। দরকার কি ডিঙোবার। পাশে ত এত জায়গা রয়েছে, একটু সরে যেতে কি হয়!

তোমার মন থেকে এই সব কুসংস্কারগুলো এখনো গেল না মা! আচ্ছা মা সত্যি সত্যি কি তুমি বিশ্বাস কর যে এই ভাবে কেউ কারুর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি করতে পারে?

জানিনা বাপু এত শত। তোদের মত ইস্কুল কলেজেও আমি পড়িনি! ছেলেবেলা থেকে যা দেখেছি, মা বাপের মুখে শুনেছি, তাকে তোদের মত এমন ধারা অগ্রাহ্যি করে উড়িয়ে দিতে শিখিনি!

অশিক্ষিত মায়ের কথা শুনে অনুকম্পা জাগে সরমার মনে। এখনো সেই অন্ধকার যুগে পড়ে আছে বেশ! বিজ্ঞান যে জগতকে কোথায় এগিয়ে নিয়ে গেছে, কোনকিছুর ধার ধারেন না।

আরো কিছুদূর অগ্রসর হতে আবার একজাগায়, তেমাথার ওপরে ঠিক তেমনি জবাফুল, কিছু আলোচাল একটু রক্তর সঙ্গে একখানা লোহার ছুরী দেখতে পেয়ে সরমা বললে, ওই দেখো মা, আবার একটা! এখানেও কি আবার তেমনি তুকতাক আছে।

জানি না। বলে বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি।

আচ্ছা মা, আমি এটা এখনি ডিঙিয়ে দেখি না কি হয়? তাহলেই ত হাতে হাতে এর প্রমাণ মিলবে এখনি!

থাক্—আর ন্যেকামো করিসনি। ঢের হয়েছে। বলে সমমার হাতটা চেপে ধরেন তিনি।

তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন মা! বেশত এর সত্যি মিথ্যেটার প্রমান হয়ে যাক্।

তারপর এই বিদেশবিভুঁই জায়গায় যদি একটা কিছু হিতেবিপরীত হয়ে পড়ে তখন কে সামলাবে?

ভালই ত! মরে গেলে তোমাদের আপদ বালাই যাবে! আমার স্বাস্থ্য ভাল করার জন্যে আর এদেশে ওদেশে ছুটোছুটি করতে হবে না, তোমাদের টাকা পয়সাও বেঁচে যাবে!

ঠিক সেই সময় একটা সাঁওতাল চাষীকে কোদাল কাঁধে নিয়ে মাঠের সেই দিক থেকে আসছিল। কাছে আসতে সরমা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁরে এটা কি? তোদের দেশে এটাকে কি বলে।

টোটেম্।

টোটেম্ সে আবার কি? প্রশ্ন করে সরমা।

জিরার যে বেটা ছেলেটা আছেক উয়ার মাথাটা খারাপ হয়েছেক বটে মা। তাই টোটেম করছে।

জিরা! সে আবার কে?

ওই ছেলেটার মা বটেক!

ও তার মার নাম জিরা? তাই বল! আমি মনে করেছিলুম বুঝি জিরা মরিচ রাঁধার মসলা!

হ্যাঁ। বলে কি যেন একটু চিন্তা করে নিলে সে তারপর ঘাড়টা হালয়ে

বললে, উটা যে ডিঙোবেক তার ওই অসুখটা হবেক মা, আর উয়ারটা সেরে যাবে!

এ্যা! তোরা ত ভারি সাংঘাতিক লোক! চোখ দুটোতে কৃত্রিম রাগ ভরে বলে ওঠে সরমা। অমনি করে তোরা অপরের ক্ষতি করিস!

কি করবেক মা! এটা ত লিয়ম হচ্ছেক, আমাদের আজ্ঞা!

এবার ফোঁস করে উঠলেন সরমার মা! দেখলি ত নিষেধ করেছিলুম কেন! তোরা দু'টো পাস করেছিস বলে বিশ্বাস করিস না কিছু। এখন শুনলি ত সব ওর মুখে!

হাঁ। রেখে দাও তুমি ওদের সব কথা মা! এ যদি সত্যি হতো, তাহলে আর ভাবনা থাকতো না। তাহলে ডাক্তার বদ্যিদের অন্ন উঠে যেতো কোনকালে! রাজা মহারাজা, বড়লোকের ছেলেরা মরতো না। সবাই এই পথে চলতো!

সরমা বলে, হাঁরে, এই যে রক্তর মত ওটা কি?

আজ্ঞা, মুরগী বলি দিয়েছিল, ও তার রক্ত!

ওঃ একটা মুরগীও বুঝি বলি দিতে হয়। তা সে মুরগীটা গেল কোথায়। সেটা পেলে তো খেয়ে বাঁচতুম। বলে রসিকতা করে সে।

সি ত ওরা লিয়ে যাবেক আজ্ঞা।

খালি রক্তটুকু ফেলে রেখে যাবে, আমাদের জন্যে। বলে তার এক ঝলক বিদ্রূপের হাসি ছড়িয়ে দিলে সরমা।

ন্যাকামী রাখ! তোরা করিস কি? কালীঘাটে যখন বলি মানত করিস তখনকি পাঁঠাটাকে সেখানে ফেলে রেখে আছিস?

ও তোমাদের একটা পাঁঠা খাবার কৌশল, তা কি জানি না! সরমা মুচকি হাসে।

সকাল বেলা। ঠাকুর দেবতার নামে যা-তা [illegible]! বলে দু'হাতে জোড় করে একবার তিনি কপালে ঠেকালেন। [illegible] হয়ে বুঝি মনে মনে ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সাঁওতালটার পিছু পিছু চলতে চলতে সরমা প্রশ্ন করে হাঁরে, তা ছেলেটার কোন অসুখ ছিল, না এখনি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে!

হাঁ। জোয়ান বেটা। কাঠ কাটতে গেল, পাহাড়ে, সেখানে এক ডাইনীর নজর পড়লো উহার ওপর।

ওঃ তোদের আবার ডাইনীও আছে নাকি। মনে মনে বলে, তোরাই ত একটা ভূত প্রেত, ডাইনী, বনেজঙ্গলে পাহাড়ের গহ্বরে বাস করিস !

হাঁ। আছে আজ্ঞা! ও মেয়েটা বড্ড খারাপ। একবার তোমার মুখের দিকে চাইকেক কি একেবারে সব রক্ত শুষে লিবেক !

তা তোরা কি করিস ?

বহুয়া বুড়োটাকে ডাকি। ও ফুঁ দিবেক, ঝাড়ফুঁক করবেক ত সব ভাল হবেক।

বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠে সরমা। যত সব অশিক্ষিতের মরণ ! কুসংস্কারে ডুবে আছে !

ওর মা, ওকে এক কথায় থামিয়ে দেন। ন্যাকামী আর করিস নি। যত দোষ বুঝি ওদের বেলায়—ওরা অসভ্য জংলী তোদের মত দু'পাতা ইংরেজী পড়তে শেখেনি বলে। আমাদের কুসুমপুরে,—তোর বাপ পিতেমোর ভিটে যেখানে জানিস এখনো সেখানে 'নিশি' ডাকে, অমাবস্যায় রাতে। একজন আর একজনকে গুনতুক করে। বান মেরে এর গরুর দুধ ও খেয়ে নেয়। তাছাড়া নজরলাগা, জলপড়া খাওয়া, ঝাড়ফুঁক, ওঝা, কোনটা নেই শুনি ?

তাই নাকি !

আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তোর বাপকে গিয়ে জিজ্ঞেস করিস ! জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত ত কলকাতার শহরেই কাটলো। দেশ ত কখনো চোখে দেখলি না, তা কি বুঝবি ! পাড়াগাঁয়ের লোকেরা এখনো যেখানে বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণ কায়স্থ। লেখাপড়াও যাদের ছেলেমেয়েরা করছে স্কুল কলেজে তারাই বা কমতি কি !

জানিনা বাবা, তোমাদের ওই সব সেকেলে কুসংস্কার ! আচ্ছা মা সত্যি করে বলো ত। একজন শুধু চোখের নজর দিয়ে আর একজনের ক্ষতি করতে পারে, না মন্ত্রদ্বারা গুণতুক করতে পারে ! তা যদি হতো, তাহলে তার দাম দিতে বিলেত আমেরিকা থেকে রাজাউজীরা সব ছুটে আসতো।

একটু থেমে তিনি বলেন, বিশ্বাস করবো না কেন ! তোরা কোনদিন চোখে দেখলি না যে দেশঘাট। পাড়াগাঁ কাকে বলে জানলি না শুনলি না বলে কি, পাড়াগাঁ বলে কিছু নেই, বিশ্বাস করতে হবে ?

সরমা বলে, না তা বলছি না।

তবে। যা দেখিসনি, জানিস না, তা নিয়ে তর্ক করিসনি। কলকাতার শহরটাই সব নয়। এ ছাড়াও অনেক দেশ, অনেক গাঁ, অনেক পল্লী আছে। সেখানের লোকজন মানুষও সমাজের কিছু না জেনে, তাদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে যাসনি।

ফিক করে একটু হেসে ফেলে সরমা। দু'পা এগিয়ে বলে, তার মানে তুমি ওসব বিশ্বাস করো, বুঝতে পেরেছি। তারপর মুহূর্ত কয়েক কি ভেবে সরমা প্রশ্ন করে, আচ্ছা মা, সত্যি করে বলো ত, তুমি নিজে চোখে এরকম কিছু দেখেছো?

কেন দেখবো না! তোদের সব একেলে মেয়েদের মত কিছু না দেখে শুনে গুরুজনদের মুখের ওপর তর্ক করতে আমরা শিখিনি। তা মা, খুড়িদের অশিক্ষিত, মূর্খ, যা কিছু তোরা ভাবিস না কেন?

আঃ আমি কি তাই বলেছি তোমাকে! আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছি এসব তোমার শোনা কথা, না তোমার নিজের জীবনে কিছু ঘটেছিল?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশী কথা আর কি বলবো, তোকে নিয়ে কি আমি কম জ্বালা জ্বলেছি! ছেলেবেলায় এমন ফুটফুটে সুন্দর তোকে দেখতে ছিল যে, যখন তখন নজর লেগে যেতো। এই সুস্থ মেয়ে দিব্যি খেলাধুলো করে নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে, এই দেখো গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে—চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ডাক্তার বদ্যি দেখিয়ে কিছুতেই আর জ্বর যায় না গা থেকে। যদি বা ছাড়ে ত ঠিক এক সময়ে আবার আসে। তুই তখন দু'বছরের মেয়ে আর আমারই বা এমন কি বয়েস! আঠারো কি উনিশ, বড় জোর। কলকাতায় মামার বাড়ীতে মানুষ, পাড়াগাঁয়ের কিছুই জানি না। তোর অসুখ শুনে, বামুনপাড়ার গঙ্গাঠাকুরুণ একদিন এলেন দেখতে। বেশ মনে আছে, সন্ধ্যের ঠিক আগে পাখী পক্ষীরা ফিরে সবে গাছের ডালে কিচির মিচির রব তুলেছে। ঘরে ঢুকে তিনি বললে, অ বৌমা হ্যারিকেন লণ্ঠনটা একবার জ্বালো ত মা। আমি তোমার মেয়ের মুখটা একবার ভালো করে দেখবো, চোখে ঠিক ঠাওর হচ্ছে না।

লণ্ঠন জ্বেলে, তোর মুখের কাছে উঁচু করে ধরতেই তিনি বললেন, আ আমার কপাল, যা ভেবেছি তাই। ও যত ডাক্তার বদ্যি দেখাও আর ওষুধের শিশি ভেঙে মেয়ের পেটের ভেতর পুরে দাও, কিছুতেই কিছু হবে না!

ভয়ে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। বললুম, কেন মা এ কথা বলছেন?

নজর লেগেছে যে। ও তোমার বদ্যির চোদ্দ পুরুষের সাধ্যি নেই যে কিছু

করতে পারবে। আমার এই আটষট্টি বছর বয়েস হলো। আট বছরে বিয়ে হয়েছিল, তখন থেকে এখানে আছি, দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গেলুম বৌমা!

কি হবে মা, তাহলে! আমি একেবারে কেঁদে পড়লুম।'

কি হবে। স্যাকরা পাড়ায় হাজারী পালের ছেলে নন্দ পালের কাছে কাল সন্ধ্যেবেলা নিয়ে যেও মেয়েটাকে। বুড়ো খুব ভাল ঝাড়ফুঁক জানে। মন্ত্র পড়ে জলপড়া দেবে তিনটে দিন খাওয়ালেই সব সেরে যাবে।

সত্যি তাই হলো। অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

মায়ের মুখ থেকে এ গল্প শুনে সরমা একটু হাসল। তারপর বললে, 'নিশির ডাক'টা কি রকম মা। সে অভিজ্ঞতাও কি তোমার জীবনে হয়েছিল।

বালাই ষাট! ও নাম শুনলে কি মানুষ বাঁচে নাকি! সেকথা মনে হলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। পাশাপাশি বাড়ী কুসুমপুরে! মাঝখানে শুধু একটা কঞ্চির বেড়া, আর তার সঙ্গে কতকগুলো কুল, চালতা, আমড়া গাছ ডালপালা মেলে ওবাড়ীটাকে যেন ঢেকে রেখেছিল। প্রকাণ্ড চালাঘর, উলুখড়ে ছাওয়া তার মাথাটা উঁচু করে সব সময় আমাদের দক্ষিণের হাওয়াটুকু আটকাতো। আবার ঝড়ঝাপটার সময় ওদের চালের উলুখড়ের টুকরো উড়ে এসে আমাদের ঘরদোর সব নোংরা করে দিতো! একেবারে যাকে বলে এক পাঁচীলে ঘর! বললে বিশ্বাস করবি না সরো, এই দশাসই জোয়ান ছেলেটা চারুবাবুর। এই লম্বা চওড়া, এতখানি বুকের ছাতি। আহা সবে মা-বাপ বিয়ের চেষ্টা করতে শুরু করেছিল। কোথাও কিছু নেই একদিন হঠাৎ একেবারে ভলকে ভলকে মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল।

পাড়াশুদ্ধ ভেঙে পড়লো। হাঁগা দাশুর মা, বলি ব্যাপারটা কি! এ অলুক্ষুণে রোগ কোথা থেকে এলো।

চোখের জল মুছে তিনি যা বললেন, শুনে সবাই একেবারে 'থ' বনে গেল। তার আগের শনিবার ছিল অমাবস্যা। সেদিন কে নাকি শ্মশান জাগিয়ে কালীর পূজো দিয়ে এসে 'নিশি' ডেকেছিল দাশুকে।

সরমা হাঁটছিল মার সঙ্গে। উৎকণ্ঠিত আগ্রহে এবার ফেটে পড়ল। কি করে জানলে যে শ্মশান জাগিয়ে, কালীর পূজো দিয়ে 'নিশি' ডাকতে এসেছিল। বিশেষ করে ওরই কাছে।

চুপ্ করনা, বলছি ত সেই কথাটাই। বলে মেয়েকে থামিয়ে দিয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন নিজের বক্তব্যে। 'নিশি' ডাকের নিয়ম দুপুররাতে, যার

নাম ধরে ডাকবে, একডাকে সে সাড়া দেয় যদি, তাহলে রোগটা গিয়ে তাকেই ধরবে। মরণাপন্ন রুগী যারা, যাদের বাঁচার আশা আর থাকে না, পাড়াগাঁয়ে তাদেরি জন্যে আত্মীয়স্বজনরা এমনি 'নিশি' ডাকের ব্যবস্থা করে।

বেচারী দাশু সারাদিন ঘাটাখাটুনির পর সবে এসে শুয়েছিল। সেদিন আবার শুতেই নাকি বেশী রাত হয়েছিল। ঝাঁঝাঁ করে রাত। পাড়াগাঁয়ের গাছপালা ঢাকা অমাবস্যার সে ভয়ঙ্কর গাঢ় অন্ধকার যে চোখে দেখেনি, তাকে বোঝানো যাবে না কিছুতেই সে অন্ধকারের রূপ কি সাংঘাতিক। চোখের পাতা খুলতে ভয় করে। চাপচাপ জমাট অন্ধকারের পাঁচীল যেন চারিদিকে উঁচু হয়ে আছে। সামনে, পিছনে, উঁচুতে, নীচুতে, যেদিকে তাকাও। নিরন্ধ্র, নিশ্ছিদ্র সে অন্ধকার। গাঢ়, ঘন, জমাট অন্ধকার! সেই ভয়াবহ অমাবস্যার রাতে সবাই যখন ঘুমে অচৈতন্য। চারিদিক নিস্তব্ধ। রাত দুপুর! একটা পাতা, গাছ থেকে খসে পড়লে, গা শিউরে উঠে। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে হঠাৎ কে ডেকে উঠলো, "দাশু আছো" বলে!

কে! বলে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে দাশু। তারপর বাইরের দিকের জানালাটা যেমন খোলে দেখে কেউ কোথাও নেই। সব নিশ্চুপ। শুধু ঝাঁঝাঁ করে রাত শুধু গাঢ় ঘন অন্ধকার চতুর্দিকে! তবে কি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে! তাই হবে। মনকে এইভাবে বুঝিয়ে আবার শুয়ে পড়ে দাশু। কিন্তু পরের দিন ভোর হতে, বুকটা তার ছ্যাঁৎ করে ওঠে। দেখে ওর বাড়ীর সামনে রাস্তার তেমাথায় একটা নূতন সরায় জবাফুলের সঙ্গে কিছু আলোচাল আর তারই পাশ একটা ডাবের মুখকাটা পড়ে আছে!

বুঝতে এতটুকু বিলম্ব হল না তার যে কালরাত্রে 'নিশি' ডেকেছিল তাকে! কোন পাড়ার লোক, কোথা থেকে এসেছিল, কে তার খবর রাখে!

সরমা এবার প্রশ্ন করলে, ডাবটা বুঝি যে নিশি ডাকে, সে খায়।

না-না। সে খেতে যাবে কেন। একডাকে যেই সাড়া মিলবে অমনি সে খপ্ করে ডাবটার মুখ কেটে বাড়ীর কাছে তে-মাথা রাস্তার ওপর ওই পুজোকরা সরা ও ফুলের ওপর সেই লোকটার নাম করে সব জলটুকু উপুড় করে দিয়ে, আর পিছন দিকে না তাকিয়ে চলে যায়।

কি করে তুমি জানলে মা। তুমি কি চোখে দেখেছো?

না দেখিনি। তবে শুনেছি, নাকি এমনি করেই নিশি ডাকে।"

খুক্ করে হেসে উঠলো সরমা অবিশ্বাসের হাসি। বললে, তুমি তাহলে লোকের মুখে শুনেছো, চোখে দেখোনি!

খিঁচিয়ে উঠলেন তিনি মেয়েকে। আ মোলো যা! এটা কি চোখে দেখার বস্তু। তবে হাঁ, তার ফলটা দেখছি নিজের চোখে। তিনটে মাসও কাটল না। ওই পাথরের মত বলিষ্ঠ, জোয়ান ছেলেটা, ধড়ফড় করে মরে গেল।

এই বলে সরমার মা একেবারে মুখ বন্ধ করলেন। সরমাও আর কোন প্রশ্ন ও সম্বন্ধে না তুলে নিঃশব্দে মায়ের সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

একটু পরে একটা চঁড়াই দেখে তার ওপর গিয়ে বসলো ওরা দু'জনে। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছিল মায়ে ঝিয়ে। একটু জিরিয়ে তারপর বাড়ী ফিরবে। যে দিনই একটু বেশী দূরে এসে পড়ে, ওইভাবে কোথাও একটু বসে বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে ফেরার পথে।

সেদিন আচল দিয়ে পাথরের ওপরের ধুলো ঝেড়ে বসতে গিয়ে সরমা প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা মা, তুমি তাহলে ভূত প্রেতেও বিশ্বাস করো।

হাঁ করি। বিরক্তির সঙ্গে জবাব দেন তিনি। আমার মত ওই কুসুমপুরে গিয়ে যদি থাকতে হতো তোকে, তাহলে বুঝতিস্! আর এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতিস না কোন দিন। জ্ঞান হওয়া থেকেই শহরে আছিস কিনা।

তার মানে তুমি কি বলতে চাও। পাড়াগাঁয়ে যারা থাকে, তারা এসব ভূত প্রেত বিশ্বাস করতে বাধ্য। কেন, সেখানে বনজঙ্গলে কি তারা বাস করে।

জানি না! ওই সব অপদেবতাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে তোদের মত শিখিনি আমরা। সত্যিকথা বলতে কি সাহসও নেই।

হাসি চাপতে গিয়েও পারে না সরমা। বলে, তুমি ত আমার মত মামার বাড়ীতে মানুষ হয়েছিলে। তবে তোমার মনে এত সব কুসংস্কার কোথা থেকে ঢুকলো!

বিয়ের পর সাত আটটা বছর যে কুসুমপুরে থাকতে হয়েছিল। সেই সময় অনেক কিছুই দেখেছি, জেনেছি—

তুমি দেখেছো মা ভূত? তাঁর মুখের কথাটা শেষ করতে দেয় না সরমা।

হাঁ দেখেছি।

নিজের চোখে?

নিজের চোখে নয়ত কি পরের চোখে! নিজেদের বাড়ী ভেতরেই যে ঘটেছিল ব্যাপারটা!

সে কি? কৈ শুনিনি ত কখনো একথা তোমার মুখে মা? সরমার চোখে মুখে আগ্রহ ঝরে পড়ে।

হাঁ—তোর ছোট পিসিমার মেজমেয়ে পটলী। সেই যে গোঁদল পাড়ায় যার বিয়ে হয়েছে তাকে ধরেছিল ভূতে, আমি নিজে চোখে দেখেছি। বলেই ঘটনাটা বিবৃত করতে বসলেন এইভাবে।

কুসুমপুরে সেবার পূজোর সময় তোর পিসী পটলীকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। সবে নতুন বিয়ে হয়েছে বছর দুই হলো! তখন সে তিন মাস পোয়াতী, রূপ যৌবন যেন ফেটে পড়েছে। এলো চুলে গাছ তলায় যেতে বার বার নিষেধ করেন তোর পিসী, আমি, সকলে। কিন্তু কে তার কথা শোনে! মেয়ে যেন সব সময় যৌবনের দেমাকে উল্টে আছেন! আর হলোও তেমনি। খিড়কীর দরজার পাশে বকুল গাছে যে অপদেবতা বাস করতো কে জানে। সেদিন শনিবার। ভরসন্ধ্যেবেলা মেয়ে এলো চুলে বকুলফুল কুড়তে গিয়েছিল গাছ তলায়। ফুল আঁচলে নিয়ে ঘরে ঢুকেই মেয়ে একেবারে গোঁ গোঁ করে মুখ গুঁজড়ে পড়লো। চোখ মুখ লাল টকটক করছে। গায়ে দস্যির বল। আমরা তিন চার জনে চেপে ধরে রাখতে পারি না! যা মুখে আসে, গালাগাল মন্দ করতে থাকে। পাড়া পড়শীরা সবাই ছুটে আছে। বলে, এখুনি খবর দাও, ওঝাকে। ভাল ওঝা রমানাথ সে থাকে হালতুর ওদিকে কুমোরপাড়ায়। ছুটলো লোক তাকে ডাকতে।

রমানাথ ঘরে এসে ঢুকতেই কি শাসানি। মেয়ের মুখ দিয়ে যে সব গালি গালাজ বেরুতে লাগল, তা শুনে কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

রমানাথও তেমনি। যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। ও অঞ্চলের ডাক সাইটে ওঝা। অনেক ভূত সে ছাড়িয়েছে, অনেক তার খ্যাতি। প্রথমে বাড়ীতে ঢুকেই, সে বাড়ীটাকে বেঁধে ফেললে। বাড়ীর চার কোণে মন্ত্র পড়ে চারটে কাঠির মত কি পুঁতে দিলে। তারপর শুরু হলো সরষে পোড়া, হলুদ পোড়া! লোহা পুড়িয়ে গায়ে ছ্যাকা পর্যন্ত দিলে তবু ছাড়ে না সে ভূত পটলীকে। বলে যতই তুই আমায় মারিস কিছুতেই তাড়াতে পারবি না। ওঃ সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। পট্‌লীর ওই সুন্দর দেহটা, দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া হয়ে ফুলে উঠলো, মারের চোটে।

ওঝা যেই মন্ত্র পড়ে সরষে পোড়া ছিটিয়ে দেয় তার গায়ে বাবারে, মারে জ্বলে মললুম বলে চেঁচিয়ে ওঠে পটলী।

রমানাথ বলে, বল চলে যাবি এখুনি, নইলে এবার তোর জন্যে মারন মন্ত্র আরম্ভ করবো। সন্ধ্যে থেকে সারারাত মারধোর করেও কিছুতে তাড়াতে পারে না, ভূত পটলীর ঘাড় থেকে নামে না। সে বলে ননদকে বড় বদমাইশের পাল্লায় পড়েছে আপনার মেয়ে মা তবে ঘাব্ড়াবেন না আমিও ওর চেয়ে আরো বদমাইশ। ওর মত ভূত আমি ঢের চরিয়েছি।

এমনি নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা যখন পরের দিনেও তাড়াতে পারলে না ভূত সকাল দুপুর গড়িয়ে গেল, তখন রমানাথ নিজে গিয়ে তার ওস্তাদকে ডেকে নিয়ে এলো বোষ্টমঘাটা থেকে। রোগা ছিপছিপে কাঠির মত হাড়সার চেহারার একটা বুড়ো। গলায় কালো স্থতোর সঙ্গে একটা হাড়ের টুকরো বাঁধা। সে, এসে অনেক রকম মন্ত্রতন্ত্র পড়ে অনেক প্রক্রিয়া করলে, তারপর একটা লোহার ডাণ্ডার মুখটা উনুনে গরম করে পট্লীর গায়ে যেমন ছাঁকা দিলে, অমনি সে হাঁউ মাউ করে নাকিস্থরে চীৎকার করে উঠলো, ওরে মেরে ফেললে রে, আর পারি না আমি।

ওস্তাদ চীৎকার করে ওঠে, বল ওকে ছেড়ে এখুনি চলে যাবি। নইলে তোর সারা গা পুড়িয়ে দেবো!

হাঁ যাবো ঠিক বলছি যাবো কিন্তু ও কেন অমন আলুথালু হয়ে ওর রূপ যৌবন আমায় দেখায় রোজ!

আচ্ছা আর দেখাবে না। আমি কথা দিচ্ছি। তুই ওকে ছেড়ে তাহলে চলে যা। আমরাও তোকে কিছু বলবো না। কিন্তু চিরদিনের মত এই ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আচ্ছা তাই হবে।

না, শুধু মুখের কথায় তাই হবে বললে, আমরা ভুলছি না। কাজে দেখাতে হবে। এক ঘড়া জল এই রাখলুম ঘরে এটাকে মুখে করে নিয়ে তোকে বেরিয়ে যেতে হবে ঘর থেকে। তারপর যে গাছাটায় তুই থাকিস্, তার ডাল ভেঙে দিয়ে প্রমাণ করবি যে তুই এভিটে ছেড়ে চলে যাচ্ছিস চিরদিনের জন্যে!

আশ্চর্য! গায়ে আজও কাঁটা দেয় সেকথা মনে হলে। এত বড় পেতলের ঘড়া ভর্তি জল, দাঁত দিয়ে কামড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে খিড়কির

দরজার কাছে নিয়ে গিয়েই আছড়ে পড়ে গেল পটলী। সঙ্গে সঙ্গে মড় মড় করে একটা বকুল গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়লো।

সরমা প্রশ্ন করলে, আর পটলদির তখন কি হলো।

সে ত তখন অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। তার ওপর তখন নানা রকম মন্ত্র পড়ছে ওঝারা। মুখে চোখে মাথায় জল দিয়ে হাওয়া করতে করতে বোধহয় আধঘণ্টা পরে সে চোখ চাইল। আশ্চর্য একেবারে স্বাভাবিক চাউনী। চোখের সে লাল ভাব আর নেই। চারিদিকে এতলোকজন দেখে লজ্জায় তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড টেনে বুকে পিঠের কাপড় সামলে উঠে বসলো।

অথচ এই পট্‌লীর এতক্ষণ লজ্জা সরমের কোন বালাই ছিল না। গা থেকে কাপড জামা খুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল। এত যে দর্শক চারদিকে এত মেয়ে পুরুষের ভীড়, কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ওই সমস্ত মেয়ে, তায় ওই রকম রূপ যৌবন, একেবারে উদোম উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। কল্পনা করতে পারিস? তোর পিসী যত গায়ের ওপর শাড়ীটা জড়িয়ে দেয়, তত খুলে ফেলে। ঘর থেকে অন্যসব লোকজনকে বের করে দিলেও ওই তুটো অজানা মদ্দ, ওঝাদের চোখের সামনেই ত সব কিছু হচ্ছিল। তাদের মারের চোটে পট্‌লীর ধবধবে ফর্সা পিঠখানায় কালসিটে পড়ে গিয়েছিল। সে দাগ মিলতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল।

এই একটা কারণই যথেষ্ট নয়? বলে একটু থেমে সরমার মুখের ওপর নিজের চোখতুটো দৃঢ়বদ্ধ করেন তিনি। তারপর বলেন যদি সত্যি সত্যি ভুত প্রেতে ওকে না পেয়ে থাকতো তাহলে কি ওই ভাবে নগ্ন হয়ে এত জোডা চোখের সামনে কোন সুস্থমেয়ের পড়ে থাকা সম্ভব হতো! তার ওপর ওই মার—লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া পর্যন্ত সুস্থ মস্তিষ্ক স্বাভাবিক মেয়ে হলে কি কখনো সহ্য করতে পারতো! আর অত বড় একঘড়া জল দাঁতে করে টেনে ঘর থেকে খিড়কীর দরজা পর্যন্ত নিয়ে যেতে কি কোন মেয়ে পারে যদি তার দেহে একটা অপদেবতা ভর না করে।

সরমা কণ্ঠের বিস্ময় চেপে প্রশ্ন করে, আচ্ছা মা, পরে এ সম্বন্ধে কোন কিছু তোমাদের বলেনি পটলদি!

ওমা সে বলবে কি! উল্টো আমরা অনেক রকম করে জিজ্ঞেস করে দেখেছি কিছুই তার স্মরণ নেই। শুধু গায়ের ওই কালসিটেগুলো দেখে প্রশ্ন করেছিল, এসব কোত্থেকে এলো! কিসের দাগ!

সরমা বলে, আশ্চর্য কাণ্ডত !

হাঁ, আমার কথায় বিশ্বাস না হয় ত তোর ছোট পিসীর সঙ্গে যখন দেখা হবে জিগ্যেস করিস।

সরমা চুপ করে চেয়ে থাকে পাহাড়ের দিকে। সেখানে যেমন আলোছায়ার খেলা চলে, তেমনি বুঝি ওর মনের ভেতরে জ্ঞান ও অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শুধু ভাবে মা যা বললে এখন. তাকি সত্যি এখনো সম্ভব !

মুহূর্ত কয়েক পরে সরমা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। চলো মা অনেক দেরী হয়ে গেল, দেখো সূর্যটা পাহাড়ের মাথার ওপর কতটা উঠে গেছে, অন্যদিন আমরা এ সময় বাড়ীতে পৌঁছে যাই। বাবার চা খেতে আজ কত দেরী হয়ে যাবে।

তা তুই-ই ত দেরী করলি। আমি মনে করলুম বুঝি এতটা পথ এসে হাঁপিয়ে পড়েছিস, তাই কিছু বলিনি এতক্ষণ।

॥ ৮ ॥

সাঁওতাল পাড়াটার ভেতর দিয়ে পায়ে হাঁটা একটা মেঠো পথ এঁকে বেঁকে গেছে নদীর ধারে। ওই পথে গেলে অনেকটা সংক্ষেপ হয় সরমাদের। বাড়ী পৌঁছতে পারে তাড়াতাড়ি। কিন্তু এ পথটা বরাবরই সরমা এড়িয়ে চলে! কি জানি কেন সাঁওতালদের পুরুষগুলোর দিকে চাইলে ওর বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে থাকে। অথচ ওদের মেয়েছেলেগুলো একেবারে বিপরীত। তাদের দেখতে ওর খুব ভাল লাগে। কাল তেল কুচকুচে রং যেন কোষ্ঠি পাথরের খোদাই করা মূর্তি সব। অন্ততঃ এতদিন যে সব মেয়ে ওর মেয়ে ওর চোখে পড়েছে তাদের অধিকাংশর দেহ যেন শিল্পীর সাধনার ধন ! কোন ভাস্কর নিভৃতে বসে একটির পর একটি তৈরী করেছে। বিশেষ করে তরুণী যুবতীদের ত কথাই নেই। সরমার চোখের পলক পড়ে না, তাদের দৈহিক সৌন্দর্য্য যেন দু'চোখে গেলে? বিরল বসনা। প্রায় উলঙ্গ সেইসব নারী কি কষ্ট, দারিদ্র ও অভাবের মধ্যে বাস করে, তা সে চোখে দেখেছে। তারা যে কঠিন পরিশ্রমের কাজ করে তার বদলে কতটুকু খাদ্য পায়। ভোরে উঠে কাঁসার সানকী থেকে জলে ভেজানো পান্তাভাত চারটি শুধু নুন দিয়ে খেয়ে বেরিয়ে যায়, যেথায় কর্মস্থলে। তারপর ফিরে এসে সন্ধ্যার সময় উঠোনো কাঠ কুটো, শুকনো গাছের ডালপাতা যার যেমন জোটে তাই

জেলে একটা কালি পড়া কুচ কুচে হাঁড়ীতে করে ভাত ফোটায়। তার ফেনটা খেয়ে ভাতটা আবার জল ঢেলে চাপা দিয়ে রেখে দেয় পরের দিন ভোরের জন্যে।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে সরমার ওদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বভাবটা। ধুলোকাদা মাটিতেই যাদের সকল সময় শোয়াবসা তাদের দেহ অমন কান্তিময়ী থাকে কি করে ও ভেবে পায় না। ধুলো কাদার চিহ্ন মাত্র নেই তাদের দেহের কোথাও, উল্টে সবসময় মনে হয় যেন কোষ্টিপাথরের মূর্তিতে কে ঘামতেল মাখিয়ে চকচকে করে রেখেছে। মেয়েগুলোর স্বভাবই পরিষ্কার—খুব কাছে থেকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে। ওদের ওই ঘরগুলোই তার প্রমাণ। মেয়েরাই নিজেরহাতে তাকে নিকিয়ে মুছিয়ে এমন শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। খট্‌খট্ করে যেমন বাইরেটা তেমনি ভেতর—দেওয়াল উঠোন, ঘরের মেঝ, দাওয়া, ঢেঁকিশালা, গরু ছাগল বাঁধা আছে যে গাছগুলোর তলায় সেখানটাও পর্যন্ত ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার। খুট্ খুট করে মুরগীগুলো ঘরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে যেখানে যা পড়ে থাকে সেগুলো খেয়ে নিচ্ছে। এর ওপর আছে রঙের নেশা। মেয়ে-গুলোর মত ওই খড়ের চালদেওয়া মেটে ঘরগুলোর ভেতর বাহির তাই রাঙিয়ে রেখেছে। গেরুয়া রঙের মাটি এনে দেওয়ালের ওপর দিকটায় যেমন প্রলেপ দেয় তেমনি নীচের দিকে দেয় কালোমাটির রঙ। দেওয়ালের ওপরের অর্ধেকটা গৈরিক, আর নীচের অর্ধেকটা কালো। আলপনার মত কারো কারো দেওয়ালে চিত্র বিচিত্র।

সবচেয়ে সাজে মেয়েরা হাটবারে। বুধবার দিন ওখানকার হাট। সেদিন মেয়েমদ্দ সব কর্মস্থল থেকে বারোটা লাগাত একে একে ঘরে ফিরতে থাকে। এসেই ঘাটে যায় স্নান করতে কাপড় কাচা সাবান আর তেলের শিশি হাতে নিয়ে। মেয়েদের হাতে থাকে এক টুকরো করে কাপড় কাচা সাবান। কেউ কেউ শিশি করে একটু তেল ও নিয়ে যায়। নদীতে নেমে আগে তার পরণের শাড়ীখানাকে খুলে পাথরের ওপর ঘসে ঘসে ফর্সা করে। তারপর মেলে দেয় রোদ্দুরে, সেইখানেই। পাথর বিছানো পাড়ের ওপর মেলে দিয়ে নিজেরা নাইতে নামে জলে ওই একখানাই কাপড়। ওটাকে শুকিয়ে নিয়ে তবে ঘরে যাবে তাই এই সময়টা তারা ব্যয় করে যেন ফষ্টিনষ্টি করে। হেসে গড়িয়ে পড়ে তরুণী যুবতীরা সব। জল ছোঁড়াছুড়ি করে এঘাটে ওঘাটে, ছোঁড়াতে ছুঁড়ীতে। লজ্জা সরমের বালাই নেই। স্নানরত, নগ্ন দেহ সকলের। মাথার ওপর রৌদ্রোজ্জ্বল

নীলাকাশ। চতুর্দিকে পাহাড়ের পাঁচীল, আর প্রহরীর মত বনস্পতির দল ধীর স্থির অচঞ্চল।

এখনো যে এমন দেশ আছে, এমন জায়গা আছে কোথাও তা সে জানতো না। নিজের চোখে না দেখলে কারুর মুখের কথা শুনে ও বিশ্বাস করতে পারতো না, ঠিকই। দু'তিন ঘণ্টা ঘাটে কাটিয়ে সেই কাপড় শুকিয়ে ফর্সা করে নিয়ে তবে মেয়েরা ঘরে ফেরে। তারপর বয়েস অনুসারে জোট বেঁধে হাটের পথে যাত্রা করে। একা একা বড় একটা কোন মেয়েকেই পথে দেখা যায় না। তারা হাটে কারো কোমরে একটা ঝুড়ি, কারো বা হাতে দড়িবাঁধা একটা ছোট কেরাসিনের বোতল। ওদের মরদগুলো হাটে যায় জিনিস কেনা বেচা করতে। তাবা কেউ এভাবে সাজগোজ করে যায় না। মেয়েরা পরিষ্কার সাবান কাচা শাড়ী পরে, মাথায় চুলে ফুল গুঁজে, মিহিসুরে সকলে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতে গাইতে হাঁটে না। আসলে হাটে যাওয়া ওই আইবুড়ো, কুমারী মেয়েদের একটা ছল! ওরা জিনিস কিনতে যায় না, নাগর ধরতে যায়। হাটটা ওদের মেয়ে পুরুষের একটা পূর্বরাগের ক্ষেত্র! তাই হাটের দিনে মেয়েদের এত ঠসক। গরবিনীরা যেন দেমাকে উল্টে পড়ছে! যৌবনের সুরা ওদের দেহের পাত্র থেকে যেন উপচে উপচে পড়ে।

ওদেরই পথ চেয়ে তেমনি আগেভাবে হাটের কোন এক নিভৃত প্রান্তে বড় একটা ছায়াঘন বৃক্ষেব তলায় প্রতীক্ষা করে থাকে বুঝি কৃষ্ণের দল! তেলকুচকুচে বাবরি কাটা চুল, তাতে কাঠেব কাঁকুই গোজা, কারোবা হাতে একটা বাঁশের বাঁশি, কারো হাতে দড়ি বাঁধা একটা লড়াইয়ে মুরগী! নারীদের চোখের ফাঁদে ধরা পড়ার জন্যে যেন তারা চুলবুল করে।

এইভাবে যখন কোথাও মন মজে কারো তখন জগমাঝির কাছে গিয়ে মেয়েটি জানায় কে তার মনের মানুষ। জগমাঝি যুবকটির সঙ্গে দেখা করে তার মনের অভিপ্রায় কি জেনে তারপর ওদের দুজনের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। এটাকে স্বয়ংবর প্রথা বলা যেতে পারে। সাধারণত একটু বেশী বয়সের মেয়ে ছেলেরাই এইভাবে বিয়ে করে। নইলে ঘটক ঘটকীর সাহায্যে আমাদের সমাজে যেমন ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়, বাপমায়ের সম্মতিক্রমে, ওদের ভেতরেও ঠিক সেই প্রথা প্রচলিত আছে এখনো।

মেয়ে ছেলের বিয়ের ব্যাপারে এই জগমাঝি হলো প্রধান। এক এক গ্রামে এক একজন এই রকম জগমাঝি থাকে, তার মারফৎ-ই বিবাহ ঘটিত ব্যাপার

সব কিছু সম্পন্ন হয়। যেমন গ্রামের আর সব কিছু ব্যাপারে সমাজের মাথা হলো সর্দার বা মাঝি, তার ওপর আর কারুর কোন কথা চলবে না। সে হলো গ্রামের মাথা তার ওপারই সমাজের সব কিছু শাসনের ভার। তেমনি এই জগমাঝির কর্ত্তব্য হলো শুধু লক্ষ্য রাখা সমাজের কোথাও না কোন ব্যাভিচার ঘটে। ছেলে মেয়েরা না বিপথে যায়। তাদের চরিত্রের ওপর কড়া নজর রাখার দায়িত্ব তার গোয়েন্দার মত তাই সব কিছু করতে হয় তাকে। যদি কোন মেয়ে পুরুষ লাম্পট্য বা বেলেল্লাগিরি করে অথচ জগমাঝি তা ধরতে না পারে তাহলে শাস্তি পেতে হবে তাকেই। এই শাস্তির ব্যবস্থাটাও চমৎকার। গ্রামবাসীরা তাকে ধরে নিয়ে সর্দার বা মাঝির গোয়ালঘরের খুঁটির সঙ্গে আষ্টে পিষ্ঠে বেঁধে তারপর গো বেড়োন ঠ্যাঙানি দেয়। অবশেষে এই জগমাঝিকে বেশ কিছু জরিমানা দিয়ে তবে মুক্তি পেতে হয়।

॥ ৯ ॥

সরমা এই ক'দিনেই লক্ষ্য করেছিল, ওদের ভেতরেও বেশ ছোঁয়াছুঁয়ি ও জাত-কুল নিয়ে মানামানি আছে। একদিন সরকার বাংলার পাশ দিয়ে বেড়িয়ে ফিরছিল এমন সময় দেখে ভাঙা পাঁচীলের ভেতরে যে বড় ইদারাটা সেখানে কয়েকটা সাঁওতাল স্ত্রীলোক দুর্বোধ্য ভাষায় একে অপরকে গালিগালাজ দিয়ে চলেছে। কখনো হাত মুখ নেড়ে, কখনো বা চীৎকার করে, ক্ষিপ্ত হিংস্র ভঙ্গীতে অন্তরের বিষ কে কত বেশী ঢালতে পারে, তার প্রতিযোগীতা লেগে গেছে যেন।

সরমা বাবার সঙ্গে যেদিন ফিরছিল প্রাতঃভ্রমণ করে। হঠাৎ পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে, কিছুক্ষণের মধ্যে সে ওদের ওই বিবাদের মূল কারণটার হদিস করতে পারলে। কোন একজন মেয়ে, আর এক জনের কলসী ছুঁয়ে দিয়েছে, তারা নাকি ওদের চেয়ে জাতে অনেক নীচে। কাজেই এখনি একটা নতুন মাটির কলসী তাকে কিনে দিতে হবে, ও-কলসী সে আর স্পর্শ করবে না।

এদিকে অপরাধিনী তারস্বরে তার প্রতিবাদ করে এই কথাটাই বোঝাতে চাইছে যে, ও কলসীটাকে ছোঁয়নি, মিথ্যা কথা বলছে সে, তাকে অপদস্থ করার জন্যে। এই নিয়ে দুটো দলের সৃষ্টি। এক দল বলছে, হাঁ ও ছুঁয়ে দিয়েছে, তারা দেখেছে। ওদিকে আরো কয়েকজন তা অস্বীকার করছে। এ[illegible]

জংলীরা বেশী হিংস্র হয়, তার ওপরে আবার সেই চিরন্তন নারী জাতির কলহ-প্রিয়তা যুক্ত হয়েছে। উভয়ে যদিও কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে, যে যার দড়ি ও কলসী হাতে নিয়ে, তবু মনে হচ্ছে যেন একজন অপরজনকে একলা পেলে এখনি টুঁটি টিপে ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলে।

আমাদের জাতের মতই ওদের মধ্যেও শ্রেণী ভেদ, উচ্চনীচতা বোধ আছে। এটা সেদিন প্রত্যক্ষ করে একটু বিস্ময় বোধ করেছিল সরমা। তার ধারণা ছিল, ওরা সবাই বুঝি এক শ্রেণী, এক জাত। কেবল সাঁওতাল নয় হো, মুণ্ডা প্রভৃতি আরো কয়েকটির সংমিশ্রণ আছে ওদের ভেতরে তা জানতো না। তাই দলাদলি, ভেদবুদ্ধি যে ওই অসভ্যদের ভেতরেও এমন উগ্র, বাইরে থেকে ওদের চোখে দেখে অনুমান করা সত্যিই কঠিন।

ওদের দোষ দেবে কি! সরমার মা এখনো ঝি চাকর রাখার সময় প্রশ্ন করেন, তোরা কি জাতরে? ওর বাবা ও সরমা দু'জনেই এতে বিরক্ত বোধ করে। বলে, জানো আজকালকার দিনে একটা ভাল লোক পাওয়া, ভাগ্যের কথা। অথচ সরমার সেই প্রাচীন গ্রাম্য মনোভাব কিছুতেই ত্যাগ করতে রাজী নন। যেই শোনেন বাগ্দী, কি কাওরা, এমনি বলেন, না, ওর হাতের জল চলবে না। এতে বিরক্ত হয়ে ঝি হয় তো জবাব দেয়, তোমাদের চেয়ে কত সব বড় বড় বাবুদের বাড়ী আমরা কাজ করছি, কই তারা ত বলে না কেউ একথা মা?

যার যেমন অভিরুচি। কিন্তু আমি পারব না—এত কালের অভ্যাসটা ত্যাগ করতে।

ওদের বিয়ের ব্যাপারটাও বেশ মজার! সরমা ইতিমধ্যে কিছু কিছু জেনেছে। বাড়ীর কাছেই যে ক ঘর সাঁওতালের বাস, তাদের মেয়েদের সঙ্গে সে বেশ জমিয়ে নিয়েছিল। দুপুরের দিকে ওর মা বাবারা যখন দিবানিদ্রা যান, আর ওর চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না তখন ওই সব সাঁওতালদের পারিবারিক জীবন জানবার কৌতুহল নিয়ে যেচে গিয়ে সে ওদের সঙ্গে আলাপ করে।

পুরুষরা সাধারণত এই সময়টা কেউই ঘরে থাকে না। সোমত্ত মেয়েরা যারা কাছে-ভিতে কাজ করতে যায় তারা ফিরে আসে, রোজ বজায় দেয়, তাদের কাছে গিয়ে সরমা বিশ্রান্তালাপ জুড়ে দেয়। ওদের ভাষা সব বুঝতে না পারলেও মোটামুটি কি বলতে চায়, সেটা অনুমান করতে এতটুকু কষ্ট হয় না সরমার।

শুকনো খট্‌খটে, নিকানো মুছানো মাটির উঠানের একটা জায়গায় গিয়ে হঠাৎ বসে পড়ে সরমা। বেশ ভাল লাগে তার এদের বাড়ীর ভেতরগুলো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আলোবাতাস যুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তারপর কথোপকথন ছলে সামনে যে মেয়েটাকে দেখতে পায় প্রশ্ন করে, কি রে আজ তুই কামকে যাস নি ?

হাঁ। যাবো না ই কেনে ?

কখন এলি ! আবার কি খেয়ে দেয়ে যেতে হবে নাকি ?

না। এক বেলা আমরা কামকে যাই।

তুই কি কাজ করিস ?

মেয়েটা জবাব দেয়, এই করছি সব রকম কামরে। কথা শেষ না করে 'রে' বলে এক প্রকার সুর টানে ! বেশ মিষ্টি লাগে তা সরমার কানে।

কি রকম তবু বলনা, শুনি।

এই পাথর ভাঙি, কখনো কাঠ জঙ্গল থে.ক বয়ে আনি, কখনো বা বালি তুলি ঝুড়ি করে নদী থেকে।

তা তোর বর কাজ করে না ?

বরের অর্থটা বুঝতে না পেরে, মেয়েটা বলে, কি বুলছিস ?

সরমা বলে, তোর মরদ আছে ত, তাই বলছি, সে কাজ কাম করে না ?

হঁা, করছে ত ?

সে বুঝি সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে।

হঁা রে।

মেয়েটির সঙ্গে যখন গল্প জমিয়েছে সরমা, নদী থেকে তখন বড একটা মাটির কলসীতে জল ভরে নিয়ে আসে আর একটি মেয়ে।

ও তোর কে হয় রে ? তাকে দেখে প্রশ্ন করে সরমা।

মেয়েটা একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলে, বুন হয় রে ?

বোন ? কি রকমের বোন ? তোদের দুজনের চেহারায় তো কোন মিল নেই !

এর জবাব দিলে কলসীটা নামিয়ে রাখতে রাখতে সেই মেয়েটা। বললে, আমার মরদটা মরে গেল তখন ওর ছোট ভাইটা উয়ার মরদ বিয়া করলেক আমায়। ও একটা বৌ হচ্ছে বটেক, আর আমি একটা ! আমি বড়, ও ছোট !

ও তার মানে তোরা দুই সতীন ? একটা মরদকে বিয়ে করেছিস ?

দুজনেই এক সঙ্গে হেসে উঠলো। সরল হাসি। ছোট মেয়েদের মত যেন ও একটা কি মজার কথা বলেছে।

সরমা তখন ভাবতে থাকে, বড় ভাইয়ের বিধবাকে বিয়ে করলে ছোট ভাই! এ কি বিদ্‌ঘুটে নিয়ম রে বাবা। একটু পরে কণ্ঠে রস ঢেলে সে শুধায়, হ্যারে. তা তোদের ঝগড়া হয় না, দুজনে? এক বরকে ভাগাভাগি করে নিস্ কি ভাবে?

কেন হবেক ঝগড়া? বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দুজনে তাকিয়ে থাকে সরমার মুখের দিকে।

সরমা মুচকি হেসে বলে, তা হলে তোরা এক সঙ্গে ঘর করিস! তোদের কাকে বর বেশী ভালবাসে রে?

ওদের মধ্যে যার বয়েস কম, সে ঘটা করে বলে উঠলো, দুজনকেই সমান ভালবাসে? বলেই মেয়েটি হঠাৎ সরমাকে প্রশ্ন করে বসলো, তা তুর বিয়া হয়নি কেনে? এত বড় বেটি ছানা।

সরমা ঠোঁটের কোণে হাসি চাপতে চাপতে বলে, কোন মরদ আমায় পছন্দ করে না, কি করবো বল? তোরা দেনা একটা মরদ আমায় জোগাড় করে।

খিল খিল করে ওরা দু'জনে এক সঙ্গে হেসে ওঠে, অবিশ্বাসের হাসি। যেন এমন অসম্ভব কথা শোনেনি কখনো।

হাসছিস যে! সত্যি বলছি! তোদের মরদগুলোকে আমার খুব ভাল লাগে। আমি বিয়া করবো। তোদের এইখানে ঘরে থাকবো, এমনি করে কাজ কাম করবো তোদের সঙ্গে!

আবার এক চোট তেমনি জোরে হেসে ওঠে ওরা। তারপর বড় জনা বলে, হামাদের মরদরা তোরে বিয়া করবেক নাই।

কেন জাত যাবে নাকি?

হাঁ। বলে সে যা বললে তার অর্থ. কোন বে-জাতের মেয়ে বিয়ে করলে তাকে 'একঘোরে' করে দেয় ওদের সমাজ থেকে। তার ধোপা, নাপিত জল বন্ধ হয়ে যাবে। তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক সবাই ছিন্ন করে দেবে!

আর বিয়া না করে যদি গোপনে "আশনাই করে" তা হলে?

বড় বৌটা একটু রঙ্গ রস করতে জানে। সে খপ করে বলে উঠলো, আমার মরদটার সঙ্গে আশনাই করবি, উয়ার ত খুব পছন্দ তুকে।

সে আমায় দেখেছে নাকি? সর্বনাশ! ওদের পুরুষগুলোর মুখ মনে পড়লে সরমার বুকের ভেতরটা দুরদুর করে ওঠে।

হাঁ, দেখবেক নাই কেনে? সবাই ত তুকে দেখেছে। এত দিন আছিস এখানে।

কথার মাঝখানে দু'টো ছাগলের দড়ি ধরে একটা বুড়ি পিছনের কঞ্চির বেড়া ঠেলে বাড়ীতে এসে ঢুকলো।

ও তোদের কে রে?

ছোট বৌটা বললে, আমাদের মরদের মা।

ও, তোদের শাশুড়ী! হাঁরে তোদের ছেলেমেয়ে ক'টি?

বড়টি জবাব দিলে, আমার চারটা। ছোটটি বললে, আমার তিনটা।

কৈ তাদের ত দেখছি না! তারা সব কোথায়?

গেছে কুথাকে মাঠে জঙ্গলে হবেক।

বলতে বলতেই তিন চারটে ছেলেমেয়ে মাথায় ছোট ছোট কাঠের বোঝা নিয়ে হাজির হলো। কোমরে সুতোর সঙ্গে, এক চিলতে লেংটি বাঁধা, দেহের আর কোথাও কিছু নেও, সমস্তটা নগ্ন। রোগা রোগা শুকনো চেহারা, বয়স যে কার কত মুখ দেখে অনুমান করা শক্ত। ওদের ছেলেমেয়েগুলোর যেন বাড়বাড়ন্ত নেই, খেঁকুড়ে গঠন, যাকে ছ' সাত বছরের দেখে মনে হয়, আসলে তার বয়স তখন হয়ত দশ কিংবা এগারো। আলো বাতাস বা সারের অভাবে যেমন গাছের ফল বাড়তে না পেয়ে, কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়, অনেকটা সেই রকম। ওই দলে ছিল দু'টো মেয়ে ও দুটো ছেলে। ওর ভেতর একটা মেয়ে ছিল একেবারে দল ছাড়া, গোত্র ছাড়া। তার গায়ের রং রীতিলত ফর্সা, চোখ মুখ ও নাক কোনটাই সাঁওতাল জনোচিত নয়।

তাকে দেখে চমক লাগে সরমার। পথে ঘাটে অনেক অনার্য ছেলেমেয়ে এই ক'দিনে দেখেছে, কিন্তু এরকম চেহারা কোনদিন নজরে পড়ে নি।

এই বৌ ওই মেয়েটা কি তোর নাকি?

জ্যেষ্ঠা উত্তর দিলে, না।

তবে বুঝি তোর? বেশ সুন্দর দেখতে ত?

ছোট বৌটা ও মুচকি হেসে বললে, না রে উটা আমায় বেটি লয়।

তবে, কার?

এবার ছোট বৌটার জবাব থেকে সরমা বুঝতে পারলে যে, ওটা ওর ছোট

দেওরের মেয়ে। সে দেওর বেঁচে নেই। কিন্তু তার স্ত্রী জীবিত, তবে এখানে থাকে না।

কোথায় থাকে রে সে তার মেয়ে এখানে রয়েছে? প্রশ্ন করে সরমা।

বৌ দু'টো পরস্পরের দিকে একবার নীরবে তাকিয়ে নিয়ে বলে, কুথাকে গেঁইছে জানিনা। বুলতে পারিনা। কথাটা ছোট বৌটা শেষ করার আগেই বডটা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে যেমন হেসে উঠলো ছোটটাও আর হাসি সংবরণ করতে পারলে না, ওর সঙ্গে যোগদিলে।

ব্যাপার কিরে এত হাসছিস কেন?

জানি না রে। বলে দুজনেই ঘরের ভেতরে চলে গেল।

বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলো যারা এতক্ষণ সরমার মুখের দিকে কৌতুহল ভরা চোখ তুলে দাঁডিয়ে ছিল, তারা শুধু খেনো তেমনি রইল দাঁডিয়ে।

সরমা এবার সেই মেয়েটাকে প্রশ্ন করলে, তোর নাম কিরে?

গুলা!

গুলা? সরমা বলে, এ কেমন নামরে?

সবচেয়ে ছোট ছেলেটা থপ্ করে বলে ওঠে, গুলাবতী!

সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে একটা হাসির তরঙ্গ ফেলে যায়। যেন কি একটা দারুণ তামাসা করলে ছেলেটা!

সরমা মেয়েটিকে এবার জিজ্ঞেস করে, হঁ্যারে তোর মা এখানে আসে না।

এর কোন জবাব না দিয়ে ছুটে মেয়েটার সঙ্গে ছেলেগুলোও সব বাইরে বেরিয়ে যায়।

অবশ্য এ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, তিন চার দিন পরে।

সেদিন দুপুরবেলা বাইরে বেরিয়ে সরমা দেখে একটা বুড়ি তিন চারটে গরু ওদের ভাঙা পাঁচীলটার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে আছে একটা লাঠি হাতে নিয়ে ফটকটার পাশে।

এখানে তুমি কি করছো বুড়ি?

বুড়ি বলে, গরুগুলোকে ঘাস খাওয়াইছে দিদিমণি!

তোমার ঘর কোথায়?

বুড়িটা বললে সেদিন সরমা যে বাড়ীটায় গিয়েছিল, ওটাই ওর ঘর।

কই তোমায় ত দেখিনি সেখানে?

সে বলে, বাড়ীর মাঠে ছাগল ছেড়েদিয়ে বসেছিল তারপর ভাঙা বেড়ার

ভেতর দিয়ে যখন ভেতরে এলুম দেখি, তুই আমার বৌয়ের সঙ্গে কথা বুলছিস ?

ও—হাঁ-হাঁ মনে পড়েছে। তোমার বড় ছেলে বুঝি মরে গেছে, আবার ছোটটাও বেঁচে নেই।

হাঁ, দিদিমণি! গলার স্বরটা করুণ শোনালো।

তা তোমার মেজ ছেলের বুঝি ছ'টা বৌ! বড ভাইয়ের বিধবাকে সে বিয়ে করলে তোমাদের সমাজে কিছু বলে না ?

না। উটাই আমাদের লিয়ম হচ্ছে দিদিমণি! কিন্তুক ছোট ভাইয়ের বৌটাকে বিয়া করতে পারবেক না। এমন কি ছোট ভাইয়ের বিধবার বিছানা ছুঁলে পাপ হয়। তাকে 'বোঙা'র (দেবতার) মত ভক্তি শ্রদ্ধা করতে হয়।

তাই বুঝি বড় ভাইয়ের বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছো ছেলের !

হাঁ, আমি বুড়া হয়েছি। এত কাজ কর্ম কে করে। ছেলের তাই দুটো বিয়ে দিয়েছি। ওরা দুজনে মিলেমিশে সব কাজ করে। ক্ষেতের কাজ, ঘরে গরু, ছাগল, মুরগী যা আছে, তাদেরও ত দেখাশুনা করার লোক চাই !

তা হাঁ গো বুড়ি তোমার ছোট বৌকে আনলেই-তো পারো ? সে বুঝি বাপের বাড়ীতে থাকে !

না দিদিমণি! সে তো পেলিয়েছে গেল, একটা মরদের সঙ্গে—ছেলেমেয়ে সব ফেলে রেখে। ওরই জন্যে ত, আর একটা বিয়ে দিতে হলো ছেলেটার। ওর অতগুলো ছেলেমেয়েকে দেখবে কে ?

অনেক ছেলেমেয়ে বুঝি তার ?

হাঁ, চারটে! তিনটা বেটি, একটা বেটা!

সরমার মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠতে দেখে, বুড়িটা বলে। দুটো বেটির ত বিয়া হয়ে গেছে। এখন আর একটা বেটির বিয়া দিতে হবে।

সরমা জানতো ওদের ঘরে আমাদের মত কন্যাদায় নেই। বরং উল্টোটাই আছে। মেয়েকে পণ দিয়ে ছেলেদের বিয়ে করতে হয়। এক কুড়ি বা দু কুড়ি টাকার সঙ্গে একটা দুটো গরু ছাগল। কোথাও বা অবস্থাভেদে বেশী কমও দিতে হয় পণ হিসাবে, মেয়ের বাপ বা অভিভাবকে।

হাঁগো বুড়ি। এতগুলো ছেলেমেয়ের মা, তার মনকেমন করে না ওদের জন্যে। ওদের দেখতে আসে না, একদিনের জন্য! সে কোথায় থাকে ?

সে কোনদেশে আছে, কি জানি। কত খুঁজলো কোথাও সন্ধান পেলো

না। তাছাড়া আর এদিকে আসবে সে কোন মুখে! এ গাঁয়ে তাকে কেউ ঢুকতে দেবে না, মেরে তাড়িয়ে দেবে। সে এখন সমাজভ্রষ্টা!

ওদের নাকি এসব ব্যাপারে সামাজিক আইন বড় কড়া! যার সঙ্গে যার মন মজলো, তাকে নিয়ে ইচ্ছেমত পালাতে পারে, তেমনি ফেরার পথে কণ্টকাকির্ণ।

সরমা এবার জিজ্ঞেস করলে, তা তোমার এই নাত্‌নীটা এত সুন্দর চেহারা পেলে কোথা থেকে? তোমাদের জাতের মধ্যে ত এমন ফর্সা রং কারুর নেই!

বুড়িটা সহজ সরল কণ্ঠে উত্তর দেয়, ও তো পল্টনের মেয়ে দিদিমণি!

কি করে জানলে?

এর উত্তরে যা বললে বুড়ী, তার সরল অর্থ হলো এই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাদের একটা ছাউনি পড়েছিল। ওই ফুলডিহী পাহাড়টার কাছে। কাঠ আনতে যেতো বৌটা সেইখানে জঙ্গলে। কত ভাল ভাল মদ, বিস্কুট, কেক্‌ নিয়ে আসতো রোজ। এই পর্যন্ত বলে বুড়িটা চুপ করতেই সরমা প্রশ্ন করে, তা তোরা কিছু বলতিস না বৌকে! এসব কে দেয়। কেন দেয়?

হাঁ, বলতুম তো। তা সে কোথা শুনতো না। রাত্তিরে আমরা সব ঘুমিয়ে আছি এক একদিন দেখি, ঘরে নাই।

তারপর?

আঃ কি হচ্ছে সরো। ঘরের ভেতর থেকে তার মা চেঁচিয়ে ওঠেন। দুপুরে একটু ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। ওদের ওইসব কেচ্ছা শুনতে ভাল লাগে? দেখছিস ত এরা জংলী জাত। এদের ভেতর কি কোন ধর্ম কর্ম জাত বিচার বলতে আছে। পশুর সঙ্গে থাকতে থাকতে ওরাও সব পশু বনে গেছে। তাদের মতই ওদের আচার আচরণ!

তুমি আর বাজে বকোনা মা! এরা অসভ্য, অশিক্ষিত, জংলী যতই হোক—এরা সরল। মিথ্যাকথা কাকে বলে জানে না তোমাদের শিক্ষিত মানুষের মত। তোমাদের ওই সব সভ্য মানুষের চেয়ে এরা অনেক ভাল! তোমাদের সভ্য মানুষ দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে মা!

বলতে বলতে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালো। জানো আমাদের ক্লাশের অরুণা সেদিন কি বলছিল!

কি বলছিল?

এই যে ক'দিন আগে লোকগণনা হয়ে গেল। তাতে ওদের ওই ব্যারাক বাড়ীতে যে পঁচিশ তিরিশটা ফ্যামিলি ছেলেমেয়ে নিয়ে এত দিন বাস করছে, তাদের অধিকাংশরই অবৈধ সম্পর্ক। কেউই বিবাহিত স্বামী স্ত্রী নয়। অথচ সমাজে তারা স্বামী স্ত্রী পরিচয় দিয়ে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিব্যি বাস করছে!

ওমা বলিস কি রে?

হাঁ। তুমি ত এখনো সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাস করছো। তাছাড়া তোমার পিন্টু মামার ছেলে তপু কি? ওই সাহেবের মত চেহারা—'ব্লু' চোখ টকটকে ফর্সা রঙ্ কোথা থেকে পেলো! তোমার মামার ত ওই কেল্‌টে চেহারা। আর তোমার মামীই বা কি! আমারই মত গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ওঃ বাবা, মনে আছে যেদিন প্রথম আমাদের চাঁপাতলার বাসায় এসেছিল। গ্রীষ্মের ছুটি, দুপুরবেলা লজিক বইটা পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা। যখন হঠাৎ ঘুমটা ভাঙলো দেখি ঘরের মধ্যে একটা কোর্ট প্যান্ট পরা সাহেব দাঁড়িয়ে। প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিলুম আর কি! এমন সময় তপুদা বললে, খুব রাত জেগে পড়ছো বুঝি সামনে পরীক্ষা। তাই বইটা খুলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছো?

আঃ বাঁচলুম! ঘাম দিয়ে, যেন জ্বর ছাড়লো।

তপুদা হেসে উঠলো। কেন? ভয় পেয়ে গিয়েছিল বুঝি আমায় দেখে?

চোখের মনিটা পর্যন্ত ক'টা। ঈষৎ লালচে মাথার চুল। একেবারে রীতিমত সাহেব। বললুম, ভয় পাওয়াটা কি অপরাধ! কে বলবে যে, তুমি বাঙ্গালীর ছেলে!

হাঁ। এর আগে আরো অনেকে এই কথাই বলেছে! বলে ঈষৎ হাসলো।

সরমার মা মুখটা বেজার করে বললেন, আচ্ছা থাম দেখি, একথা শুনে শুনে কান পচে গেছে!

হাঁ, তোমার নিজের গায়ে এবার বাজছে কিনা। তাই শুনতে ভাল লাগছে না! আমি কেষ্ট মামাকে একদিন আড়ালে জিজ্ঞেস করেছিলুম। দেখলুম আমি যা সন্দেহ করেছি তাই ঠিক। হেয়ার ষ্ট্রীট থানায় যখন তোমার কেষ্ট মামা ইনস্পেক্টর, তখন ওখানের ও. সি. ছিল একজন সাহেব। একেবারে ওঁদের পাশাপাশি ছিল তাঁর কোয়ার্টার! সেই সময় সাহেবটার সঙ্গে খুব মেলামেশা করে তোমার মামিমা

আচ্ছা, চুপ কর দেখি। সবাই জানে তা। ছোটর মুখে গুরুজনদের নিন্দে ভাল লাগে না।

সবাই যদি জানে। তবে তপুকে নিয়ে তোমার মামার বাড়ীর লোকদের সব এত আদিখ্যেতা করতে লজ্জা করে না? যত দোষ বুঝি এরা অসভ্য জংলী বলে! এদের সঙ্গে আমাদের ত দেখছি এতটুকু কোথায় তফাৎ নেই। সেই একই পশু মনোভাব। আদিম প্রবৃত্তি! ওদেরও যেমন, আমাদেরও তেমনি। শুধু আমরা জামাকাপড়ের আড়ালে সেটা ঢাকতে শিখেছি। আর ওরা অশিক্ষিত সরল তাই মুখে প্রকাশ করে ফেলে এইটু যা তফাৎ। বরং মনুষ্যত্বের পাল্লায় চাপালে, দাঁড়িটা ওদের দিকেই বেশী ঝুলে পড়ে।

বাস্তবিক যত দিন যায় তত ওই অসভ্য, বর্বর, অনার্য জাতটার প্রতি আকর্ষণ যেন বাড়ে সরমার। বিশেষ করে তাদের এই নারী আর পুরুষের আদি সম্পর্কটার যতটুকু পরিচয় পেয়েছে, তাতেই সে স্তম্ভিত ও হতচকিত! হোক অসভ্য জংলী তবু ভণ্ডামী নেই ওদের মধ্যে। যে পুরুষের যাকে মনে মনে লাগে, তার ওপর দাবী জানাতে সে এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা করে না।

সেদিন বেড়াতে বেরিয়েছিল ওরা ফুলডিহীর দিকে। সাঁওতালদের ঘর বাড়ী ওদিকে বেশী। হঠাৎ এক বাড়ীতে দেখে লাঠি সোঁটা তীর ধনুক নিয়ে বহু সাঁওতাল ভীড় জমিয়েছে।

কি হলো, কোন খুন খারাপি নাকি! চলো ওদিকে আর যায় না। ফিরে যাই! এই বলে সরমার মা, ওর বাবাকে আতঙ্ক জড়ানো কণ্ঠে অনুরোধ করে।

সরমা আপত্তি জানায়। বলে, দেখি না কি ব্যাপার! আমাদের সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক! আমরা ত বেড়াতে যাচ্ছি, বিদেশী, কি করবে আমাদের! তাছাড়া সঙ্গে রয়েছে যখন বাবা তোমার এত ভয় কিসের মা?

তোর বুঝি এই ক'দিনেই সাহস বেড়ে গেল। আগে ত, ওদের ছায়া মাড়াতে চাইতিস না!

সরমা বলে, মানুষগুলোর চেহারা ওই রকম বীভৎস বটে আসলে কিন্তু ওরা খুব খারাপ লোক নয়! যত দেখছি ওদের সম্বন্ধে ধারণা বদলাচ্ছে আমায়। দেখছনা যে যা পায়, তাতেই খুশি। আত্মতুষ্ট! হেসে খেলে নেচে আমোদ করে দিনটা কাটিয়ে দেয় কোন রকমে, এত অভাব, অনাটন, দারিদ্র্য কিন্তু তার কোন চিহ্ন কারো মুখে চোখে নেই! অথচ সঞ্চয় বলতেও কিছুই নেই এদের কারো। না ঘরে, না বাইরে। পরণে যেমন নেংটি—ঘর বলতে তেমনি মাটির

কুঁড়ে। আর সম্পত্তির মধ্যে গরু' ছাগল, মুরগী, হালবলদ আর দৈহিক শক্তি। ওরা জানে এবং বিশ্বাস করে যে ওদের স্বাস্থ্য ওদের সঙ্গে বেইমানী করবে না, কোনদিন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, ওরা খেটে খাবে, যার যতটুকু সামর্থ। বার্দ্ধক্যে জীর্ণ, পরাশ্রয়ী, পরনির্ভর একটা সাঁওতালকেও আজ পর্যন্ত দেখেনি সরমা। সবাই কাজ করে কিছু না কিছু—তা সে যেমন কাজই হোক।

সেই সাঁওতাল বাড়ীটার কাছাকাছি যেতে হলো না। দেখে ভুল্হা সর্দার ওখান থেকে ফিরে আসছে। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে সরমা, কি হচ্ছে রে সর্দার ওখানে—মারামারি নাকি?

না দিদিমনি।

তবে এত লোক সব লাঠি তীরধনুক নিয়ে হাজির হয়েছে কেনবে?

উয়ার ছেলেটা, একটা মেয়ের কপালে সিন্দুঁর লেপে দিছেক তাই সেই মেয়েটার বাবা সেই ছেলেটার বাবার কাছে উযার পাড়ার সব লোকদের সঙ্গে লিয়ে এসেছেক। যদি ওর বাবা বিয়া না দেয় উয়ায় ছেলেটার সঙ্গে তবে তো মারপিট হবেক!

তা ওর বাপটা কি রাজী হয়েছে।

হাঁ, হয়েছেক। তবে মেয়ের বাপটা অনেক টাকা মাঙছে। সেটা ও দিতে পারবেক নাই! গরীব মানুষ এককুড়ি টাকা, তিনটা গরু কুথা থেকে দিবেক! উয়ার নাই যে কিছু!

তা হলে বিয়েটা হবে'না বল?

ঘাড়টা দুলিয়ে তখন সর্দার বলে, সিন্দুঁর যখন দিয়েছেক তখন উয়াকেই বিয়ে করতে হবেক। নইলে ও বেটিটাকে ত আর কেউ ছোঁবেক নাই। ইটা ত আমাদের লিয়ম হচ্ছেক।

তাই নাকি?

হাঁ, দিদিমণি। বড় কড়া লিয়ম। ও মেয়েটার যদি বিয়ে না হয় ত কেউ উয়ার জল ছোঁবেক নাই, হাতে খাবেক নাই। উয়ার বাবা মাকে সমাজে একঘরে করবেক। অনেক সময় এই নিয়ে মারপিটা খুনজখম হয়ে যায়। এত সব লোকজন নিয়ে এসেছে সেই জন্যে মেয়েটার বাপ।

তা ওই মেয়েটা কোথায় থাকেরে?

কেনে উই যে তোদের গোয়ালা পাড়া, সেখান থেকে শাল বনটার নীচের দিকে মংরু সর্দারের ঘর। উয়ার বেটিত হচ্ছেক সেই মেয়েটা।

ও-হাঁ-হাঁ দেখেছি বটে কয়েকটা সাঁওতালদের কুঁড়ে আছে ওখানে। সেই যে মা, সেদিন আমরা বেড়িয়ে ফেরবার সময়, মাঠের আল দিয়ে ঘুরে ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে এলুম? একটা মুরগীকে আমি ধরতে গেলে, একটা মেয়ে তেড়ে এলো আমায়!

এর কয়েকদিন পরেই ওইদিক থেকে মাদলের শব্দের সঙ্গে বাঁশের বাঁশির সুর ও মিলিত কণ্ঠের নাচগান কানে আসতে বুঝতে পারে সরমা যে ওটা ওদের সেই বিয়ের উৎসবের আনন্দ।

॥ ১০ ॥

রেল কলোনীটা এখান থেকে অনেকটা দূরে।

সেদিন কালীপুজো উপলক্ষ্যে সেখানে ছিল থিয়েটার। প্রায় তখন রাত্তির সাড়ে বারোটা, সরমা তার বাবা ও মার সঙ্গে ফিরছিল।

রেল লাইনটা পার হয়ে যেমন এ পারে এসেছে দেখে অন্ধকারে সেই মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। ভূত প্রেত মনে করে আঁতকে উঠতো সরমা যদি না সেই পরিচিত কণ্ঠের ডাক কানে যেতো, দিদিমণি তোরা তামাসা দেখতে গিয়াছিলি?

হাঁ। বক্ষের স্পন্দন তখনো থামেনি। সরমা তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করে, তা এই রাত দুপুরে অন্ধকারে এখানে এমনভাবে দাঁড়িয়ে কি করছিস তুই?

রাঁচী এক্সপ্রেস্‌টা আসবেক এখুনি। তাই দাঁড়িয়ে আছি!

তা স্টেশনে না গিয়ে এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছিস?

এমনি! দেখবো। বলে যেন কথাটাকে এড়িয়ে যায়।

সরমা হেসে ওঠে। আঃমরণ! গাড়ি বুঝি কখনো দেখিসনি যে এই রাতদুপুরে এসেছিস দেখতে?

সরমার মা মেয়ের কথাটাকে থামিয়ে দেবার জন্যে বলেন। ওদের কি ভয় ডর বলে কিছু আছে? ওরা জংলীমানুষ। ওদের কাছে রাতদুপুর আর দিন-দুপুরে কোন প্রভেদ নেই।

সরমার বাবা বলেন, আলো ত ওরা কখনো চোখে দেখে নি! অন্ধকারে গাড়ীর কামরায় কামরায় যখন আলো জ্বলে, তখন ওদের চোখে তা একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, সেই জন্যেই বোধহয় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই বুড়ো ওর এখনো শিশুর মত আলোজ্বলা গাড়ী দেখার সখ! অদ্ভুত

জাত বটে।

মরুকগে! ও নিয়ে তোর এত মাথাব্যথার দরকার কি!

রবিবার দিন বেডাতে বেরিয়ে একেবারে পুলটার ওপারে গিয়ে পড়েছিল সরমারা। ওদের বাড়ী থেকে অনেকটা পথ। ওপারে পাহাড় জঙ্গল খুব কিন্তু বাড়ীঘরের সংখ্যা সে অনুপাতে নেহাতি নগণ্য। সরমার বাবা ওখান থেকে আর নীচুতে নামতে রাজী হলেন না। বললেন, তোরা ওদিকটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে আয়, আমি ততক্ষণ এখানে বসে একটু বিশ্রাম নিই!

পুলটার কাছ থেকে রাস্তাটা ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠতে উঠতে হঠাৎ নীচে ঘুরে নেমে গেছে। সরমা আর তার মা কিছু দূর গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন একটা পুরনো বাংলোর ফটকের সামনে। ফটকটার ভগ্ন দশা। কিন্তু তারই মধ্যে এখনো পাথরের ফলকটা আটকানো রয়েছে। তাতে লেখা 'হিল্-ভিউ' আর তার নীচে অস্পষ্ট অক্ষরে মালিকের নাম, ডবলু, সি, জন্সন্। অক্ষরগুলো বিবর্ণ হয়ে গেলেও সরমার পড়তে দেরী হলো না! ওঃ তাহলে এই বাড়ীটার কথাই সর্দার বলেছিল। এই জনসন্ সাহেবের বাংলায় সে প্রথম যা খেয়েছিল। বাড়ীটার অবস্থা জীর্ণ হলে কি হয় এককালে যে খুব সৌখীন বাংলো ছিল এখনো তার বহু চিহ্ন বর্তমান। ফটক থেকে সোজা যে পথটা বাংলোর মধ্যে চলে গিয়েছে, তার দুপাশে এখনো মোটা মোটা কতকগুলো ইউক্যালিপটাস্ গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এককালে যে সারবন্দী সাজানো ছিল, তা বেশ অনুমান করা যায়। বনচাঁপা, বিলীতি ঝাউ, গোলগোলি, বনকরবী গাছের ঝোপ এখনো সামনের বাগানে কয়েকটা রয়েছে। এদিক-ওদিকে শ্বেতপাথরের টুকরো দিয়ে ঘেরা ফুলের কেয়ারী ও পাথরের তৈরী জলের নালি বাগানের মধ্যে এঁকে বেঁকে চলে গেছে।

সরমা একগুচ্ছ বনচাঁপা হাত বাড়িয়ে নীচু ডাল থেকে ছিঁড়ে নিজের খোঁপায় গুঁজলে, আর একগুচ্ছ এনে মাকে দিয়ে বললে রাখতো, এটা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে গেলাসের জলে রাখবো! কি সুন্দর গন্ধ দেখো মা। বলে মায়ের নাকের কাছে একবার তুলে ধরলো।

আরো কয়েকটা অজানা গাছে ফুল ফুটে ছিল। ফুলগুলোকে দেখতে যেমন সুন্দর গন্ধ কিন্তু তেমন ছিল না। তবু সরমা ছুটে ছুটে এগাছ ওগাছ থেকে নানা বেশী ফুল সংগ্রহ করে তার আঁচল ভর্তি করছিল। বাংলোর পিছন দিকটায় ছিল ফুলের গাছ। সেখান থেকে অনেক ফুল তুলে যেমন ফিরে আসতে যাবে

দেখে সেই বাগানের একটু নীচের দিকে একটা পাথরের আসনের মত পড়ে আছে, আর তার ওপর শুয়ে রয়েছে তুল্‌হা!

সর্দার? বলে ডাকতেই ধড়মড় করে সে উঠে বসলো। যেন কি চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছে, চোখে মুখে এমনি একটা ভাব।

এখানে তুই কি করছিস?

কিছু না দিদিমণি! বলতে বলতে সেখান থেকে উঠে এসে সরমার সামনে দাঁড়াল। তারপর তেমনি সরল ভঙ্গীতে বললে, আজ ত এতোয়ার্ সান্‌ডে! তাই এসেছিলুম এখানে।

ওমা, তুই আবার ইংরেজী জানিস দেখছি। বলে সরমা প্রশ্ন করলে, তা আজ সান্‌ডে, রবিবার তাতে এখানে কি?

তুল্‌হা কোন জবাব না দিয়ে সেই পাথরটার ওপর শুধু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

সরমা তার দৃষ্টি অনুসরণ করতে গিয়ে দেখে ছোট্ট একটা পাথরের 'ক্রশ' পোঁতা রয়েছে। সরমার দেহটা শিউরে উঠলো, ওমা এ যে একটা কবর। তুই এই কবরটার পাথরের ওপর শুয়েছিলি কেন?

এমনি। বলে নির্বোধের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে সর্দার।

সরমা তখন সেই পাথরটার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখে, তার অনুমানটাই ঠিক। পাথরের ওপর লেখা রয়েছে কি সব, অস্পষ্ট বিবর্ণ অক্ষর কিছুই পড়তে না পেরে সরমা ফিরে এলো।

সর্দার বললে, ওটা মেম সাহেবের। মেমটা এইখানে মরলো কিনা?

মেমটা তো এইখানে মরলো দেখছি। তা তুই মরতে এসেছিস কেন এখানে? ওটার ওপর শুয়েছিলি কেন?

কিছুক্ষণ নীরবে শুধু তাকিয়ে রইল তুল্‌হা। তারপর জবাব দিলে, কিছু না! এমনি একটু শুয়েছিলুম।

চমৎকার শোবার জায়গা তো তোর। বলে যেই বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠে সরমা অমনি সে পিছন ফিরলো। আর দাঁড়ালো না। লম্বা লম্বা ঠ্যাংগুলো চালিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল পিছনের গভীর জঙ্গলটার মধ্যে।

সরমা হতভম্বের মত সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর মায়ের কাছে এসে ভয়ার্তকণ্ঠে বললে, জান মা। তুল্‌হাটা, এখানে একটা কবরের ওপর শুয়েছিল! ওর কি ভয়ডর বলে কিছু নেই মা?

একটু হেসে মা শুধু মন্তব্য করলেন, ভয়? ওদের আবার ভয় ডর! ওরা

যে জঙ্গলের জনোয়ারের সামিল। মানুষ শুধু নামে!

সরমা চুপ করে রইল। কোন জবাব না দিয়ে যেন কি ভাবতে থাকে।

॥ ১১ ॥

পরদিন পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যাবে বলে সরমারা একটু সকাল সকাল বেরিয়েছিল। পথটা সংক্ষিপ্ত করার জন্যে রাস্তা দিয়ে ঘুরপথে না গিয়ে ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীর ঢালু পাড় বেয়ে নীচে নেমে, আরো খানিকটা এগিয়ে যেমন সামনে খাড়া উঁচু পাডটার ওপর উঠেছে দেখে পাঁচীলঘেরা এক বিরাট বাগান বাড়ী। পুরনো দেখলেই বোঝা যায়। অনেককাল রং দেওয়া হয়নি। পাঁচীলটা পাথর ও মাটি দিয়ে যখন তৈরী হয়েছিল বেশ মজবুত ছিল। এখন মাঝে মাঝে ভেঙে গেছে। সেখানে কাঁটাগাছের বেড়া দেওয়া, তার মধ্যে দিয়ে ভেতরে অনেকখানি দেখা যায়।

সরমা বলে, দেখো মা। কি সুন্দর একটা পুকুর ভেতরে! কত হাঁস চরছে। এদের বেশ মজা খুব ডিম খায়, না?

শুধু ডিম কেন? পুকুরে কি মাছ নেই ভেবেছিস্? ওই দেখ, ওপাশে আবার ধানের গোলা রয়েছে দু'টো!

আর ওটা কি মা?

ওকে বলে খড়ের গাদা। গোরুদের সারা বছরের খোরাক, এমনি করে গাদা মেরে রাখে। তাহলে নষ্ট হয় না একটিও!

ওই দেখো মা, কতগুলো গরু। এক, দুই, তিন বলে গুণতে গুণতে চোদ্দয় এসে থামলো! বাবা এত গরু নিয়ে করে কি?

সরমার বাবা এবার জবাব দিলেন। কি করবে আবার! ওর মধ্যে সবগুলো গাই নয়, বলদও আছে। দেখছিস না ধানের গোলা! চাষবাসের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে। এসব জায়গায় থাকার এই তো সুবিধে। জমিজমা, বাগান, পুকুর, গরু, ছাগল, মুরগী—সবজড়িয়ে দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে লোক বাস করে—খাওয়া পরার কষ্ট কাকে বলে কোনদিন জানতেও পারে না।

এরা খুব বড়লোক নয় মা? সরমার চোখ দুটো জলজল করে ওঠে। কত বড় বাগানবাড়ী! আর কত ফলফুলের গাছ ভেতরে রয়েছে!

পুরনো তালিমারা একটা লুঙ্গি পরে, ফটকের পাশে বাগানে একটা

কালো কুচকুচে রং, টাকমাথায় বুড়ো খুরপী নিয়ে মাটিতে কি সব গাছের চারা পুঁতছিল। ওদের কথা শুনে লোকটা উঠে দাঁড়ালো। পাঁচীলের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে কি দেখলে। তারপর বাইরে বেরিয়ে এলো। তার চোখে একটা পুরু কাঁচের চশমা। রূপোর ফ্রেম। বিবর্ণ। একটার হ্যাণ্ডেল নেই, সেখানে সুতো বাঁধা।

তাকে দেখে সরমা প্রশ্ন করলে। এটা কার বাড়ী। বাবুরা কি এখানেই থাকে?

হাঁ! কিছু দরকার আছে বাবুর সঙ্গে?

সরমা বলে, না। এমনি জিজ্ঞেস করছিলুম। আচ্ছা তোমার বাবু কি বাঙ্গালী?

হাঁ। তবে দেখলে চেনা শক্ত। এদেশের সাঁওতাল বলে ভুল হবে।

তাই নাকি?

হাঁ। এই ত তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দিদিমণি!

ছিঃ ছিঃ। বলে জিব কেটে লজ্জায় সরমা একেবারে লাল হয়ে ওঠে। ওর বাবা অনুতপ্ত কণ্ঠে বলেন, কিছু মনে করবেন না। নমস্কার! আপনি তা হলে এখানে বারোমাস থাকেন?

আজ্ঞে হাঁ! বসুন বসুন। বলে ফটকের সামনে দু'পাশে বসবার জন্যে যে বাঁধানো সাঁকোর মত ছিল তার দিকে হাত দেখালে। তারপর সরমা, তার মা ও বাবা যখন একটাতে গিয়ে বসলেন তখন লোকটি ওদের সামনে অপরটিতে বসতে গিয়ে বললেন, নিশ্চয় আপনারা এখানে হাওয়া খেতে এসেছেন কলকাতা থেকে?

কি করে বুঝলেন কলকাতা থেকে এসেছি। সরমা প্রশ্ন করে।

পুরু চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে আপাদমস্তক একবার সরমাকে দেখে নিয়ে তিনি বললেন। হাঁ, একেবারে মার্কামারা, শুকনো অম্বলে ভোগা চেহারা, একি আর বলে দিতে হবে দিদিমণি!

এবার সজোরে হেসে উঠলো সরমা। ও রোগটা বুঝি কলকাতার একচেটে, অন্য কোন শহরে হয় না!

হয়ত হয়। তবে এখানে রোগ সারাতে যারাই আসে দেখছি সব কলকাতার বাবু।

সরমার মা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে এখানকার জলহাওয়ায় ও রোগ সারে নিশ্চয়?

একশো বার। এ তোমাদের কলকাতার জল নয় যে খেলেই অম্বল হবে। এ জল একেবারে সালসা। পাহাড়ের ঝরণার জল! এক গ্লাস খেলে নাড়ী হজম হয়ে যাবে। তবে কি খাবে মা এখানে। দুধ, ঘি, মাছ মাংস কিছুই পাওয়া যায় না। তাই বাঙ্গালীবাবুরা দু' দশদিন, কি বড়জোর একটা মাস কোনরকমে কাটিয়ে পালিয়ে যায়। অথচ একদিন এ সোনার জায়গা ছিল। ষোলসের দুধ ও টাকায় দশটা মুরগী কিনেছি। এখন সে সব শুনলে, রূপকথার গল্প মনে করবে সকলে।

সরমার বাবা প্রশ্ন করেন, আপনি এখানে কতদিন বাড়ী করেছেন ?

তা, এই এক চল্লিশ বছর পূর্ণ হবে, সামনের জানুয়ারীতে।

এঁ্যা! বলেন কি!

এবার সগর্বে জবাব দেন তিনি সত্যিকথা বলতে কি, এসেছিলুম আরো সাত বছর আগে!

তার মানে প্রায় পঞ্চাশ বছর হলো ?

ফোক্‌লা দাঁতের ফাঁকে দিয়ে এক ঝলক হাসি গড়িয়ে পড়ে মল্লিক বাবুর। ইংরিজী করে তিনি আবার উচ্চারণ করেন, হাঁ, 'হাফ্ সেন্‌চুরি' বলতে পারেন।

বা-ব্বা! হঠাৎ একটা ভয়সূচকধ্বনি সরমার কণ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে আসে। সরমার বাবা বলেন চাকরী করতে এসেছিলেন এখানে ?

হাঁ।

কিন্তু এসব জায়গায় তখনকার দিনে, চাকরী মানে তো প্রাণ হাতে করে আসা!

হাঁ! রাইট্! পুরুষ বাচ্ছা হওয়া চাই, বুকের পাটা থাকা চাই।

সরমার বাবা প্রশ্ন করেন, আপনার দেশ কোথায় ছিল, তার আগে ?

ছিল কেন এখনো আছে। নদে জেলায়, দত্তপুলিয়া গ্রামে—চেনেন ? রানাঘাট থেকে যেতে হয়। তবে হাঁ, যাইনি অনেককাল। ভাইপোদের সব লিখে-পড়ে দিয়েছি। ভগবান যখন দু'টো খেতে পরতে দিচ্ছেন এখানে, তখন আর সেখানে গিয়ে কম্‌পিটিশান্ বাড়াই কেন? কিন্তু সেই সুদূর পল্লী থেকে এজায়গার সন্ধান পেলেন কি করে পঞ্চাশ বছর আগে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে!

মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে তিনি বলে উঠলেন, পুরুষের দশদশারে ভাই। জগদম্বা কার অন্ন কখন কোথা জোটায় কে তা বলতে পারে? নইলে আমিই

কি জানতুম যে একদিন দেশ-ঘাট ছেড়ে আত্মীয়স্বজনদের ভুলে এমন জায়গায় সারা জীবন কাটাতে হবে!

এখানে তবে এলেন কি করে?

ভাগ্যই বলবো! আমিও একদিন কাজ করতুম কলকাতায়। ম্যাকিন্‌টশ বার্নের লোহার কারখানায়। তিলজলার রেল লাইনের ধারে কারখানা। সকাল আটটায় হাজরে দিতে হতো বারোমাস। কারখানায় ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে ব্লু রঙের তেলকালিমাখা পাৎলুনের ওপর হাতকাটা খাকী শার্ট পরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে খাতায় সই করতে হতো। এক মিনিট লেট হবার উপায় ছিল না। তাহলেই ফাইন। বড় কড়া ছিল স্মিথ সাহেব! কিন্তু আমি বরাবরই তার নেক্‌নজরে ছিলুম! তার কারণ অবশ্য একটা ছিল। বছরে একটা দিন কামাই দূরে থাক, এক মিনিট লেট্ হইনি কখনো! শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা,—কামাই কাকে বলে জানতুম না। বণ্ডেলের ফটকের কাছে থাকতুম। একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে নিজেই দু'টো ফুটিয়ে খেতুম। স্মিথসাহেব বলতো, 'মল্লিক, তোমার মতো ওবিডিয়েণ্ট আই হ্যাভ্ নেভার সীন্ ইন্ মাই লাইফ।'

তাছাড়া একে স্বাস্থ্যটা ছিল আমার ভালই, তার ওপর লোহার কারখানায় লোহা পিটে পিটে হয়ে গেল আরো মজবুত। সাহেব বলতো বিলেত থেকে আসার আগে বইয়ে পড়েছিলুম বাঙ্গালীরা খুব লয়াল আর ফেথফুল। এখানে এসে একমাত্র তোমাকে দেখেই বুঝলুম সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, মিথ্যা কল্পনা নয়!

হঠাৎ একদিন স্মিথ সাহেব তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমাকে শিকারে যেতে হবে আমার সঙ্গে। ঈস্টারের ছুটিতে আমি 'হান্‌টিংয়ে' যাবো বিহারের এক জঙ্গলে। সেখানে ভাল্লুক, নেকড়ে, হাতী আছে নাকি খবর পেয়েছি। আমি বললুম, আমি তো সাহেব কোনদিন এসব শিকার করিনি। বলেই একটু চুপ করলেন মল্লিকবাবু। হাঁ, তবে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, সাহেবের শিকারের বাই ছিল। শনিবার কারখানায় ছুটি হলে আমায় সঙ্গে নিয়ে কখনো হালতুর বাদায়, কখনো বা গোবিন্দপুরের ভেড়ীর দিকে যেতো পাখী শিকার করতে। তাঁর দুটো বন্দুক ছিল। একটা আমি নিয়ে যেতুম তার সঙ্গে। এবং স্নাইপ, বেলেহাঁস, পানকৌটি মধ্যে মিশেতে শিকার যে করিনি তা নয়। তবু বাঘ ভালুকের নাম শুনে সাহেবকে বললুম, ওসব ভয়ানক জানোয়ার

শিকার ত কখনো করিনি। আমাকে নিয়ে গিয়ে তোমার লাভ হবে কি!

সাহেবের একটা গুণ ছিল। যেমন অসীম সাহস, তেমনি বে-পরোয়া। ভয় বিপদ-আপদ কোন কিছু গ্রাহ্য করতো না। আমায় বললে, আমি তো রয়েছি মল্লিক, তোমার ভয় কি! তাছাড়া তোমার শিকার তো আমি দেখেছি, বেশ 'এইম্' আছে তোমার। আর এসবক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন, তা হচ্ছে সাহস, তোমার মধ্যে সে জিনিস আছে পুরো দস্তুর।

সেই আসাই এখানে প্রথম আসা! বলে হঠাৎ এমনভাবে থেমে গেলেন যেন এর পর আর কিছু বলার নেই বা তিনি বলতে চান না।

ভুড়ুক্—ভুড়ুক্—ভুড়ুক্ শব্দে হুঁকোতে একসঙ্গে গোটাকতক টান দিয়ে তিনি নীরবে শুধু একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিলেন। যেন ধোঁয়ার কৃত্রিম আবরণে নিজের মুখের রেখাগুলোকে গোপন করতে চান। তবু সরমা একটু পরে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, তারপর কি হলো, শিকার করতে পেরেছিলেন?

মুখে জবাব না দিয়ে হুঁকো টানতে টানতে এবার শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দেন মল্লিকবাবু।

সরমার কৌতূহল তাতে নিবৃত্ত হয় না। আবার শুধায়, কি মেরেছিলেন, বাঘ না ভাল্লুক?

তেমনি একমনে তাঁকে হুঁকো টানতে দেখে সরমা বলে, আপনি মেরেছিলেন না সাহেব?

'আপনি মেরেছিলেন!' শুধু এই কথাটুকু তাঁর কানের পর্দায় গিয়ে আঘাত করামাত্র তার প্রতিধ্বনি যেন ছড়িয়ে পড়ে তাঁর দেহের শিরায় উপশিরায়। তাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দু যেন একসঙ্গে চীৎকার করে ওঠে, 'আপনি মেরেছিলেন?'

হাঁ। বলে ছোট্ট একটু শব্দ এবার মুখে করলেন বটে মল্লিকবাবু, কিন্তু তাঁর চোখের সামনে সহসা সেই বহুদিনের ভুলে-যাওয়া শিকারের দৃশ্যটা যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে। যে কথা কেউ জানে না। এতকাল গোপন করে রেখে-ছিলেন মনের গভীরে অতি সন্তর্পণে, আজ সরমার ওই একটি কথার ঘায়ে এতকাল পরে চোখের সামনে তা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি ফিরে যান সেই সুদূর অতীতে। নিঃশব্দে স্মৃতির পথ বেয়ে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা! তিনি এসেছিলেন, কারখানার

ছোট সাহেব মিঃ স্মিথের সঙ্গে শিকার করতে। তাঁবু পড়েছিল জঙ্গলের শেষ প্রান্তে, একেবারে নদীর কিনারায়। পাহাড়ের পায়ের তলায় যে গভীর জঙ্গল তার ভেতরে বড় একটা গাছের ওপর 'মাচান' বাঁধা হয়েছিল।

ওই পল্লীর যত জোয়ান সাঁওতাল পুরুষ রমণীকে টাকা দিয়ে জঙ্গল 'বিট্' করানোর কাজে নিযুক্ত করে তারপর সাহেবের সঙ্গে মল্লিকবাবু মাচানের ওপর উঠে বন্দুক হাতে করে সেই নরখাদক বাঘটার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

সেসব দিনের কথা এখনো মনে হলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে মল্লিকবাবুর। রাতের পর রাত জেগে বসে থাকেন পাশাপাশি মিঃ স্মিথ আর তিনি।

এক, দুই, তিন করতে করতে সাতটা রাত বৃথা কেটে যায়। তবু বাঘটার কোন সন্ধান মেলে না।

সাঁওতালদের সর্দার-শিকারী তীর-ধনুক হাতে এসে সাহেবকে বলে, ব্যাটা বোধহয় বুঝতে পেরেছে, কোন একটা পাহাড়ের গহ্বরের ভিতরে আত্মগোপন করে আছে!

সাহেব বলে, ডবল রোজ দেবো। তোমরা যদি ওই গহ্বরগুলোর মধ্যে ঢুকে তাড়া লাগাতে পারো।

কেবল অর্থের লোভ নয়, শিকারের লোভেও বটে, যেন রক্ত ক্ষেপে ওঠে সাঁওতালদের। চার-পাঁচটা মানুষকে খেয়েছে নাকি সেই আদমখোরটা। অদূরবর্তী কোন গ্রাম থেকে তাড়া খেয়ে এসে ওই পাহাড়ে লুকিয়েছে।

এখানেও প্রথমদিন একটা লোককে মেরেছিল। সাহেব অভিজ্ঞ শিকারী, মল্লিকবাবু তার সঙ্গে এর আগেও অনেকবার শিকারের সাথী হয়েছেন বটে তবে বাঘ শিকার করতে কখনো দেখেননি তাকে। তাই মনের মধ্যে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল তাঁর! কিন্তু সাহেব বেপরোয়া।

বাঘ শিকার করে শিকারী নামটা পুরোপুরি অর্জন করার নেশা যেন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। ঠিক হলো দশমী দিন রাত্রে সাঁওতালরা ওই ভাবে গহ্বরগুলোতে ঢুকে তাড়া দিয়ে শেষ চেষ্টা করবে।

এদিকে ঘাঁটি ঘাঁটি কড়া পাহারাও তারা বসিয়ে দিলে। বিষাক্ত তীর ধনুক ও বল্লম নিয়ে সবাই প্রস্তুত। কোন সুড়ঙ্গপথে না ভেগে যায় জানোয়ারটা!

প্রতিদিনই মদ ও মুরগীর হুল্লোড় চলে। মিঃ স্মিথ সর্দারদের নিয়ে একসঙ্গে বসে বোতলের পর বোতল শূন্য করেন। তাদের কাজে উৎসাহ দেন।

সারাদিন এমনি করে কেটে যায়। কিন্তু রাত্রে মদ ছোঁয় না মিঃ স্মিথ আর মল্লিকবাবু। পাছে নেশা বেশী হলে শিকার নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায়।

তিন-চারটি সাঁওতাল মেয়েকে রান্না, জলতোলা ও কাঠ কাটার কাজের জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন মল্লিকবাবু। সাঁওতাল পল্লী থেকে বাছাই করে নিয়েছিলেন তাদের। কেবল অল্পবয়সী তরুণী দেখে নেননি, সব ক'টি যেন কষ্টিপাথরের খোদাই করা মূর্তি। মাইকেল এঞ্জেলোর আঁকা এক একটি 'মডেল' এর মত। তাদের দেহের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তাদের চোখে মুখে যেমন বন্য হরিণীর চঞ্চলতা, তেমনি সারা দেহে উন্মত্ত যৌবন। মনে হয় পাহাড়ী ঝর্ণাকে জোর করে যেন কে বেঁধে রেখেছে। শিকারে সত্যিকারের প্রেরণা দিত তারা মিঃ স্মিথকে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা মেয়েটির নাম ফুল্‌কী। যৌবনের বন্যা যেন তার দেহের বাঁধ ভেঙে উপ্‌চে পড়ছে।

বলাবাহুল্য সাহেবের যেমন কড়া নজর ছিল তার ওপর, মল্লিকবাবুরও তেমনি। অথচ সেই সরলা সাঁওতালনীর প্রকৃতিকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারেন না যেন সাহেব। মদ খাইয়ে, টাকার গোছা তার পায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়েও কোন ফল হয় না। বনের অন্ধকারে হঠাৎ কোথায় সরে পড়ে সাহেব তার নাগাল পায় না।

বোতলের পর বোতল শূন্য হয়ে যায়, তবু তার নেশা ধরাতে পারে না সাহেব। এমনি সে দুর্দান্ত মেয়ে।

মল্লিকবাবু সবই লক্ষ্য করেন গোপনে।

সেদিন ভরা অমাবস্যা।

সন্ধ্যার অনেক আগে থেকেই গাছপালার মাথায়, জঙ্গলের এখানে ওখানে আশেপাশে, ঝোপেঝাড়ে, কখন যে টুকরো টুকরো কালো অন্ধকার এসে লুকিয়েছিল চুপিসাড়ে, কেউ তা টের পায়নি। না সাহেব। না ফুল্‌কী।

এক সময় ফুল্‌কীর মুখের ওপর থেকে চোখটা সরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই চমকে ওঠে সাহেব। এরই মধ্যে এত গাঢ়, এত ঘন অন্ধকার চারিদিকে ঘনিয়ে এলো কোথা থেকে। বুঝতে না পেরে আড়ে একবার হাতের ঘড়িটার দিকে নজর করতেই খেয়াল হয়। সন্ধ্যা আসন্ন। তাহলে মদের বোতল ত এবার বন্ধ করতে হয়।

কিন্তু শেষ বারের মত গ্লাসটা মুখের কাছে তুলতে গিয়েই হঠাৎ তাঁর চোখ

দুটো থমকে দাঁড়িয়ে যায় ফুল্‌কীর মুখের ওপর। বর্ষণের পূর্বে ধীরে ধীরে কালো-মেঘে জমাট বাঁধা আকাশের বুকটায় যেমন সহসা বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে ওঠে, তেমনি একটা কিসের শিহরণ যেন তিনি লক্ষ্য করেন ফুল্‌কীর চোখের তারায়। ক্ষণিক, স্বল্পস্থায়ী! তবু তা তড়িৎশিখার মত ভেতরে ভেতরে ওঁর রক্তের প্রতিটি কণায় আগুন যেন ধরিয়ে দেয়। কুচকুচে কালো কষ্টিপাথরের চোখ দুটো ভেদ করে তার উত্তাপ অশরীরী অগ্নিশিখার মত লকলক করে ওঠে। সাহেবের সামনে বসেই মদ খাচ্ছিল ফুল্‌কী। তার হাতে সুরার পাত্র তখনো ভরা। তেমনি টল টল করছিল! বিলিতী মদের নেশা বুঝি এতদিনে তাকে পেয়ে বসেছে। ভূমিকম্পের আঘাতে যেমন ধরিত্রীর মর্মমূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দেয়, তেমনি সেই অটুট যৌবনার কঠোর সংযমের প্রাচীর বুঝি নিমেষে ভেঙ্গে পড়ে।

সহসা ফুল্‌কী তার হাতের পেয়ালাটা সাহেবের গায়ে ছুঁড়ে মেরে খিলখিল করে হেসে ওঠে, অদ্ভুত এক ধরনের হাসি। বন্য, উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল সে হাসি শিকারী সাহেবের রক্তে এক তীব্র উন্মাদনার সঞ্চার করে।

সব ভুলে সাহেব তাকে গভীর আবেগে যেমন বুকে জড়িয়ে ধরতে যায়, তার হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ছুটে পালায় তাঁবু থেকে। তার পিছনে পিছনে সাহেবও বেরিয়ে আসে। সে যত ছোটে, সাহেবও তার পিছনে তত ছোটে। নিকটে একটা বন্যগাছের ঝোপে আত্মগোপন করে ফুল্‌কী। সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরতেই, আবার সেই হাসি! হাসির তরঙ্গে এবার যেন লুটোপুটি খায় ফুল্‌কী। মদের নেশায় ভরপুর ফুল্‌কীর দেহটা শুকনো পাতার ওপর গড়াগড়ি দেয়। হাসির দমক যেন থামতে চায় না, বেড়েই চলে। তরুণী, যুবতী সেই সাঁওতাল মেয়ের হাসিতে সাহেবের বুকের সব রক্ত যেন একসঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে! নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না সাহেব। শিকারী ব্যাঘ্রের মত যেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুল্‌কীর দেহটার ওপরে, অমনি পিছন থেকে চীৎকার করে ওঠেন মল্লিকবাবু—টাইগার! টাইগার!

নিঃশব্দে গোয়েন্দার মত সেই অন্ধকারে তার চোখ দুটো যে অনুসরণ করছিল, এতক্ষণ তা জানতে পারেনি সাহেব! তাই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালে।

মাই গড্। টাইগার! মুহূর্তে সাহেবের সব নেশা কোথায় যেন ছুটে যায়। ফুল্‌কীর দেহটাকে ছেড়ে ছুটে তাঁবুতে ঢুকে বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সাহেব।

তারপর চুপি চুপি সাহেব প্রশ্ন করে মল্লিকবাবুকে, কোন্ দিকে?

যে দিকটায় গভীর খাদ, অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই বিপদসঙ্কুল পথটার দিকে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করেন মল্লিকবাবু।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা মুখের কাছে লাগিয়ে ধরে, ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে এগুতে থাকে সাহেব। যেন এখুনি বাঘের সম্মুখীন হতে হবে! ঠিক তার পিছনে সাহেবের মতই বন্দুকটা প্রস্তুত করে নিয়ে, সতর্কে পা ফেলে ফেলে চলেন মল্লিকবাবু!

খাদের সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল স্থানটা সাহেব যেমন অতিক্রম করতে যাবে, পিছন থেকে মল্লিকসাহেব তাঁর 'ট্রিগার'টা টিপে দিলেন।

উঃ! বলে শুধু একটা অস্ফুট আর্তস্বর বেরিয়ে এলো সাহেবের মুখ থেকে। তারপর ঝপ্ করে হলো শুধু একটা পতনের শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে খাদের কোন্ অতল গহ্বরে সবকিছু নীরব হয়ে গেল।

নেশার ঘোরে কাণ্ডজ্ঞানহীন ফুল্‌কী তখনো সেখানে তেমনি ভাবেই শুয়েছিল। বুঝি মনে মনে সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করছিল।

তাই সাহেবের পরিবর্তে মল্লিকবাবু যখন অন্ধকারে চুপি চুপি এসে ফুল্‌কীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সে তখন দুহাত দিয়ে মল্লিকবাবুকে সজোরে জড়িয়ে ধরলে বুকের ওপর।

পরের দিন শুধু জংলীদের মধ্যে সেই কথাটা রটে গেল যে সাহেব বাঘের ভয়ে পালাতে গিয়ে গভীর খাদের মধ্যে যখন পড়ে যান, তখন তাঁর হাতের গুলি ছুটে গিয়ে নিজের বুকে বিঁধেছে।

এরপর এই ফুল্‌কীর মোহেই কারখানার চাকরী ছেড়ে দিয়ে, মল্লিকবাবু কলকাতা থেকে চলে আসেন এখানে। প্রথমে শালপাতার চালানী ব্যবসায় হাত দেন। তারপর বিড়ি-পাতার। এবং সবশেষ চালানী কাঠের। কিন্তু কোনটাতেই সুবিধা করতে পারেন নি। এই ফুল্‌কীকে করেছিলেন নামে সর্দারণী বটে, কিন্তু আসলে তাকে করেছিলেন তাঁর হৃদয়ের রাণী! ফলে এসব ক্ষেত্রে, সাধারণত যা হয়, তাই হলো। পাখী একদিন শেকল কেটে উড়ে গেল! বেশী দিন তাকে ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। আর এক ধনী মাড়োয়ারী মহাজনের নজরে পড়লো ফুলকী। বিরাট বড়লোক। দু'তিনটে কয়লার খনির মালিক। ফুল্‌কীকে অনেক বেশী টাকা দিয়ে তাঁর কয়লার খনিতে চাকরী করার জন্যে, একেবারে ধানবাদের ওদিকে কোন এক কলিয়ারীতে নিয়ে চলে গেলেন।

ফুলকীর এই বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি মনে এমন আঘাত পান যে তাঁর দেহমন একসঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। ফলে ব্যবসায়ও ভাঙন ধরে। অনেক টাকা লোকসান খেয়ে, তারপর একদিন আবার দেশে ফিরে যান মল্লিকবাবু।

এই পাঁচ বছরের ইতিহাস, কেউ জানে না। দেশের লোক ত নয়ই, এমন কি নিজের স্ত্রী, ছেলে মেয়ে কারুর কাছে কোনদিন তিনি ঘুণাক্ষরেও কিছু ব্যক্ত করেন নি! এরপর বছর দেড়েক বোধহয় তিনি ছিলেন দেশে। চাকরীর চেষ্টাও যে করেননি কলকাতায়, তা নয়। শেষে কি জানি কেন আবার কি মনে করে, এখানেই এসে হাজির হন।

কিন্তু এবার আর ব্যবসায়ের চেষ্টা করলেন না। পি. ডবলু, ডি'র একটা ঠিকাদারীর সামান্য চাকরী, খুব কম মাইনে—তাতেই ঢুকে পড়লেন। এখান থেকে অনেক দূরে পাহাড় জঙ্গলের দিকে যেসব নতুন পথ ঘাট তৈরী হচ্ছিল তার খবরদারী করতে হতো। এবং এই চাকরী থেকেই একদিন তিনি 'ওভার-সিয়ারের' পদ লাভ করেন।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে, একমনে হুঁকোয় টানের পর টান দিয়ে তারপর হঠাৎ শেষ ধোঁয়াটা ছেড়ে কতটা যেন নিজের মনেই বলে ওঠেন মল্লিকবাবু, অনেক কাল হয়ে গেল এখানে, অথচ মনে হচ্ছে যেন এই সেদিনের কথা।

সরমা প্রশ্ন করে, কি চাকরী করতে এসেছিলেন এখানে?

সে অনেক কিছু! বলেই হঠাৎ থেমে মুখের রেখাগুলো যেন একেবারে গোপন করে ফেলেন। তারপর বলেন, প্রধানত ওভারসিয়ারী। ওই যে রাস্তাঘাট এদিক ওদিকে যা একটু কিছু দেখছো, ওই দূরের রেল কলোনীর দিকটা, সবই আমার হাতের তৈরী! এসব জায়গায় তখন কোন বাড়ীঘর ছিল না। শুধু অজগর অরণ্য। দিনের বেলায় হাতী, বাঘ, ঘুরে বেড়াতো! আর হায়না, ভাল্লুক, সাপের ত কথাই নেই।

এঁ্যা, বলেন কি! সরমার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

বাড়ীর ভেতরে চলো দিদিমণি। তার সাক্ষী রেখেছি দেওয়ালে টাঙিয়ে।

তার মানে?

মানে আর কিছুই নয়। যে বাঘ, ভাল্লুক, হাতী শিকার করেছিলুম, তাদের কারো ছাল, কারো মাথা, কারো শিং—এখনো রয়েছে।

আপনি বুঝি খুব ভাল শিকারী ছিলেন?

না, শিকারী ছিলুম না। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমায় শিকারী করে তুলেছিল। এমন একদিন ছিল, যখন ঘরের ভেতর থেকে বাঘে এসে আমার গরু ছাগল খেয়ে চলে যেতো। আর ওই যে সামনে ধানক্ষেত, ওখানে হাতীর উৎপাতে ধান রক্ষা করা দায় হতো। কাজেই আত্মরক্ষার জন্যে বন্দুক কিনতে বাধ্য হয়েছিলুম।

বাবা, আপনার সাহস আছে। নইলে এত জায়গা থাকতে এখানে এসে কেউ বাড়ী করে থাকতে পারে? আমাদের ত এখনো এদিকটায় একলা আসতে গেলে ভয় করে।

তোমরা যে শহরের মানুষ দিদিমণি। আমরা এখানে থেকে থেকে বুনো জংলী সাঁওতাল বনে গেছি। ভয় ডর তাই কাকে বলে জানি না। তাছাড়া তোমাদের দেহে ত রক্তের তেজ নেই। আর থাকবেই বা কি খেয়ে। শহরের দূষিত হাওয়া বাতাস, আর কলের জল সব শেষ করে দিয়েছে। এই বলে একটু থেমে আবার তিনি প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, আমার কত বয়েস, অনুমান করো ত দেখি।

কত হবে? আমার বাবার চেয়ে পাঁচ সাত বছরের বড়।

তোমার বাবার এখন কত?

সরমার বাবা বললেন, এই সাতচল্লিশ।

হো-হো-হো হো করে বিকট ভঙ্গীতে তিনি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, আমার সবচেয়ে ছোট মেয়েটার বয়েস পঁয়তিরিশ। আমার এই পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হয়েছে।

বলেন কি! শুধু সরমা নয়। ওর বাবার কণ্ঠ দিয়েও বিস্ময় ফেটে পড়ে। ভদ্রলোক বলেন, হাঁ, 'তাগত্' কি এমনি হয়? শরীর কি এমনি টেঁকে? ধারণা করতে পারবেন না, কত হাজার মুরগী খেয়েছি এই বয়েসে? এখনো একটা গোটা মুরগী খেয়ে হজম করতে পারি। কথাটা বললে হয়ত বিশ্বাস করবেন না।

সরমার বাবার, বিস্মিত চোখের ওপর পুরু চশমার কাঁচদুটো স্থাপন করে তিনি এবার বললেন, আপনার মত অনেকেই ভুল করে, বিশ্বাস করতে চায় না, যে আমার এত বয়েস। আমি সাত সমুদ্র পেরিয়েছি সে কি আজ? বলে তিনি একটা হাঁক পাড়লেন, ওরে গুইরাম আর একটু তামাক দিয়ে যা, গলাটা শুকিয়ে গেল রে বাবা।

একটা সাঁওতাল ছেলে ভেতর থেকে ছুটে এসে তাঁর হুঁকোয় নতুন কলকে পালটে দিয়ে গেল।

নলটা মুখে টেনে নিয়ে, ভুড়ুক্-ভুড়ুক্ শব্দে তিনি ধূমপান করতে শুরু করলেন।

সাত সমুদ্র পেরিয়েছেন! মানে আপনি বিলেত আমেরিকাতেও গিয়েছিলেন নাকি? প্রশ্ন করে সরমা।

আবার তেমনি হো-হো-হো করে বিকট হাসিতে যেন কাঁপিয়ে তোলেন সেখানকায় গাছপালা বন জঙ্গল সব কিছু। তারপর বলেন, আরে না-না। তার মানে সাতটি কন্যাকে পার করেছি—বিয়ে দিয়েছি তাদের।

আপনার সাতটি মেয়ে!

হাঁ। তার সঙ্গে যোগ করো আর পাঁচটি ছেলে, তাদেরও সব পার করেছি। বলে সগৌরবে ভুড়ুক্-ভুড়ুক শব্দে একসঙ্গে গোটা কতক টান দিয়ে, নলের মুখটা মুছতে মুছতে সরমার বাবার দিকে এগিয়ে দিলেন, চলবে নাকি?

না।

সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় নলটা নিজের মুখে গুঁজে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, অথচ রিটায়ার' করেছি তাও পঁচিশ বছর হয়ে গেল। কিন্তু বসে খাই না, একটা দিনও। এই দেখছেন গাছপালা ক্ষেতখামার, সবই আমি নিজে তদ্বির করি। লোকজন আছে ঠিকই—তবে তাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোই না। তাতে দু'কাজ হয়। নিজের শরীরটাও ভাল থাকে, আবার লোকজনগুলোও ফাঁকী দিতে পারে না! আগে যেমন ছিল ভাল সাঁওতালগুলো, এখন তেমনি হয়েছে 'পাজির পাঝাড়া'!

এই পর্যন্ত নিজের কথা বলে, একটু থেমে তখন সরমার বাবার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন, কোন্ বাংলায় উঠেছেন, কতদিন থাকবেন, আদি নিবাস কোন্ জেলায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরমার বাবা যখন বললেন যে ওঁরা খাঁটি কলকাতার লোক তখন তিনি মুখ থেকে নলটা টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কণ্ঠে হতাশার সুর এনে বললেন, তাহলে ত এখানে আপনারা থাকতে পারবেন না।

কি করে জানলেন! ফিক করে হেসে ওঠে সরমা।

কলকাতার লোক দেখে দেখে হাড় হদ্দ হয়ে গেল দিদিমণি। এই পাহাড়

জঙ্গলে জায়গা তারা কিছুতেই বেশীদিন সহ্য করতে পারে না। তার ওপর ত এখন খাবার জিনিস পাওয়া যায় না। যখন অজচ্ছল পাওয়া যেতো, তখনো তারা নাক তুলে থাকতেন, এসব জিনিস কি ভদ্দরলোকে খায়।

কলকাতার লোকদের ওপর দাদুর দেখছি রাগ খুব! বলে সরমা একটু খোঁচা দেয় তাঁকে।

খপ্ করে দুটো হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে দাদু জবাব দিলেন, দোহাই বলছি, রাগ নয়। তবে ওই শহরটাকে আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। কেন, তা বলতে পারবো না। একটা মুহূর্ত থাকলে যেন পাগল করে তোলে! চারিদিক থেকে গাড়ীঘোড়াগুলো যেন সব সময় চাপা দিতে ছুটে আসছে মনে হয়। তার ওপর লোকজনের ভীড়ের অন্ত নেই, যেন মেলা বসেছে। আর তেমনি কি ঘরবাড়ীগুলো। কোথা দিয়ে এতটুকু রোদ কি হাওয়া বাতাস ঢোকে না। মানুষ কি করে বাস করে ওইসব গলির ভেতর বছরের পর বছর সত্যি কথা বলতে কি, আমার কাছে আজো তা বিস্ময়!

এবার রীতিমত জোর হেসে ফেলে সরমা। বলে, আচ্ছা দাদু, আপনি শেষ কবে কলকাতায় গিয়েছিলেন?

হিসেব করে তিনি বললেন, এগারো বছর আগে।

এ্যাঁ! চমকে উঠলো সরমারা সবাই একসঙ্গে!

হাঁ। তাও দায়ে পড়ে। নইলে কোন্ ব্যাটা এখান থেকে এক পা নড়তো! নেহাত মেয়ে শুনলে না। বললে, আমার ছেলের বিয়েতে তুমি যদি আশীর্বাদ করতে না আসো, তাহলে আমি খুব দুঃখ পাবো। তাই গিয়েছিলুম নাতবৌকে পাকা দেখতে চাঁপাতলার কি একটা লেনের মধ্যে, নামটাও ছাই মনে নেই!

সরমার বাবা বলেন, সত্যি, কলকাতার শহর বর্তমানে যা হয়েছে, মানুষের বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। নেহাত পেটের দায়ে পড়ে থাকা। নইলে শখ করে বোধহয় কেউ থাকতে চাইতো না।

দাদু বলেন, মাপ করবেন। পেটের দায় যেখানে যাবেন সেখানেই। তাই যদি, তাহলে কলকাতায় কেন মরতে ছুটি। আমাকেও গোড়ায় সবাই ভয় দেখিয়েছিল। ওই জঙ্গলে না খেয়ে মরতে হবে! ভাগ্যিস সেদিন কারো কথা শুনিনি, তাই আজো টিঁকে আছি। মা লক্ষ্মীর কৃপা থেকে কোনদিন বঞ্চিত হইনি! রোগে ভুগে ভুগে স্বাস্থ্যটাই যদি নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে কি সুখে সেখানে বাস করে মানুষ! বললে বিশ্বাস করবে না, এই পঁচিশ বছর

রিটায়ার করেছি কিন্তু একটা দিনের জন্যে জ্বর, পেটের অসুখ, কি সর্দিকাশি কাকে বলে জানি না।

বলেন কি! সরমার বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন তাঁর মুখের দিকে।

চোখটায় একটু ছানির ভাব এসেছে। তাও এই দু'বছর হলো। এখনো সাইকেল চালিয়ে আমি হাটে যাই। মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরতে বেরোই।

ওঃ হাঁ হাঁ। একদিন আপনাকেই তা হলে দেখেছিলুম। খাকী রংয়ের প্যাণ্ট ও কোট গায়ে দিয়ে পুরনো সাইকেল চেপে স্টেশনের ওদিকে যাচ্ছিলেন।

হাঁ, ঠিকই দেখেছিলে দিদিমণি।

আপনি ত রিটায়ার করেছেন, তবে আবার ওইসব পোশাক পরে কোথায় গিয়েছিলেন?

এবার দাদু হেসে ফেললেন, ওই আমার একটা 'ব্যামো' আছে দিদিভাই, বেশীদিন চুপচাপ ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে পারি না। ওই পাহাড় জঙ্গল পথঘাট-গুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাই যে বেশে একদিন ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতুম, সেই পুরানো পোশাক পরে সেই পুরনো সাইকেলে চেপে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে আবার মোলাকাত করতে যাই। এই নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বৌমাদের সঙ্গে কত মনোমালিন্য হয়েছে, তারা বলে, বাবা এই বয়েসে সাইকেল চেপে দূর পথে গিয়ে শেষে যদি কোন বিপদ ঘটে! বলি, ঘটেনি ত কিছু এতকাল! আর যদি-ই বা কোন দৈবদুর্বিপাক ঘটে ত ঘটুক। যে গাছপালা, বনজঙ্গল, পাহাড়, পথঘাট আমার কেবল পরিচিত নয়, হাতের তৈরী,—তাদের বুকে মাথা রেখে যদি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করি ত তার চেয়ে সুখের কি আছে! কি ভাই বলো ত?

সরমা বলে, সত্যি, আপনি যে কত ভালবাসেন এই জায়গাকে, এবার ত বুঝলুম!

ভালবাসবো না কেন দিদিমণি? মানুষ মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু এই গাছপালা, পাহাড় নদী, এদের মত মানুষের অকৃত্রিম সুহৃদ আর নেই। কোন দিন এরা অনিষ্ট করতে জানে না! তুমি যদি ওদের ভালবাসো, ওরা তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দেবেই দেবে!

আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা উঠি। আপনার সঙ্গে আলাপ করে সময়টা বেশ আনন্দে কাটলো! বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে সরমার বাবা দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন।

এদিকে এলে আবার আসবেন কিন্তু, গল্পগুজব করা যাবে! কতদিন পরে আপনাদের মত শহরের মানুষের দেখা পেলুম!

হেসে ফেলে সরমা, শহরকে যখন ত্নচোখে দেখতে পারেন না, তখন তার মানুষকে কি ভাল লাগবে দাদু?

আচ্ছা, আর শহরের নিন্দে করবো না তোমাদের কাছে।

বলে বিকট ভঙ্গী করে হেসে উঠলেন তিনি।

॥ ১২ ॥

একদিন জ্যোৎস্না রাতে হঠাৎ ডুগ্‌ডুগ্ করে মাদলের আওয়াজের সঙ্গে বাঁশের বাঁশি আর মিহিগলার কান্নার সুর ভেসে এলো সরমার কানে।

ছুটে গিয়ে সরমা জানলার ধারে দাঁড়ায়। ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে পারে না। এমন করে নাকি সুরে কাঁদছে কারা?

ওর মা বলেন, দূর, কান্না হবে কোন্ তুঃখে। শুনছিস না মাদল বাজছে, বাঁশী বাজছে, নিশ্চয় উৎসব জাতীয় একটা কিছু হচ্ছে!

যেমন গানের ছিরি, তেমনি তার উৎসব! আপন মনেই হেসে ওঠে সরমা। তবু কৌতূহল সংবরণ করতে পারে না সরমা। বলে, মা চলো না, একটু দেখে আসি। দিব্যি চাঁদের আলো। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে চারিদিক। একটু বেড়ানো হবে, তাছাড়া সত্যিকারের রাত বলতে যা বোঝায়, তার এখনো অনেক দেরী। বলতে বলতে বাবার ঘরে গিয়ে ঘড়িতে দেখে আসে সরমা, তখনো আটটা বাজেনি! তবু ওর মার বুঝি সাহসে কুলোয় না, এই সোমত্ত মেয়েকে নিয়ে একা বেরুতে। তাই সরমার বাবাকেও তিনি সঙ্গে নিলেন।

ওরা সেই সাঁওতালদের ঘরের কাছ পর্যন্ত গেল না। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রইলো। সেখান থেকে সব কিছু দেখা যাচ্ছিল। আর গানের ভাষা বুঝতে না পারলেও কথাগুলো স্পষ্টই পাচ্ছিল শুনতে। অদ্ভুত গানের ভাষা :—

শিল্‌ধা ইন্‌ধা পরব
তুরপর লোক যাচ্ছে।
সরু চাল ভাত
জের ঝটু সিজে।

আমি যে বড় গরীবের বেটি—
বড় নাচারের বেটি—
জন রা লে—টো—
জেরে ঝট্ নাই সিজে।

অর্থাৎ শিল্‌ধা ইন্‌ধ পরবে বহুদূর থেকে লোক যাচ্ছে। তুমি ত ধনীর ছেলে, সরু চালের ভাত খাও তা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় (কাজেই তাড়াতাড়ি যেতে পারো)। আমি বড় গরীবের মেয়ে, আমি খুব দুঃখীর মেয়ে। জনারের মোটা দানা খাই, তা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয় না (কাজেই আমার যেতে দেরী হয়)।

দশ বারোটা যুবতী মেয়ে কোমর ধরাধরি করে একসঙ্গে নাচছে। একবার করে পা ফেলে তারা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে—আবার এক পা করে পিছিয়ে আসছে। ওদের সামনে একটা পুরুষের দলও ঠিক তেমই ভাবেই নাচছে ওদের অনুকরণ করে। ওদের কণ্ঠে সেই কান্নার সুর—একটানা, অব্যাহত।

পরদিন দুধ আনতে গিয়ে বৃদ্ধ অনিরুদ্ধ গোয়ালাকে জিজ্ঞেস করে সরমা, হাঁগো গোয়ালা, তুমি ত এখানে অনেকদিন আছো?

হাঁ মা, তা অনেকদিন হলো বৈকি! বলে গরুটা তেমনি দুইতে থাকে। ফেনা ভর্তি দুধে বালতিতে গাবুর-গোবুর শব্দ ওঠে! মেদিনীপুরের লোক অনিরুদ্ধ। ওখানে প্রথম আসে কাঠের ব্যবসা করতে। কিন্তু কিছুদিন বেশ ভালই উপার্জন করেছিল। পরে প্রতিযোগিতায় বিহারী, মাড়োয়ারী ও পাঞ্জাবী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ব্যবসা তুলে দেয়। এবং বেশ কিছু দিন বেকার থাকার পর হাট থেকে গরু কিনে এই দুধের ব্যবসা শুরু করে। প্রতিদিন দু'ক্রোশ পথ হেঁটে রেলকলোনীর বাবুদের বাড়ী বাড়ী দুধ যোগান দিয়ে আসে। ছেলে বৌ নাতি নাতনী নিয়ে তার বেশ বড় সংসার, ওই দুধের আয় থেকেই কোন রকমে চলে যায়।

হাঁগো অনিরুদ্ধ, এখন এখানে সাঁওতালদের কিসের পরব রোজ এত নাচ-গান হয় যে!

গয়লা বলে, এদেশের লোকেরা বলে ইন্‌ধ ও বিন্‌ধ। আসলে একই পরবের আরম্ভ হলো ইন্‌ধ, শেষটুকু বিন্‌ধ। ওরাই দুটি নাম দিয়ে দুটো ভাগ করেছে। কেউ কেউ আবার ইন্‌ধকে শিল্‌ধাও বলে। এ পরবে খুব ধুমধাম হয়। হাটের ওদিকে রঙ্কিণী মার যে মন্দির আছে সেখানে গেলে অনেক কিছু

দেখতে পাবেন।

দেখবার মত কি আছে সেখানে?

হাঁ, আছে বৈকি। আসলে রঙ্কিণী মার ওখানেই পূজা-অর্চনা হয়। তার-পর দু'হপ্তা ধরে মেলা বসে। গরু বাছুর, ছাগল ভেড়া, মোষ যেমন আমদানী হয়, তেমনি রূপোর গয়না, পেতল-কাঁসার বাসন, সাবান, এসেন্স, পাউডার প্রভৃতি কত রকমের প্রসাধনের জিনিস যে আসে, দেখলে চোখ ফেরানো যায় না মা। এছাড়া শাড়ী, গামছা, সাঁওতালী চাদর হরেকরকমের আসে নানা জায়গা থেকে।

তাহলে ত যেতে হচ্ছে! আমাদের কেনার মত কিছু আছে, না সব কিছুই ওই সাঁওতালদের জিনিস!

সব রকমই আছে মা। কেননা অনেক দূর দূরান্ত থেকে আপনাদের মত ভদ্দরলোকেরাও সব আসে কিনা এই মেলা দেখতে!

সেই দিনই বিকেলে সরমারা মন্দিরের দিকে বেড়াতে গেল। সেখানে গিয়ে সত্যি অবাক লাগে! দেখে খুব হৈ হল্লা। এত লোকজন যে ওই বুনো জায়গায় আছে, তা আগে জানতো না।

মেলার মধ্যে প্রধান জিনিস দেখলে—পেতল কাঁসার হরেক রকমের বাসন চক্‌চক্ করছে। সব চেয়ে বেশী, বড় বড় কাঁসার ঘড়া, অসংখ্য! প্রত্যেক দোকানে ঠাসা! এছাড়া রূপোর সাঁওতালী ডিজাইনের গয়নার দোকান। নানা রকম মনিহারী, হাঁড়ি-কলসী, নাগরদোলা, তাঁবুতে ম্যাজিক খেলা, ফোটোতোলার দোকান, তেলেভাজা জিলিপী, মুড়ি চিঁড়ে, গরু ছাগল ভেড়া মহিষ সব মিলিয়ে থৈ থৈ করছে হাটতলা। কেনা বেচা চলেছে সর্বত্র। সাঁওতাল, আদিবাসীর মুখ বেশী দেখা গেলেও, হিন্দুস্থানী, বিহারী, পাঞ্জাবী, বাঙালী নরনারীর সংখ্যাও কম ছিল না। কেউ রেলে, কেউ গোযানে, কেউ বা পদব্রজে এসেছে ভিন্‌গাঁ থেকে।

সরমার মা একটা কাঁসার সাঁওতালী ডিজাইনের জামবাটি আর সরমা রূপোর তারের কাজকরা দুটো কানের দুল কিনে নিয়ে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালো। মন্দিরের ভেতরটা খুব অন্ধকার। জুতো খুলে ভেতরে গিয়ে কোন মূর্তি দেখতে না পেয়ে একটু হতাশ হয় তারা। শুধু সামনে একটা পাথরের এবড়ো খেবড়ো টুকরো, তার সর্বাঙ্গে সিঁদুর মাখানো ও একগাদা ফুল ভরা। ওটাই নিশ্চয়

হবে দেবীর মূর্তি, অনুমান করে তারা গড় হয়ে প্রণাম করলে। এ কি বিগ্রহ! কোথায় তাঁর নাক, মুখ, চোখ, কিছুই বুঝতে পারলে না। শুধু অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মনে হলো যেন এককালে, মানে বহুকাল আগে হয়ত ওখানে পাথরের কোন মূর্তি ছিল। এখন একটা জীর্ণ ক্ষয়াঘষা পাথরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই তার অবশিষ্ট নেই।

পুরুত মশাইকে দেখতে পেয়ে সরমা প্রশ্ন করে, এ কিসের মূর্তি এবং কি তার ইতিহাস।

পুরুতমশাই তখন এক নিঃশ্বাসে মুখস্থ গড় গড় করে সব বলে গেলেন। এ অঞ্চলে এমন ভারী জাগ্রতা দেবী আর নেই। যে যা মানত করে, তার তা সফল হয়। তারপর মন্দিরের সামনের জমিতে এসে একটা পুরনো হাড়িকাঠ দেখিয়ে বললেন, এককালে এখানে নরবলি হতো। তখন এর সেবাইত ছিল আদিবাসীরাই। এখন ইনি আর্য্যা হয়ে গেছেন। এখানকার রাজা এঁর সেবাইত। তিনি ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা এঁর পূজার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় পূজা আরতি করতে হয় আমাকে। আমি রাজবাড়ীরও পূজো করি। রাজারা তিন পুরুষ আমাদের যজমান। যদিচ মেদিনীপুর আমার আসল দেশ, তবে রাজা এখানেই আমাদের ঘর বানিয়ে দিয়েছেন বলে এখন এখানেরই অধিবাসী বলতে পারেন।

সরমার মা জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা ঠাকুরমশাই, মন্দির সকালে ক'টার সময় খোলে?

ন'টা, সাড়ে ন'টার সময় সাধারণত খোলা হয় মা, তবে এখন ত ইন্‌ধ পর্ব লেগেছে তাই সকাল সকাল খুলি।

মন্দিরে বুঝি খুব ভীড় হয়?

হাঁ, দর্শন করতে আসে দূর অঞ্চল থেকে যে লোকেরা তারাই মায়ের পূজা দেয়। অবশ্য আসল ইন্‌ধ হলো ওইটা। বলে অদূরে পুরুতমশাই একটা লম্বা বাঁশ দেখালেন, সেই বাঁশটা মাটিতে পোঁতা রয়েছে। তার মাথার ওপর, সাদা পাগড়ীর মত ন্যাকড়া জড়ানো।

সরমা প্রশ্ন করে, ওই বাঁশটাকে ইন্‌ধ বলে?

হাঁ। পুরুত বলেন, অনেকটা আমাদের দুর্গাপূজোর বোধনের মত, ওই-খানে ওই বাঁশের নীচে ফুল, মিষ্টি ও পায়রা বলি দিয়ে এই পর্বের শুরু হয় ভাদ্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন। এরপর ক'দিন ধরে সাঁওতাল পাড়ায়

দিনরাত চলে নাচগান ও হৈ-হল্লা। হাঁড়িয়া খেয়ে, মাদল বাজিয়ে স্ফূর্তির ফোয়ারা ছোটে। পরের অষ্টমীর দিন পূজো আরম্ভ করার আগে তিনবার বন্দুকের আওয়াজ করে। তারপর একটা মহিষের গায়ে তীর বেঁধাতে হয়। এটা রাজারই করণীয়, তাঁর অনুপস্থিতিতে, তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কাজ সম্পন্ন করে। পরে সাঁওতালরা সেই মহিষটাকে বলি দেয়। মোট কথা প্রধান পূজোটা সাঁওতাল দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এ অঞ্চলে সবচেয়ে জমকালো ও বড় এই পরবটা। দু'হপ্তা ধরে মেলা চলার কথা তবে একমাসেও শেষ হয় না।

এই বলে পুরুতমশাই একটু থেমে বলেন। দেখেছেন মেলাটা ?

সরমা উত্তর দেয়, হাঁ, এই ত আমরা দেখে এলুম, বেশ লাগল ?

পুরুতমশাই আবার ফিরে আসেন তাঁর প্রসঙ্গে। বলেন, এই অনুষ্ঠানের শেষ অংশকে এরা বলে বিন্ধ। আসলে একই পরবের আরম্ভ ও শেষকে ইন্ধ আর বিন্ধ নামে অভিহিত করা হয়েছে। মুখ্যত রঙ্কিণী দেবীকেই কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই রঙ্কিণী দেবী সম্বন্ধে সাঁওতালদের মধ্যে অনেক রকমের উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সবচেয়ে বেশী চলে যে কাহিনী, সেটা এইরকম—। বলেই সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিলেন, বরাভূমের কোন এক গ্রামে নাকি এক সাঁওতালের এমন এক বোন ছিল যে রোজ রাত্রে একটি করে মানুষ ধরে খেয়ে ফেলতো। এই মেয়েটির নাম রঙ্কাই।

গ্রামের লোকেরা তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষে এই রফা করলে যে প্রতিবছর একটি করে মানুষ পালা করে তাকে দেওয়া হবে।

সেই গ্রামে এক বুড়ো সাঁওতাল পরিবার থাকতো। তাদের কোন ছেলে-পিলে হয়নি। বাপ-মা-মরা একটা ছেলেকে তারা প্রতিপালন করতো, সে বছর পড়লো এদের পালা। তখন তিনজনের মধ্যে কে যাবে, তাই নিয়ে ওদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে যায়!

এদিকে দিন শেষ হয়ে এলো, কিন্তু কেউই যখন গেল না, তখন এই রঙ্কাই রুদ্রমূর্তিতে নিজেই এসে হাজির হলো তাদের বাড়ী।

বুড়ো সাঁওতালের মাথায় তখন একটা বুদ্ধি খেলে গেল। একহাতে কতক-গুলো লোহার মাসকলাই, আর একহাতে সত্যিকারের মাসকলাই এনে সে রঙ্কাইকে বললে, বেশ আমিই আজ তোমার ক্ষিদে মেটাবো। কিন্তু তার আগে আমার একটি শর্ত আছে, তোমাকে সেটা মেটাতে হবে! আমার দু'হাতে

দু'মুঠি কলাই রয়েছে দেখতে পাচ্ছো—এর এক মুঠো তুমি খাবে, আর এক মুঠো আমি। যার খাওয়া আগে হবে, সেই জিতবে। তোমার আগে হলে তুমি আমায় খাবে। আর আমার আগে হলে, আমি তোমায় ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো গাঁ থেকে।

রঙ্কাই তাতেই রাজী হলো। তখন সাঁওতালটি আসল কলাই নিজের মুখে পুরে, লোহারটা ওকে দিলে খেতে। রঙ্কাই কিছুতেই চিবোতে পারে না। ততক্ষণে বুড়োর খাওয়া শেষ।

চুক্তি অনুযায়ী ঝাঁটা নিয়ে রঙ্কাইকে মারতে গেলে রঙ্কাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ঘাটশিলার কাছে সুবর্ণরেখার তীরে যেখানে একটা ধোপা কাপড় কাচছিল তার কাছে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করলে। বললে, তোমার এই পাথরের নিচে আমায় যদি একটু লুকিয়ে থাকতে দাও, তাহলে তোমাকে আমি অনেক জমিজমা দেবো। তোমার আর কোন দুঃখ থাকবে না।

ধোপা তখন তাকে পাথরের নীচে লুকিয়ে রেখে তার ওপর কাপড় চাপা দিলে।

এদিকে খুঁজতে খুঁজতে সাঁওতালরা সেখানে এসে রঙ্কাইকে দেখতে না পেয়ে তাকে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করে। কোন সঠিক উত্তর না পেয়ে যখন তারা ফিরে গেল তখন ধোপা কাপড়গুলো সরিয়ে পাটার নিচে চেয়ে মেয়েটিকে দেখতে না পেয়ে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হলো। কোথায় গেল রঙ্কাই? তবে কি কোন দেবী তাকে এইভাবে ছলনা করতে এসেছিল! এই মনে করে সেই পাথরের পাটাখানা তুলে নিয়ে গিয়ে একটা মন্দির তৈরী করে সেখানে সেটা স্থাপন করলে। সেই সাঁওতাল কন্যা রঙ্কাই তখন এই রঙ্কিণীদেবীতে পরিণত হয়।

পুরুতমশাই এই বলে চুপ করতেই ফিক্ করে হেসে ওঠে সরমা। এ হাসির অর্থ কি তা সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ না বুঝলেও, সরমার মা রাগে জ্বলে ওঠেন। ঠাকুর-দেবতাকে নিয়ে খেলা না? সব তাতে তোর এই অবিশ্বাস আর ঠাট্টা তামাশা ভাল লাগে না! বলে দু'হাত জোড় করে দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করে মেয়ের জন্যে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

হাঁ মা, বড্ড জাগ্রত দেবী! এখানে যে যা মানত করে, মা তার মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

সরমা এবার আর হাসি চাপতে পারে না। পুরুতমশাইকে তার মুখের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকতে দেখে, আঁচল দিয়ে নিজের মুখটা চেপে বলে,

আচ্ছা, আমি যদি মানত করি, আমার অনেক টাকা হোক, মোটরগাড়ী বিষয়-সম্পত্তি হোক, তাহলে কি দেবী আমার মনের এ বাসনা পূর্ণ করবেন!

পুরুতমশাই একটু থেমে উত্তর দেন, নিশ্চয়ই মা। তুমি যদি একমন এক-প্রাণ হয়ে মার কাছে মানতে পারো, নিশ্চয়ই তিনি দেবেন। ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করাই ত তাঁর লীলা মা!

বেশ তাই যদি হয়, তাহলে আমি হাজার টাকার গয়না গড়িয়ে দেবো আপনার এই দেবীকে।

জয় মা মঙ্গলময়ী! বলে ঠাকুরমশাই দু'হাত কপালে ঠেকাতেই সরমার মায়ের কণ্ঠ যেন ত্রাসে কেঁপে ওঠে। সব তাতে তোর এই রঙ্গরস ভাল লাগে না সরো।

বারে—এর ভেতর তুমি রঙ্গরস দেখলে কোথায়? আমি ত বলছি দেবী আমায় দিলে তখন আমি দেবো তাঁকে।

সরমার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ওর মা তখন স'পাঁচ আনা পয়সা বার করে পুরুতমশাইয়ের হাতে দিয়ে বলেন, এতে মায়ের পূজো দেবেন বাবা!

পয়সাটা হাতে নিয়ে পুরুতমশাই বলেন, সরমাকে লক্ষ্য করে, তুমি মা মেয়েছেলে, তোমার ভাগ্য পুরুষের সঙ্গে জড়িত, কোন বড়লোকের সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে লেগে যায়, তাহলে গাড়ী বাড়ী ধনদৌলত হতে কতক্ষণ! একদিনেই ত সব তোমার হতে পারে মা। স্বামীর অর্থে যখন স্ত্রীর সমানাধিকার!

ঝ্যাঁটা মারো বড়লোকের মুখে!

বেচারী পুরুতমশাই! এই উক্তির পিছনে যে কত বড় আঘাত লুকনো ছিল সরমার বুকে, তার কিছুই বুঝতে না পেরে শুধু বলেন, বড়লোকের ওপর তোমার এত রাগ কেন মা—ওরা আছে বলেই ত গরীবরা দুটো খেতে পরতে পায়।

চুপ করুন আপনি। সহসা রাগে জ্বলে ওঠে সরমার কণ্ঠস্বর। তারপর আর কিছু না বলে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে।

সরমার মা রাস্তায় এসে বলেন, তা উনি পূজুরী ব্রাহ্মণ, ওঁর ওপর এত রাগঝাল করছিস কেন? যখন বারণ করেছিলুম শুভেন্দুর সঙ্গে এত মেলামেশা না করতে, তখন ত মাকে খুব খারাপ লেগেছিল! এখন আর ও নিয়ে হা-হুতাশ শাপমন্যি করে লাভ কি! ওর বাপের এত পয়সা, গাড়ীবাড়ী, আমাদের মত

গরীবের ঘরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে যাবে কোন্ দুঃখে। পই পই করে তখন নিষেধ করেছিলুম।

তুমি চুপ করো মা! কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিতে এসো না! সে নিজে থেকে বলেছিল বিয়ে করবে, যদি এর জন্যে বাপ মায়ের বিরুদ্ধে যেতে হয় তাতেও পিছপাও হবে না, তাই তাকে বিশ্বাস করেছিলুম, তার সঙ্গে মিশতে গিয়েছিলুম। নইলে দায় পড়েছিল তার দিকে তাকাবার।

সব ছেলেরাই প্রথমে ওই কথা বলে, মেয়েদের মন ভেজায়। তুই যেমন বোকা, লেখাপড়া শিখেছিস শুধু নামে—ওই কথা শুনে একেবারে গলে গেলি!

কেন, বড়লোকের ঘরে কি আর গরীবের মেয়েরা বৌ হয়ে যাচ্ছে না?

যাচ্ছে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপর্যয় ঘটে। কেউ সুখী হতে পারে না।

সরমা এবার বাগচাপা গলায় বলে, আর গরীবের ঘরে গেলেই বুঝি মেয়েদের সুখ ধরে না! এক আগুন থেকে আর এক নতুন আগুনে ঝাঁপ দেওয়া। কি সুখী হয়েছে পূর্ণিমা? কি সুখে আছে অনিলা? সবই ত জানো।

জানি! সরমার মা বলেন, সেও তবু শতগুণে ভাল। গরীবের মেয়ে যেমন বাপের ঘরে ছিল, তেমনি স্বামীর ঘরে আছে। মনে সুখ আছে, শান্তি আছে। সোনার অট্টালিকায় থেকে দিবারাত্র জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে সে অনেক ভাল।

তুমি চুপ করো মা। ওই এক কথা শুনে শুনে কান পচে গেছে!

সরমার মা এবার মুখ ঝামটা দেন, একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে সব ছেলেকে ওই দলে ফেলে, বিয়ে করবো না বলে নিজের ওপর অভিমান করার মত বোকামী কাজ আর কিছু নেই, একদিন বুঝতে পারবি। এখনো সময় আছে। পরে এইসব দিনের জন্যে কাঁদতে হবে, তাও বলে রাখছি।

আচ্ছা, যদি কাঁদতে হয় ত আমি একাই কাঁদবো। তোমাদের তার ভাগ নিতে ডাকবো না। যেটুকু লেখাপড়া শিখেছি, দুটো ছেলেমেয়ে পড়িয়েও নিজের পেটটা চালিয়ে নিতে পারবো, এটুকু বিশ্বাস নিজের ওপর রাখি! চিরদিন তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকবো না মনে রেখো।

অমনি রাগ হয়ে গেল মেয়ের! বলি আমি কি তাই বলছি? আজকাল ত হামেশাই শুনি এইরকম হচ্ছে। ছেলেরা বিয়ে করবে বলে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে শেষে একদিন সরে পড়ে। তারপর আর একজনের গলায় মালা দিয়ে দিব্যি সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করছে মেয়েরা। তোর মত এমন বেয়াড়া কটা মেয়ে আছে শুনি? বিয়ে করবে না বলে তোর মত এমন ধনুকভাঙা পণ করে বসে থাকে ক'টা মেয়ে? শুভেন্দুর সঙ্গে কি এমন মনের মিল হয়েছিল যে, আর কোন ছেলেকে পছন্দ নয়। বরং সে যেমন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার প্রতিশোধ নেবার জন্যেই তাড়াতাড়ি বিয়ে করে তাকে দেখিয়ে দেওয়া উচিত। আমি ত এই বুঝি!

তোমার বোঝাবুঝি নিয়ে তুমি থাকো মা। সবাইয়ের মতের মিল যে তোমার সঙ্গে হবে, এটা তুমি আশা করো কি করে!

আমি মুখ্যু, তোমাদের মত লেখাপড়া শিখিনি, কাজেই সে আশা করি না। তবে হক্-কথা যদি বলতে হয়, তবে বলবো দোষটা ছেলেদের চে—রাগ করো না তোমাদের-ই বেশী। একালের মেয়েরা বড় গায়ে পড়া। পুরুষ দেখল কি অমনি হামলে পড়ে। এতটুকু ধৈর্য ধরতে জানে না। এতটুকু সবুর সয় না। আরে, একটা অপরিচিত ছেলে যার কিছু জানি না—যাকে চিনি না শুনি না—হঠাৎ দু'দিনের আলাপেই একেবারে এমন অন্তরঙ্গ করে তুলিস তোরা যে মনে হয় যেন কতকালের পরিচয় তোদের সঙ্গে! কাজেই তার সুযোগ তারা নেয় এবং পরিণাম যা হবার তা হতে বাধ্য!

এই বলে, আত্মসমালোচনার ছলে তিনি আবার বলেন, আমাদের কালে বিয়ের পরেও কতদিন লাগতো স্বামীর সঙ্গে ভাবসাব হতে, মন জানাজানি হতে। তোদের একালের মেয়েদের এমন একটা হ্যাংলামি ভাব, যেন এখনি পুরুষটা হাতছাড়া হয়ে যাবে! এ যুগটা যে একেবারে উল্টে গেছে! কোথায় পুরুষ মেয়েকে পাবার জন্য সাধ্যসাধনা করবে, তা নয় মেয়েদের জিব দিয়ে লাল পড়ে পুরুষ দেখে। এর ফলে যা অবশ্যম্ভাবী তাই হচ্ছে। পুরুষদের ওপর বৃথা দোষ দিলে কি হবে!

না, সব দোষ মেয়েদের!

হাঁ তাই। একশো বার! চারিপাশে দেখে দেখে চোখ পচে যাচ্ছে। যেমন কর্ম তেমনি ফলও সব পাচ্ছে! লেখাপড়া শিখলে মানুষের কোথায় বুদ্ধি-শুদ্ধি ভাল হবে তা নয় একেবারে বিপরীত। আমাদের সময়ে যে মেয়েরা মুখ্যু

ছিল, তারাও জানতো অনেক বেশী, জানতো কি করে পুরুষকে বশ করতে হয়। তোদের মত লেখাপড়া-জানা-মূখ্যু মেয়ে ছিল না তারা।

দোহাই মা তোমার পায়ে পড়ি। চুপ করো, ঢের শুনেছি, আর পারছি না।

বেশ, চুপ করছি আর বলবো না। ভেবে ভেবে চেহারাটা দিন দিন কি করছিস সেটা যাকে চোখে দেখতে হয় দিনরাত, সে-ই জানে তার জ্বালা কি! এ একরকমের আত্মহত্যা। তিলে তিলে ক্ষয়ে শুকিয়ে যাওয়া। রোগ আর তাই কিছুতেই সারে না। শরীরও ভাল হয় না, যতই ওষুধ খাও, আর দেশ-বিদেশে হাওয়া বদল করতে যাও।

এর কয়েক দিন পরেই শুরু হয় 'বিন্ধ' এর উৎসব! হাঁড়িয়া খেয়ে কোমর ধরাধরি করে মেয়েরা নাচে আর তারই তালে তালে মাদল বাজে, বাঁশি বাজে। নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যেন একটা নিদারুণ উন্মাদনা জাগে। সবচেয়ে হাসি লাগে সরমার ওদের গান শুনে। যেন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। যেমন ভাষা তেমনি বাণী।

হুল পড়ে জল পড়ে
এই আ—লো—বেলা ডেরারে খুঁজো।
জল যদি পড়ে তো খেজুর গাছ তলে,
হুল যদি পড়ে তো নারাঙ্গি ধারে।

অর্থাৎ শিলা পড়ছে, জল ঝরছে, কাজেই বেলা থাকতে থাকতে বাড়ী চল। জল যদি পড়ে, খেজুর গাছের নীচেই পড়বে। আর শিলা পড়লে, নালা দিয়ে ভেসে যায়।

সবচেয়ে অবাক লাগে, ছোঁড়া-ছুঁড়ীর দল অনেক রাত পর্যন্ত এইভাবে যথেচ্ছ নাচ গান করে, কিন্তু তার জন্যে কোন বিধিনিষেধ নেই। বুড়োবুড়ীরা যদিও মুখে বলে, না না, অনেক রাত হলো ঘুমতে যা। কিন্তু কে কার কথা শোনে। তখন তারা শুয়ে পড়ে। কিন্তু ওদের নাচগান তখনো চলে পুরোদমে। বরং বাড়ে আরো। তারা গেয়েই চলে, নেচেই চলে। নাচ-গানের নেশায় মশগুল হয়ে যায়।

এইভাবে উচ্ছৃঙ্খল অঙ্গভঙ্গী ও মুদ্রা ছুঁড়ে ছুঁড়ে পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে গিয়ে কখনো বা রাত পুইয়ে যায়।

সারারাত সরমাও জেগে থাকে। কেন কে জানে তার চোখে এক ফোঁটা ঘুম আসে না। মাদলের বাজনা বাঁশীর সুর বুঝি তার মনটাকে টেনে নিয়ে যায় সেইখানে। সেইসব নতুন শাড়ীপরা, মেলা থেকে কেনা রূপোর গয়নায় ভূষিতা কুমারী মেয়েগুলোর দলে, যারা পরিপাটী করে চুল বেঁধে খোঁপায় ফুল গুঁজে নাচছে, গান করছে পুরুষগুলোর সঙ্গে।

সরমা জেনেছিল এই উৎসব উপলক্ষে মেলায় এসে তারা নাকি বরকনে পছন্দ করে। দূর দূরান্ত পল্লী থেকে যে সব ছেলেমেয়েরা সেখানে আসে বেচাকেনা করতে, তারা নাকি দিনশেষে তাড়ি খেয়ে মহুয়া খেয়ে, মাতাল হয়ে হাত ধরাধরি করে মেয়ে-পুরুষে ওই নাচগানের ভেতর দিয়ে পরস্পরের মন কাড়াকাড়ি খেলে!

তাই এই উৎসবটার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে তাদের কাছে। এটাই নাকি ওদের সবচেয়ে বড় পর্ব!

ওখানে কোন মেয়ের সঙ্গে কোন ছেলের মন মজেছিল কিনা সে খবর সরমা রাখে না, তবে ওদের পাড়ায় সেবছর রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে যে ফাংশন হয়েছিল, তাতে ওদের ওই গলির-ই মেয়ে শ্রাবণী কুশারীর নির্মোক নৃত্য দেখে, এক বড়লোকের ছেলে এমন মুগ্ধ হয়েছিল যে একটি পয়সা না নিয়ে, পনেরো দিনের মধ্যেই তার গলায় মালা দিয়ে নিয়ে চলে যায়!

ওদের ঠিক নীচের ক্লাসে পড়তো যে শকুন্তলা, মেট্রো সিনেমায় ম্যাটিনীর শো দেখতে গিয়ে নজর পড়ে তার ওপর যে ছেলেটির, সে কেমন করে একই বাসে চেপে তার পিছনে ধাওয়া ক'রে, শেষে একদিন তাকে বিয়ে করে, সে কাহিনীটাও যেন ওর চোখের সামনে ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে। আর এমনি করেই কোথা দিয়ে যে রাত্রি পুইয়ে যায় বুঝতে পারে না।

॥ ১৩ ॥

আবার একদিন সরমারা এসে ওভারসিয়ারবাবুর ফটকের পাশে সেই বাঁধানো সাঁকোটার ওপর বসে। দাদুর বেশভূষা ঠিক আগের দিনের মতই, সেই তালি-মারা পুরনো লুঙ্গিটা, খালি গা, দড়িবাঁধা চশমা চোখে, সাঁকোয় বসে তামাক খাচ্ছিলেন।

সরমা বলে, কি দাদু, আজ সকাল সকাল বাগানের কাজ সেরে ফেলেছেন যে?

তোমরা যে আসছো এদিকে, গুইরাম দূর থেকে আগেই তা দেখেছিল। তাই তামাকটা নিয়ে অপেক্ষা করছি তোমাদেরই জন্যে।

সরমার বাবা-মাকে বসতে বলে দাদু চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে গুইরাম, এঁদের জন্যে একটু চা করে আন বাবা! এঁরা শহরের লোক, নইলে আমাদের অসভ্য বলবেন যে!

না—না—আমরা এইমাত্র খেয়ে বেরিয়েছি, আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হবেন না, ওকে বারণ করে দিন! আমরা মোটেই আপনাকে অসভ্য বলবো না।

তবে থাক রে। বলে আবার তেমনি হাঁক পাড়লেন। তারপর আপন মনেই বলে উঠলেন, কলকাতার শহরে এই একটা মহা সুবিধে, যখন যা ইচ্ছে হুকুম করলেই পাওয়া যায়! আমাদের এখানে লোকলৌকিকতা করার উপায় নেই। জানি শহরের লোকেরা এইজন্যে আরো আমাদের দেখতে পারে না! ওখানে আর কিছু হোক্ বা না হোক এক কাপ গরম জল আগেই এনে তোমার হাতে তুলে দেবে।

দাদু, আপনি মিছি-মিছি শহরের লোকদের গালাগাল দিচ্ছেন! সরমা বলে, আপনি যখন তাদের কিছুই জানেন না, তখন ও বিষয়টা আপাতত মুলতুবী রেখে, আপনার এখানের গল্প কিছু বলুন শুনি। এতকাল এখানে রয়েছেন এখানকার লোকজনের সম্বন্ধে কত কি জানেন।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দাদু বলে, তা ঠিক। তবে সে সব তোমাদের মত শহরের লোকদের কি ভাল লাগবে ভাই। তার চেয়ে বরং এই জায়গাটা তোমাদের কেমন লাগছে, আগে শুনি।

সরমার মা বলেন, লাগছে ত ভালই। কিন্তু খেতে বসলেই চোখে জল আসে যে। কিছুই ত পাওয়া যায় না!

পাবেন কি করে। এখানকার লোকজন ত এখন চাষবাস ছেড়ে দিয়েছে। তারা সব বাবু বনে গেছে। ভোর হতে ত্বর সয় না ছোটে মেয়ে-মদ্দে, মজুর খাটতে—পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, বিহারী সব মহাজনদের কাছে। কেউ দেড় টাকা, কেউ দু'টাকা রোজ পায় বটে কিন্তু তাতে যে তাদের পেট ভরে না, এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল যখন ক্ষেত-খামারের কাজ করতো, তা বুঝেও বোঝে না। দেখো না, দু'টো মজুরকে দু'টাকা রোজ দেবো বলে আজ কতদিন ধরে খোশামোদ করছি কিন্তু তাদের এত পায়া ভারী যে সময়ই হচ্ছে না। যত

আক্রোশ ব্যাটাদের বাঙ্গালীর ওপর! অথচ আগে এটা ছিল না। এখন দশটা বিদেশী লোক এসে ওদের কান ভাঙাচ্ছে, তা বুঝি।

খপ্ করে সরমা ইন্ধন যোগায়, তা একদিন আপনারা ওদের কি ভাবে শোষণ করেছেন জানতে পেরে যদি আজ ওরা সতর্ক হয়, তাহলে ওদের দোষ দেওয়া যায় না দাদু!

চীৎকার করে উঠলেন তিনি, অকৃতজ্ঞ আন্‌গ্রেট্‌ফুল ক্রিচার্ এদের মত আর নেই। একদিন দু'আনা রোজ আর একবেলা খেতে দিলে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খাটতো এরা। অথচ আজ ওদের পায়ে তেল দিতে হয়।

এটা ত ভালো দাদু! ওরা আজ ওদের শ্রমের মূল্য বুঝতে শিখেছে।

তুমি দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছো, তোমার পক্ষে ওকথা বলা খুবই সহজ। কিন্তু যারা চিরদিন বাস করে এখানে, তাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখো দিদিমণি।

সরমার কণ্ঠে বিদ্রূপ ঝলকে ওঠে, ওরা সেদিন বোকা ছিল বলেই ত আপনাদের সুবিধে হয়েছিল এই রকম সব বিরাট বাগান-বাগিচা করার। জানি, আজকে হলে, আর এসব করা সম্ভব হত না আপনাদের পক্ষে!

দাদু বলেন যেমন ভাল ছিল, তেমনি হয়েছে এখন হারামজাদা!

সরমা হেসে ওঠে, ওদের হারামজাদা করেছে কে দাদু, আমরা নয় কি?

কি বলছো তুমি দিদিমণি!

ঠিকই বলছি।

যদি বেশী দিন থাকো এখানে, একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে কি সাংঘাতিক জাত ওরা!

সরমা বলে, কি জানি যতদিন যাচ্ছে আমার ত ধারণা ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে ওদের সম্বন্ধে। ওই দুল্‌হা সর্দারটা ছিল বলেই আজো আমরা যা হোক কিছু খাবার জিনিস পাই! কোনদিন একটু মাছ, কোনদিন ডিম, কোন দিন একটু আধটু আনাজপত্তর বাড়ী বয়ে দিয়ে যায়!

চোর! চোর! ও ব্যাটা ডাহা চোর। ওকে বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঢুকতে দিয়ো না। ওকি ভেবেছো কিনে আনে কিছু? এর ওর বাগান থেকে চুরি-চামারি করে যা পায় নিয়ে আসে।

এ্যা! তাই নাকি! বলে সরমার বাবা একবার নীরবে সরমার মায়ের মুখের দিকে তাকালেন।

ওভারসিয়ারবাবুর কণ্ঠ এবার তিক্ত হয়ে ওঠে। বলেন, শুধু কি তাই, ব্যাটা এক নম্বর লম্পট, চরিত্রহীন! ওর জন্যেই জন্‌সন্ সাহেবের এত বড় বিজনেস্‌টা ছারখার হয়ে গেল!

কি রকম? বলতে বলতে সরমার বাবা পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে নিঃশব্দে ধরালেন।

ওভারসিয়ারবাবু একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, সে সব নোংরামি, কেচ্ছা মেয়েদের সামনে মুখে আনা যায় না।

একটু-আধটু বলুন না দাদু! সরমার কণ্ঠ থেকে আগ্রহ ও কৌতূহল একসঙ্গে যেন ছিটকে পড়ে।

সরমার বাবার ওতে নীরব সমর্থন লক্ষ্য করে তিনি শুরু করলেন, জানেন, ওই ব্যাটা দুল্‌হা একদিন জনসন সাহেবের কুলি সাপ্লাই করতো। পাহাড় পল্লী অঞ্চল থেকে মেয়ে পুরুষ ধরে নিয়ে এসে পাথর ভাঙার কাজে লাগাতো।

জনসন সাহেবের পাথরের 'বিজনেস্' দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে উঠলো।

আমি তখন সবে 'রিটায়ার' করেছি। বসেছিলুম ঘরে বেকার। সোজা গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাকরী হয়ে গেল। আমি এখানে বাড়ীঘর করে বাস করি শুনে, আমার প্রতি তাঁর আস্থা হয়েছিল খুব বেশী। তিনি বলতেন, আমি ঠিক এমনি একজন লোকই খুঁজছিলুম, কারণ বাইরের লোক নিলে দেশে যাবার জন্যে কেবল ছুটি চেয়ে বসে। তারপর দু'দিনের জন্যে দেশে যাচ্ছি বলে গিয়ে দশদিন ডুব মারবে। ক্রমে তিনি আমার হাতে তাঁর ব্যবসায়ের হিসাব-পত্র, টাকা-কড়ি সব কিছু বিশ্বাস করে তুলে দিয়েছিলেন। কুলি-কামিনদের সপ্তাহে সপ্তাহে 'পেমেণ্ট' করার ভারও ছিল আমার ওপর।

জনসন সাহেব আদর করে আমায় ডাকতেন পুরনো নামে। 'ওভারসিয়ার' বলে। সেই থেকেই এ অঞ্চলের সাঁওতাল কুলি মজুর সকলের কাছেই আমি ওই নামে সুপরিচিত হই।

এই পর্যন্ত বলে ওভারসিয়ারবাবু বার কতক একসঙ্গে ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ শব্দে ধূমপান করে নিলেন। তারপর নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার পুরাতন প্রসঙ্গে ফিরে এলেন।

তবে হাঁ, সাহেবের মনটা ছিল খুব দরাজ। কাজটাকে সাহেব বুঝতো সকলের আগে, তাই কাজ পেলেই খুশি, দু'হাতে টাকা লুটিয়ে দিতে কসুর করতেন না।

কিন্তু চাঁদে কলঙ্কের মত একটু দোষ ছিল সাহেবের চরিত্রে। বড্ড মদ খেতো আর সেই সব কুলিকামিনী মেয়েগুলোর ওপর লোভ ছিল। দুল্‌হা ব্যাটা সাহেবের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রচুর টাকা হাতাতে লাগল তার কাছ থেকে। চাকরীর নাম করে এখানে যেসব মেয়েদের নিয়ে আসতো বেশী টাকার লোভ দেখিয়ে, সাহেবের হাতে তাদের তুলে দিতো। পাহাড়ের ভেতরে সাহেবের ছিল একটা ছোট বাংলো। কাজের নাম করে বেরিয়ে সারাদিন ধরে সেখানে সাহেব মদ খেতো আর হুল্লোড় করতো।

এদিকে সাহেবের পেসাদ পেয়ে ও-ব্যাটার আস্পদ্দাও দিনে দিনে বেড়ে চললো। দুল্‌হা তখন সাহেবের এমন প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল যে তার ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজের তদ্বির তদারক সে করতো। হাটের দিন হলে তিন ক্রোশ দূর থেকে পাহাড়ের পথ ভেঙে মেমসাহেবের জন্যে মুরগী, ফল, তরিতরকারী মাথায় করে নিয়ে আসতো। তাছাড়া কোন ঝি চাকরের অসুখ বিসুখ করলে, তার কাজগুলো দুল্‌হাকে দিয়ে করিয়ে নিতো মেমসাহেব। তার নিজের শরীর খারাপ হলে ওষুধ, ডাক্তার, পথ্য সব কিছু যোগাড় করে আনতো সে। সাহেব ত সেই সকালে বেরিয়ে যেতো কাজে, আর ফিরতো অনেক রাতে। ঝড়, জল, রোদ বৃষ্টি কোন সময়েই কামাই করতো না, এইসব কাজে দুল্‌হা। মেমসাহেব এই জন্যে দায়িত্বপূর্ণ সব কাজেই দুল্‌হাকে ডেকে পাঠাতো।

ক্রমশ এমন হলো যে দুল্‌হাকে দিবারাত্র সাহেবের বাংলোতে দেখা যেতো। সাহেবও এমন অনেকদিন হয়েছে, রাত্রে আর বাড়ী ফেরেনি।

ভেতরে ভেতরে ওই দুল্‌হা সর্দারের সঙ্গে মেমসাহেবের ঘনিষ্ঠতা যে কতদূর এগিয়েছিল, কেউ তা জানতো না। এমন কি সাহেবও না।

সাহেবের প্রথম ছেলে হবে। আনন্দ আর ধরে না। কলকাতা থেকে ইউরোপীয়ান নার্স আনিয়ে রেখেছেন বাড়ীতে।

কিন্তু পুত্রসন্তান যেদিন জন্মালো সেদিন খুন চেপে গেলে সাহেবের মাথায়। ছেলের মুখ দেখতে গিয়ে তিনি শিউরে উঠলেন। ব্ল্যাক নিগার! এই রকম কালো দেহের রং সে পেলে কোথা থেকে?

ছুটে গিয়ে ঘর থেকে রিভলভারটা এনে মেমসাহেবের বুকের সামনে তুলে ধরে বললে, টেল্ মি দি ট্রুথ অর আই শ্যাল স্যুট ইউ। শিগ্‌গির সত্যি বলো, নইলে, আমি এখুনি গুলি করে মারবো তোমায়!

থর থর করে সাহেবের সর্বাঙ্গ কাঁপছে।

মেম বেটিও তেমনি। বাঘিনীর মত রুখে উঠলো, বেশ করবো, হাজার বার করবো। তুমি দিনের পর দিন ওই নিগারের মেয়েগুলোর সঙ্গে ফুর্তি করতে পারো, তার বেলা কিছু হয় না? হি ইস্ মাই ডারলিং। বলে তার সামনে বুকটা পেতে দিয়ে বললে, আই লাভ দ্যাট্ সর্দার!

হোয়াট! বলে চীৎকার করে উঠতেই পাশের ঘর থেকে আমি ছুটে গিয়ে আগে সাহেবের হাতটা চেপে ধরলুম। সাহেবকে 'প্লীজ বি কোয়ায়েট' বলে হাত থেকে ছিনিয়ে নিলুম রিভলভারটা। বাবুর্চি আয়া চাকর মালী যে যেখানে ছিল সবাই ছুটে এলো। সাহেব তখনো গর্জন করছে, আই শ্যাল স্যুট্ হার।

মদের ঝোঁকটা তখনো ছিল। সকলে মিলে অনেক বুঝিয়ে একটু পরে সাহেবকে শান্ত করলে, কিন্তু তার মনের ভিতরে যে আক্রোশটা ছাই চাপা আগুনের মত ধূমায়িত হচ্ছিল তা কেউ বুঝতে পারেনি।

দুল্হা সর্দার সেই সময় কুলি সংগ্রহের জন্যে গিয়েছিল বাইরে। দিন পনেরো পরে ফিরে যেদিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এলো সাহেব, তখন বাইরের টেবিলে বসে হিসেবের খাতার মধ্যে যেন কি খুঁজছিল। ওকে ফটকের দিকে আসতে দেখে কখন যে ঘরের মধ্যে থপ্ করে উঠে গিয়ে আলমারীর চাবিটা খুলে নিঃশব্দে রিভলবারটা হাতে নিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল দরজার আড়ালে মেমসাহেব তা জানতো না। সে ভেবেছিল সাহেব বুঝি বেরিয়ে গেছে, বাড়ী নেই। তার শোবার ঘরের জানলা থেকে যেমন সে দুল্হাকে দেখতে পেয়েছিল আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে, অসুস্থ দেহটা নিয়ে তখনি ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে। তারপর বাগানের ফটকের দিকে হন হন করে যখন এগিয়ে গেল, দুল্হা তখন ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। 'যাও ভাগো, ভাগো জল্দি, ইধার মত্ আনা সাহাবকো বহুত্ গোসা হুয়া।' বলে তাকে যখন ভেতরে আসতে নিষেধ করছে, তখন রিভলবারটা চোখের কাছে তুলে একটা চোখ বন্ধ করে সাহেব যে দুল্হা সর্দারের বুকটা লক্ষ্য করছিল কেউ তা জানতো না।

সর্দার থমকে দাঁড়িয়ে শুধু প্রশ্ন করলে, কেন সাহেবের এতো গোঁসা হইছে?

উয়ো পিছু তুম্‌কো বাতায়েগা। আবি ভাগো। কুইক্!

সর্দার আর কোন কথা না বলে যেমন ঘুরতে যাবে, অমনি একটা গুলি এসে লাগল একেবারে মেমসাহেবের বুকে! হাতটা কেঁপে গিয়েছিল বুঝি জন্‌সন্ সাহেবের, তাই একজনের বুকের গুলি আর একজনের বুকে এসে বিঁধলো।

'সাহেব আমায় খুন করলো! বলে একবার শুধু যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠেই মাটিতে পড়ে গেল মেমসাহেব। ফিন্‌কি দিয়ে ছুটলো রক্তের স্রোত। বুকের পিঠের জামা সব লালে লাল হয়ে গেল। মাটির ওপর রক্তাক্ত কলেবরে লুটোতে লাগল মেমসাহেবের দেহটা। চাকরবাকর, আয়া, দাসী যে যেখানে ছিল ছুটে এলো। মেমসাহেবের মৃতদেহটাকে ঘিরে সবাই হায় হায় করতে লাগল।

একপাশে জন্‌সন্‌ সাহেব এসে দাঁড়ালো বজ্রাহতের মত।

তুল্‌হা ছুটতে ছুটতে খবর দিতে গিয়েছিল থানায়।

তখনি পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর এসে হাজির হলেন, সঙ্গে তিন-চার জন কনস্টেবল্‌ নিয়ে। সাহেবের সঙ্গে ইনস্‌পেক্টরের আলাপ ছিল আগেই। ইংরিজীতে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হবার পর, তুল্‌হার কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে চলে গেল।

উপস্থিত ঝি চাকর আয়া দাসী কেউই চোখে দেখেনি, কে গুলি ছুঁড়েছে। তারা সত্যি কথা বললে। কাজেই সাহেবের কথার ওপরে বিশ্বাস করে তুল্‌হাকেই অপরাধী বলে গ্রেপ্তার করলে ইনস্‌পেক্টর সাহেব। তুল্‌হা প্রথমটা খুব আপত্তি করলে। বললে, কিছুই সে জানে না, একেবারে নির্দোষ নিরপরাধ। তবে মেমসাহেবকে সে বলতে শুনেছিল, 'সাহেব আমাকে খুন করলো।' কিন্তু তার কথায় কেউ বিশ্বাস করলে না। বিচারে তুল্‌হা-সর্দারের ফাঁসী না হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিল সরমা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, তারপর?

ওভারসিয়ারবাবু এবার একটু রসিকতা করে বললেন, তারপর আর কি, ওই ব্যাটার জন্য সাহেবের ব্যবসাটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। কাজকারবার গুটিয়ে ঘরে তালা মেরে সেই যে সাহেব চলে গেল এখান থেকে, আর আসেনি বোধহয় দেশে গিয়ে থাকবে। কে জানে!

এই বলে নিঃশব্দে হুঁকোতে একসঙ্গে গোটাকতক টান দিতে লাগলেন।

সরমা, তার বাবা, মা কারো মুখে কোন কথা নেই। শুধু ভুড়ুক-ভুড়ুক ভুড়ক একটানা শব্দ সেই স্তব্ধতাকে যেন আরো বেশী ভারাক্রান্ত করে-তুলছিল।

এমন সময় হঠাৎ ওভারসিয়ারবাবু বলে উঠলেন, হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। চৌদ্দ বছর পরে তুল্‌হা সর্দার যেদিন খালাস পেয়ে ফিরে এলো,

জন্‌সন্ সাহেবের কে এক আত্মীয় কলকাতা থেকে এসে ওই বাড়ীর চাবি আর একটা খামের মধ্যে তার দলিল দানপত্রসমেত ওর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, সাহেব ওই সম্পত্তিটা তোমায় দান করেছেন।

ওই ব্যাটা শয়তান কিন্তু প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি। তারপর থানায় ইনস্‌পেক্টরবাবু, স্টেশনমাষ্টার ও আরো কয়েকজন ভদ্রলোককে সেই কাগজপত্র দেখিয়ে যখন জানতে পারলে যে সাহেব মিথ্যা বলেনি তখন তার আনন্দ আর ধরে না।

সরমার মা বলে উঠলেন, আহা, বেচারী গরীব মানুষ। বিনাদোষে চোদ্দটা বছর জেল খেটে এলো! তাই বোধহয় সাহেবের বিবেকে বাধলো। সাহেব হোক, আর যা ই হোক্ মানুষ ত?

না। এটা সত্যি কথা, জন্‌সন্ সাহেবের দিল ছিল।

সরমা এবার ফোঁস করে উঠলো, দিলটা আপনি সাহেবের দেখলেন কিন্তু যাকে শয়তান, অসভ্য জানোয়ার বলে উল্লেখ করছেন, তার বুঝি কিছু নেই। সাহেবের সমস্ত কলঙ্ক মাথায় নিয়ে মুখ বুজে যে চোদ্দ বছর কারাগারে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করলো, তাকে ওই বাড়ীটা দান করে এমন কিছু মহত্ত্বের পরিচয় দেননি আপনার জনসন্ সাহেব।

ওভারসিয়ারবাবু বললেন, কিন্তু ওই সম্পত্তিটার মূল্য কম নয়। ওই ব্যাটা জংলাটার কাছে ওর মূল্য অবশ্য কিছুই নেই। তাই তেমনি চা ব দিয়ে ফেলে রেখেছে। ঘর দোর সব ভেঙে পড়ছে, সারাবার ক্ষমতা নেই, তবু ওটাকে বিক্রী করবে না। আমি জানি কয়েকজন লোক ওই বাড়ীটা কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু ও দেয়নি। টাকাও তারা নেহাত মন্দ দিতে চায়নি, এখানের সম্পত্তির তুলনায় ভালই। কিন্তু ওর মুখে সেই এককথা, 'ও হামি বেচবেক নাই'!

এই বলে আবার হুঁকোতে দু'একটা টান দিয়ে ওভারসিয়ারবাবু আপন মনেই বলে উঠলেন, মর্ ব্যাটা, না বিক্রী করলি ত কার বয়ে গেল। তুই দু'টো পয়সা পেতিস, খেয়ে পরে বাঁচতিস, এতদিন দুঃখ ভোগ করেছিলি না হয় তার বদলে কিছুদিন নবাবী করতিস। তা নয়, "কানা গরুর ভেন্ন গোঠ।" বাড়ীটা ত এখন ভূতের বাড়ীতে পরিণত হয়েছে।

তাই নাকি! সভয়ে প্রশ্ন করে সরমা।

ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে ওভারসিয়ারবাবু বলেন, ওখানকার লোকদের ধারণা সেই মেমটা নাকি পেত্নী হয়ে আছে ওই বাড়ীটাতে। কেউ কেউ

বলে অমাবস্যার রাত্রে তারা নাকি দেখেছে, একেবারে সেই মূর্তি—যেমন আগে জন্‌সন্‌ সাহেবের স্ত্রী বারান্দায় বসে কাঠি দিয়ে উল বুনতো, এখনো তেমনি বোনে।

এই পর্যন্ত বলে ওভারসিয়ারবাবু এমন ভাবে চুপ করলেন, যেন তাঁর বক্তব্য শেষ। ওর সম্বন্ধে আর কিছু বলার নেই!

ভুড়ুক—ভুড়ুক—ভুড়ুক—একটানা শুধু হুঁকোর শব্দের সঙ্গে তামাকের ধোঁয়া এঁকে-বেঁকে বাতাসের বুকে মিলিয়ে যেতে লাগল।

সরমা তাকিয়ে দেখলো—তার মা ও বাবার মুখে কেমন একটা স্তব্ধ ভাব। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে সরমা সেই একটানা নীরবতাকে যেন ভেঙে দিলে। তারপব ওভারসিয়ারবাবুর মুখের ওপর আস্তে আস্তে নিজের চোখ দুটো রেখে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা দাদু, সেই মেমসাহেবের বাচ্চাটার কি হলো?

তাচ্ছিল্যের হাসি ছড়িয়ে তিনি বললেন, তার একটা সাঁওতালী আয়া ছিল, সেই নাকি বাচ্চাটাকে মানুষ করবে বলে সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল। আবার সকলে তেমনি নীরবে বসে রইলো। সকলের মন যেন ভারাক্রান্ত।

সরমার কৌতূহল কিন্তু বেড়েই চলে। বলে, আচ্ছা দাদু, জেল থেকে ফিরে এসে ছেলেটার কোন খোঁজ করেনি দুল্‌হা!

করলে কি হবে! সে নিয়েও এক মহা হাঙ্গামা! মারামারি কাটাকাটি। সেই যে আয়াটা, সে ছেলেটাকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছে, ওর বাপ নেই মরে গেছে বলেছে। ছেলেটাও তাই জানে এবং বিশ্বাস করে। এদিকে একটা জেলফেরতা খুনী-আসামী যখন তাকে ছেলে বলে দাবী জানাতে গেল, সেই ছেলে তখন তাকে কেবল অস্বীকার করলে না, রীতিমত গালাগাল আর মারধোর করে তাড়িয়ে দিলে।

কিন্তু ভীষণ দুর্দান্ত প্রকৃতি ছিল এই সর্দারের। তাই সেই আয়াটার ওপব প্রতিশোধ নেবার জন্যে ছলছুতো খুঁজতে লাগল। ওকে মেরে ফেলে ছেলেটাকে নিয়ে ওই বাড়ীতে বাস করবে, এই ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু ঈশ্বর বিরূপ! এই সময় একদিন ছেলেটা হলো পলাতক। তারপর শুনেছি সে নাকি এখন হয়েছে একজন ইঞ্জিন ড্রাইভার। আমাদের এই সাউথ্‌ ঈস্টার্ন রেলে চাকরী করে। এখান দিয়ে বড় বড় মেল ট্রেন ছুটিয়ে চলে যায়।

ছ্যাঁৎ করে ওঠে এবার সরমার বুকটা! ও, সেইজন্যে বুঝি যখন তখন রেল-

লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে সর্দার, ছেলেটাকে চোখে দেখবে বলে! আহা! ওর পুত্রবাৎসল্যের কথা চিন্তা করতে করতে সরমার মনে কোথায় যেন সেই অসভ্য ভুল্‌হা সর্দারের জন্যে সহানুভূতি জমে ওঠে।

আরো মিনিট কয়েক তেমনি নির্বাক থেকে, শেষে তারা উঠে পড়লো। ওভারসিয়ারবাবু সরমাকে বললেন, আবার যেদিন এদিকে আসবে, এসো! আরো অনেক গল্প তোমায় শোনাবো।

সরমা বুঝি তখনো ভুল্‌হা সর্দারের কথাই ভাবছিল। তাই তাঁর কথায় কোন জবাব না দিয়ে শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

॥ ১৪ ॥

সেদিন রাত্রে বারে বারে সরমার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। যত বার চোখ বোজাবার চেষ্টা করে, ভুল্‌হা সর্দারের মুখটা যেন ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ভোর হতে তর সয় না। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয় সরমা। ভুল্‌হা সর্দারকে দেখবার জন্যে, তার সমস্ত মন যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। নিজে মুখে তাকে জিজ্ঞেস করবে ওভারসিয়ারবাবুর কাছে যা শুনেছে, তা সত্যি কিনা।

একলাই সেদিন প্রাতভ্রর্মণে বেরিয়ে পড়লো। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সে অগ্রসর হয়। কোন্ জঙ্গলের ভেতর থেকে কোথা দিয়ে কখন সে বেরিয়ে পড়বে, তার ঠিকঠিকানা নেই!

আশ্চর্য! সেদিন আর তার দেখাই পেলে না সরমা। যাবার পথেই সাধারণতঃ দেখা হয়, আজ কি হলো! ভাবতে ভাবতে যখন ফিরছে, তখন চট্ করে সরমা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সোজা পথে না এসে রেল লাইনের দিকে বেঁকে গেল। বোম্বাই মেলটা প্রায় দিন এই রকম সময় হুইসিল বাজিয়ে, পাহাড় জঙ্গল সচকিত করে চলে যায়, হয়ত ভুল্‌হা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, কে জানে!

ঠিক যা ভেবেছিল সরমা, তাই হলো। দেখে, লাইনের ধারে একটা পাকুড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভুল্‌হা সর্দার চেয়ে আছে সিগন্যালটার দিকে। সিগন্যালটা ঘাড় হেঁট করে রয়েছে। গাড়ী আসার তাহলে সময় হয়েছে।

কি সর্দার, এখানে কি করছিস? প্রশ্ন করে সরমা।

সরমাকে সে দেখতে পায়নি আগে। সেদিকে পিছন ফিরে ছিল। তাই প্রথমটা যেন একটু থতমত খেয়ে যায়। তারপর ভাঙাভাঙা ধরা গলায় উত্তর দেয়, এই গাড়ী দেখছি। মেল্‌টা এখুনি আসবেক কিনা!

আচ্ছা, রোজ তুমি গাড়ী দেখতে ছুটে আসো কেন?

এমনি! বলে কথাটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে সর্দার।

কিন্তু সরমার অদম্য কৌতূহল তাতে চরিতার্থ হয় না। তাই একটু খোঁচা মেরে বলে, তুমি কি বাচ্চা ছেলে যে গাড়ী কখনো দেখোনি!

খপ্‌ করে সিগন্যালের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে সর্দার সুরমার দিকে তাকালো। সেদৃষ্টি শুধু অর্থপূর্ণ নয়, সফল আশার স্বপ্নে যেন বিভোর!

সরমার মুখের ওপর নীরব দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল সর্দার। বুঝি কি বলবে, ঠিক করতে পারছিল না।

সরমা তাকে অব্যাহতি দেবার জন্যে বলে উঠলো, আমি জানি, তোর ছেলেকে দেখবি বলে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস। তোর ছেলে ইঞ্জিন ড্রাইভারের চাকরী করে।

তুই কি করে জানছিস্ দিদিমণি?

সরমা মুখে হাসি টিপে বলে, জেনেছি। আচ্ছা এই গাড়ীতেই যে সে আসবে তুই সেটা জানলি কেমন করে?

হাঁ। সেটা ত তুই ঠিক বুলেছিস দিদিমণি! সব গাড়ীগুলোই তাই দেখি এমন ভাবে। একটা গাড়ীতে ত যাবেক্!

এবার সরমা কণ্ঠের বিস্ময় চাপতে পারে না, সব গাড়ীগুলো তুই দেখতে আসিস রোজ—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা,—বারোমাস!

ঈষৎ সলজ্জ ভঙ্গীতে জবাব দেয় দুলহা, হাঁ, কোন্ গাড়ীতে আসবেক্—ওর ত ডিউটির ঠিক নাই কিছু, দিদিমণি!

চুপ করে কি যেন চিন্তা করে সরমা। তারপর বলে, হাঁরে দুল্‌হা, তুই ত তাকে দেখার জন্যে পাগল, কিন্তু সে ত শুনেছি তোকে বাপ বলে স্বীকার করে না।

কে যেন তার ক্ষতস্থানে নুন ঘষে দিলে। চীৎকার করে উঠলো দুল্‌হা, কোন হারামীর ব্যাটা বুলেছে তোকে একথা বল তো দিদিমণি!

কেউ বলেনি। আমি তোকে এমনি জিজ্ঞেস করছি।

হাঁ, আমি জানছি কে বুলেছে তোকে। ওই হারামী ওভারসিয়ারটা!

তা তুই ওর ওপর এত রাগ করছিস কেন? আমরা ত বিদেশী মানুষ, নইলে আর জানবো কার কাছে!

তা বলে ঝুট্ বলবে কেন?

ও কথাটা তা হলে ঝুট্! তোর ছেলে তোকে বাপ বলে জানে!

হাঁ, জানবেক না কেনে!

এবার গলার স্বরে সহানুভূতি ঝরিয়ে সরমা বলে, হাঁরে, তা তোকে যখন পুলিসে ধরে নিয়ে গেল, তা তুই কিছু আপত্তি করলি না কেন?

ওই হারামীর বাচ্ছা ওভারসিয়ার ত ঝুট্ বললে পুলিসের কাছে দিদিমণি! আমি একটা জংলি আদ্‌মী, আমার কথা ত পুলিস মানলেক্ নাই।

কি বলেছিল ওভারসিয়ার রে?

ও ব্যাটা চোর, বদমাশ আছে দিদিমণি। সাহেবের কাছ থেকে অনেক টাকা ঘুষ খেয়ে ও বললে, আমাকে দেখেছে মেমসাহেবকে গুলি মারতে। আরো ক'জন কুলিকেও টাকা দিয়ে ও শালা হাত করলে। আমাকে জেহল ভেজলে।

সরমা এবার অন্যকথায় চলে যায়, আচ্ছা, মেমসাহেব তোকে কি সত্যি সত্যি ভালবাসতো?

উকথা আমি বলতে পারবে নাই দিদিমণি! বলে মুখটা ফিরিয়ে নিলে সে।

সরমা মুচকি হেসে বলে, তা ও যে তোর ছেলে, কি করে জানলি!

এমন সময় কু—কু—কু—কু শব্দে হুড়মুড় করে মেলটা ছুটে আসে। সরমা দেখে দু'টো বড় বড় আতা একটা শালপাতায় জড়িয়ে নিয়ে দুল্‌হা একেবারে লাইনটার কাছে ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। ট্রেনটার গতি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসতেই একজন ছোকরা ড্রাইভার নীচু হয়ে দুল্‌হার হাত থেকে সেই আত দুটো খপ্ করে তুলে নিয়ে খুশির ভঙ্গীতে হাত নাড়তেই গাড়ীটা আবার কু—কু—কু—উ করে হুইশিল বাজিয়ে স্পীড বাড়িয়ে দিলে।

দুল্‌হা বললে, দেখলি ত দিদিমণি, আমার ছেলেটাকে!

সরমা একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, দেখলুম, তা ও তোর কাছে থাকে না কেন?

ছোট ছোট কুঁচ-চক্ষু দুটো যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে দুল্‌হা বলে ওঠে, ও তো কোয়ার্টারে থাকে দিদিমণি, সাঁতরাগাছিতে। বিজলী বাত্তি, কলের পানি, দুতালা পাকা ইমারত।

তুই গিয়েছিলি নাকি সেখানে ?

হাঁ, জরুর। সগর্বে উত্তর দেয় সে। একবার গিয়েছিলি দিদিমণি!

এবার ফিক্ করে হেসে সরমা বলে, তা তোকে বুঝি তাড়িয়ে দিয়েছে. থাকতে দেয়নি ?

না না, এ তুমি কি বুলছো দিদিমণি! ও ছেলেটা আমার খুব ভাল। আমায় ত থাকতে বুলেছিল। কিন্তুক আমি রইলুম না। আমি একটা জংলি সাঁওতাল, আমার ছেলে কত বড় চাকরী করছে। আমার জন্যে ওর শরম লাগবে, সে কাজ আমি করতে পারব ? তাছাড়া আমার এই সব ঘরবাড়ী কে দেখবে !

সরমা বলে, হাঁরে, তোর ছেলেকে যে মানুষ করেছিল, মেমসাহেবের সেই আয়াটা তোকে কিছু বলেনি ?

কথা বলতে বলতে ওরা পথ চলছিল। হঠাৎ সরমার মুখের এইকথা শুনে থমকে দাঁড়ায় সর্দার। বলে, সে ত মরে গেল দিদিমণি!

ওঃ তাই। বলে সরমা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

তুল্‌হা বলে, ছেলেটার এবার বিয়া সাদী হবেক, তখন ইখানে আসবেক বউ লিয়ে। ছুটি এক মাহিনার লিবে ও বুলেছে!

সরমা বলে, তা তোদের এই সাঁওতাল মেয়ের সঙ্গে ওর সাদী দিতে হবে ত ?

ও আমি জানি না। আমার জাতে কেউ ওকে বিয়ে করবেক না। ও আপনি উখানে একটা কোন মেয়ে ঠিক করে লিয়েছে, সে আমি জানি না।

॥ ১৫ ॥

এর পর তিনটে দিনও কাটলো না। ভোরে সরমা আর তার বাবা বেড়িয়ে ফিরছে, এমন সময় দেখে কতকগুলো সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ ছুটেছে রেল লাইনের দিকে।

এই, কি হয়েছে রে! সরমার বাবা একজনকে প্রশ্ন করেন।

তুল্‌হা সর্দার রেলে কাটা পড়েছে।

এ্যাঁ! শিউরে উঠলো সরমা। বাবা চলো ত, শিগগির দেখে আসি কি ব্যাপার ?

হাঁ, ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে সেদিন সরমা দেখেছিল তুল্‌হাকে দাঁড়িয়ে

থাকতে, সেইখানে রেলের লাইনের পাথরের ওপর পড়ে রয়েছে দুল্‌হার মৃতদেহটা।

ট্রেনে কাটা পড়েনি। খোলা দরজায় ধাক্কা লেগে মাথা ফেটে গেছে, একেবারে নাকি লাইনের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। লোকেরা বলাবলি করছিল।

সেদিনের দৃশ্যটা সরমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। হয়তো আজ তার ছেলের ডিউটি ছিল না, ইঞ্জিনের গতি তাই মন্দীভূত হয়নি। খোলা দরজার ধাক্কা লেগেছে সেইজন্য! হায় হায় করে ওঠে সরমার মন।

থানা থেকে পুলিস ইনস্‌পেক্টার ও স্টেশন মাষ্টার এসে গেলেন।

হট্ যাও সব। বলে ভীড় সরিয়ে দিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব মৃতদেহটার কাছে এগিয়ে যেতে দেখেন—দুল্‌হা সর্দারের লেংটির ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা ছোট্ট 'সোনার লকেট'। কোমরের সঙ্গে যে সুতোয় বাঁধা ছিল, সেটা ছিঁড়ে গেছে।

ইনস্‌পেক্টার সাহেব সেটা হাতে করে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ-ছিলেন।

সরমা পিছন থেকে উঁকি মেরে দেখে, একটা মেমসাহেবের মুখ বাঁধানো সেই ছোট্ট লকেটটার একদিকে।

এটা সব সময় সে তার কৌপীনের মধ্যে লুকিয়ে রাখতো। কেউ এর খবর জানতো না। স্টেশনমাষ্টার ও ইনস্‌পেক্টারবাবু দু'জনেই ছোকরা এবং ওখানে নতুন এসেছেন। তাই ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে পরস্পরের মুখের দিকে শুধু একবার নিঃশব্দে তাকালেন।

সরমা অনুমান করতে পারলে, এ সেই মেমসাহেবের স্মৃতিচিহ্ন। হয়ত গোপনে কোন একদিন সর্দারকে সে দিয়েছিল। কে জানে!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সাঁওতালরা যখন দুল্‌হার দেহটাকে মাটিতে পুঁতে বাসায় ফিরে এলো, সরমা তখন চুপ করে বসেছিল নদীর ওপারে পাহাড়ের ঢেউ খেলানো শৃঙ্গগুলোর ওপর ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চেয়ে। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটার মাথার ওপর, অনেক উঁচুতে, জ্বলজ্বল করে যে নিঃসঙ্গ তারাটা জ্বলছিল সেখানে, সে ভাবছিল বুঝি তার কথা! প্রকৃতির বুকে, এই অরণ্য বনভূমিতে নিঃশব্দে আজ যে প্রেম ও বাৎসল্যের বিয়োগান্ত

অভিনয় হয়ে গেল, সভ্যজগতের কেউ যার একটি কথাও জানলো না, এবং জানতে পারবে না কোনদিন, তখনো কিন্তু ওই তারাটা এমনি ভাবে ঠিক ওইখানেই থাকবে। ওই মৌন অনন্তের বুকে এই অসভ্য জংলীর প্রেম ও বাৎসল্যের স্মৃতি কি এক টুকরো আলোর মত এমনি ভাবে জ্বলবে না চিরদিন ?

সরমার দু'চোখ তার অজ্ঞাতে কেন যে জলে ভিজে ওঠে !

॥ ১৬ ॥

ফুলডিহীর পাহাড়ে জঙ্গলে বনে প্রান্তরে ঘুরে তিনমাসে যেটুকু স্বাস্থ্য সঞ্চয় করেছিল সরমা, বলাবাহুল্য কলকাতার বাসায়, সেই কেরানী বাগানের অন্ধকার গলির একতলা ঘরে তিনটে মাসও তা টি‍ঁকল না। আবার 'যথা পূর্বং তথা পরম্'! শরীর ভাঙতে শুরু হলো।

বিপিনবাবুর অবস্থা ভাল নয়। তবু জ্যেষ্ঠা কন্যার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় চেঞ্জ-এর কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আবারও ফুলডিহীতে যান। কিন্তু সরমার মা বেঁকে দাঁড়ালেন। যেখানে থাবার জিনিসের এত অভাব সেখানে শুধু হাওয়া খেয়ে ত মানুষের শরীর ভাল হতে পারে না। ক্ষিদেটা যেমন হবে, সেই পরিমাণ ভাল খাদ্যও চাই !

খাদ্যের চেয়েও সরমার উৎসাহটা বেশী নতুন দেশ, নতুন জায়গা দেখার। সে বাবাকে বলে, এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে খাদ্য খাবার মেলে, অথচ জলহাওয়া খুব ভাল ?

বিপিনবাবু বলেন, আছে নিশ্চয়ই মা। নইলে শহরের সব লোকরা ওই ফুলডিহীতে গিয়েই ভীড় করতো ! আমরা তার সন্ধান হয়ত জানি না। দেখি ডাক্তারবাবু কি পরামর্শ দেন।

সরমার মা বলেন, তার চেয়ে চলো না যাই কুসুমতলা ! আমার যে বছর বিয়ে হয়, বাবার সঙ্গে গিয়ে তিনমাস ছিলুম। কি সুন্দর যে শরীর হয়েছিল সকলের, বলবার নয়। তেমনি জিনিসপত্তর সস্তা। বড় বড় বাগান-বাড়ী সব পড়ে আছে। হাঁ হাঁ করছে। কে যায় সেখানে ! এককালে ওই জায়গার নাকি খুব নামডাক ছিল, কলকাতার বড় বড় লোকেরা সব হাওয়া খেতে যেতো। এখন তারা শহর বাজার ছাড়া অন্য কোথাও যেতে চায় না। তাই সেসব ঘরবাড়ী এখন ভেঙে পড়ছে লোকের অভাবে ! ঘর ভাড়াও তেমনি

সস্তা। জানি না এখন সেখানের হালচাল কেমন!

সরমা বলে, বাবা, তুমি একটু খোঁজ নাও না এ জায়গাটার। আপিসে কাউকে জিজ্ঞেস করো না?

দেখি। বলে আপিসে বেরিয়ে যান বিপিনবাবু। সেই দিনই তাঁর সেক্‌শানের মতিবাবুকে ধরে তাঁর এক আত্মীয়দের বাড়ী ঠিক করে ফেললেন। মতিবাবু বলেন, সত্যি, কাছাকাছির মধ্যে এমন স্বাস্থ্যকর জায়গা দেখা যায় না। আর তেমনি সস্তাগণ্ডা সব জিনিস। তবে কি জানেন, বড় নির্জন। লোকজন বড় একটা আজকাল যায় না ওখানে। বড় বড় বাগানবাড়ী সব ভেঙে পড়েছে দেখাশুনার অভাবে! আমাদের কেমন যেন ভয় ভয় করে; চিরদিন শহরের হট্টগোলে মানুষ কিনা!

বিপিনবাবু প্রশ্ন করেন, থাকা যাবে না মেয়েছেলে নিয়ে সেখানে?

কেন যাবে না। তাই বলে কি সত্যি সত্যি সেখানে লোকজন বাস করে না, না যাচ্ছে না? স্থানীয় লোকের বাস—আদিবাসী—অঢেল! চারিদিকেই তাদের ঘরবাড়ী দেখতে পাবেন। তাছাড়া চেঞ্জাররাও যাচ্ছে বই কি! এই ত গতবছর আমার শালীরা গিয়ে ছিল দু'মাস।

বেশ, তাহলে আর কথা নেই। আপনি ভাই সেই বাড়ীটা আমায় ঠিক করে দিন, আমি যাবার জন্যে প্রস্তুত হই!

নতুন জায়গা দেখবার জন্যে অধীর আগ্রহ নিয়ে জানলার পাশে ঠায় বসে থাকে সরমা। দৃষ্টি তার ছুটে চলে ট্রেনের গতির সঙ্গে।

নামবার সময় যত এগিয়ে আসে, তত যেন চারিপাশের বনজঙ্গল গভীর ও দুর্ভেদ্য হতে থাকে। নতুন নতুন অসংখ্য পাহাড় ছোট, বড়, মাঝারি চলে যায় তার চোখের পর্দার ওপর দিয়ে, আবার আসে। নাম-না-জানা কত বিচিত্র ধরনের বৃক্ষলতা, বনজঙ্গল, কাননপ্রান্তর পেরিয়ে আসে তার ঠিকঠিকানা নেই! পাথরের রং কোনটা লাল, কোনটা ধূসর, কোনটা বা কালো। তাদের চেহারার একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই! কোন পাহাড় একেবারে ন্যাড়া, তৃণগুল্মহীন রুক্ষ অনুর্বর। আবার কোনটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন সবুজ ওড়না ঢাকা। কারুর দেহ কিছুটা নগ্ন, কিছুটায় আছে বৃক্ষলতার আবরণ। কারুর বা শুধু মাথাটা কামানো। কারুর বা খানিকটা টাকের সঙ্গে খানিকটা যেন সবুজের আভাস! আবার কারুর শুধু খালি দেহ, মাথায় সবুজ পাগড়ী!

এক এক সময় মনে হয় সরমার যেন একটা গাড়ীর কামরায় আবার বিভিন্ন যাত্রীর ভীড় লেগেছে। কোথাও মাটি একেবারে চোখে পড়ে না। জমিটা যেন লুকোচুরি খেলছে পাহাড়ের সঙ্গে। 'টু' দিয়েই লুকিয়ে পড়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে, আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একটু পরে পেলেও ছুটে কোথায় কোন্ জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়। দু'পাশে শুধু এমনি খেয়ালী প্রকৃতির লীলা চলে।

বিস্মিত, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সরমা।

এবারও কিন্তু স্টেশনে নেমে হতাশ হয় সরমা। এ কোন্ বনালয়ে তারা এলো। চারিদিকে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। বাড়ী ঘরদোর বিশেষ কিছুই নজরে পড়ে না! সবচেয়ে নিরাশ হলো প্ল্যাটফর্মের দৈন্য দেখে। প্ল্যাটফর্ম শুধু নামে। মাটির ওপর ইঞ্জিনের পোড়াকয়লার ছাই ফেলা খানিকটা জায়গা, তার ওপর পাথরের একটা ফলকে 'কুসুমতলা' লেখা না থাকলে বোঝা শক্ত সেটা কি। ফুলডিহী রেলস্টেশনের চেয়েও অধম এটা। পাদানীতে পা রেখে প্ল্যাটফর্মের নাগাল পাওয়া যায় না এত নীচু। লাফিয়ে নামতে হয়। লাল জামা গায়ে বুকে 'বেট' আঁটা একটা কুলিও এলো না ছুটে, তাদের মালপত্তর নামাতে। বাপে ও মেয়েতে মিলে নিজেরাই সেগুলো টেনে টেনে নামালে। কতকগুলো পুঁটলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সরমা নীচে। কোথাও কুলির কোন চিহ্ন নেই। প্ল্যাটফর্মে প্যাসেঞ্জার নামলো বোধহয় সাকুল্যে গুটি দশ-বারো। অধিকাংশই দরিদ্র, আদিবাসী। কারুর হাতে একটা লাঠি। কারুর বা ছোট্ট পুঁটলি—কারুর বা কিছু নেই।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে বেরুবার যে ফটকটা সেখানে একজন স্টেশনমাষ্টার দাঁড়িয়ে থাকলেও কেউ তাঁর হাতে টিকিট দেবার জন্যে এগিয়ে গেল না। এ-পাশ, ও-পাশ, সে-পাশ দিয়ে, কেউ বা লাইন অতিক্রম করে, চলে গেল যে যার গন্তব্য স্থানে। তারা সব বিনা টিকিটের যাত্রী বলেই সরমার সন্দেহ হয়। অথচ স্টেশনমাষ্টারের তরফ থেকে তাদের কাছ থেকে টিকিট চাইবারও কোন উদ্যম দেখা গেল না।

সরমা তার বাবার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে টিকিটগুলো মাষ্টারবাবুর হাতে দিলে। তারপর প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, এখানে কি কোন কুলি পাওয়া যায় না?

যায়। তবে এদিককার যে সব যাত্রী তারা নিজেদের মাল নিজেরা বহন করে। বাইরের লোক এলেই তবে কুলির দরকার হয়। তা, আপনারা কতদূর যাবেন?

বিপিনবাবু বলেন, আচ্ছা, সুকুমার বাগচীর বাগানবাড়ীটা কত দূর বলতে পারেন ?

স্টেশনমাষ্টার সরমার বাবার মুখের দিকে মুহূর্ত কয়েক নীরবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মুচকী হেসে বললেন, এ ত আপনাদের কলকাতার শহর নয়, এ জংলী জায়গা দেখছেন ত ? এখানে চারিদিকে কত অসংখ্য বাগান-বাড়ী পড়ে আছে, কে কার খোঁজ রাখে। বলেই থেমে, অদূরে শালবনের ভেতর দিয়ে যে সরুপথটা চলে গেছে সেদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেন, তার চেয়ে বরং ওইখানে যে মুদীর দোকানটা আছে সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, সে বলতে পারবে। এখানকার সে পুরনো লোক। আমি মাত্র এক বছর হলো বদ্‌লী হয়েছি এখানে।

সরমার বাবা যখন কি করবেন ইতস্তত করছেন, তখন ছুটতে ছুটতে দু' তিনটে লোক লাইন ডিঙিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওরা জাত-কুলি নয়. তা ওদের চেহারাতেই মালুম। মাথায় গামছার বিঁড়ে পাকিয়ে তারা বললে, কোন্ বাংলায় যাবেন বাবু ?

রোস রোস। বলে সরমার বাবা ভেতরের পকেট থেকে একটা খাম বার করে বলেন, কুসুম ভিলা। চেনো নাকি ?

সেটা কোথায় বাবু ?

সরমা বলে ওঠে, তোদের দেশে এলুম। তোরা চিনিস না এখানকার ঘর-বাড়ী ! আবার আমাদের জিজ্ঞেস করছিস কোন্ দিকে ?

ওই বাগানের যিনি মালিক তিনি কলকাতার খুব নাম-করা ধনীলোক, সুকুমার বাগচী, তাঁকে চিনিস না ?

কুলীরা এক সঙ্গে বলে ওঠে, ও সব বাবুর নাম বললে এখানে চলবে না বাবুজী। সে বাগানের মালী কে, তার নামটি বলুন আজ্ঞা !

ফিক্ করে হেসে ওঠে সরমা, বেশ জায়গা ত. যাঁর বাড়ী-ঘর দোর তাঁর নাম কেউ জানে না, মালীর নামে তবে বাবুর পরিচয় !

ইখানকার ত এই রকম নিয়ম হচ্ছেক দিদিমণি ! বাবুরা ত ইদিকে এসে না। ওই মালীটাকেই সবাই জানে। কোন্ বাংলায় কোন্ মালী থাকে তাকে সকলটি লোক চিনছে।

সরমার বাবা এবার খামটার ভিতর থেকে চিঠিটা বার করে বললেন, ও, তার নাম বহুয়া মালী।

ঠিক আছে বাবুজী! আর বলতে হবে না।

স্টেশনমাষ্টার তখনো দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, কোন্ বাংলারে?

উই যে লাহাবাবুদের বাংলাটার সামনে, লোহার ফটক ওলা—ওইটে হচ্ছেক আজ্ঞা!

যান তা হলে, ওদের সঙ্গে। বলে স্টেশনমাষ্টার লাইন ডিঙিয়ে ওপারে তাঁর কামরার ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন।

বাক্স-প্যাটরাগুলো মাথার ওপরে গোছ করে নিয়ে এগিয়ে চললো কুলিরা, আর তাদের পিছনে যেতে লাগল সরমারা ছোটখাটো পুঁটলি-পোঁটলা হাতে নিয়ে।

মাটির রাস্তা কোথাও ভাঙা-চোরা, এবড়ো খেবড়ো, কোথাও বা আঁকাবাঁকা চলে গেছে এদিক ওদিক ইচ্ছামত। রাস্তা নয়, পায়ে চলা পথ। মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে আপনা-আপনি তৈরী হয়েছে! তাই চলতে চলতে ধাঁধা লাগে কোন্‌দিকে যেতে হবে।

সংক্ষিপ্ত পথে কখনো মাঠের মধ্যে দিয়ে, কখনো বা ধান ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে মুটেদের অনুসরণ করতে করতে অবশেষে তারা সেই কুসুমভিলায় এসে পৌছল। পথে আসতে আসতে অনেকগুলো ছোট বড বাড়ী পেরিয়ে এলো সরমারা। এক কালে যে এ জায়গায় খুব জাঁকজমক ছিল তার চিহ্ন এখনো অনেক স্থানে বর্তমান। লোকজনও কিছু কিছু পথে ঘাটে দেখতে পেলে! একেবারে নির্জন পরিত্যক্ত স্থান নয়। স্টেশনে নেমে প্রথমে একটু যে আতঙ্ক হয়েছিল সরমার, সেটা নিমেষে দূর হয়ে যায়।

॥ ১৭ ॥

ফুলডিহীর সঙ্গে এ জায়গার তফাৎ অনেক, যদিচ একই সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত, তবু দু'টোর মধ্যে কোথায় যেন বিপুল ব্যবধান! ভূমিপ্রকৃতি থেকে মানুষের প্রকৃতি, কোনটার সঙ্গে মেলে না। ফুলডিহীটা ছিল সাঁওতাল পরগনার দক্ষিণ পূর্ব কোণে, কুসুমতলা একেবারে তার বিপরীত—, উত্তর পশ্চিম সীমান্তে তাই বুঝি দু'জায়গায় এত পার্থক্য।

বাস্তবিক ফুলডিহীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। একসঙ্গে এমন বিভিন্ন রূপের সমাবেশ কদাচিৎ চোখে পড়ে। যেদিকে তাকাও মনে হয় যেন

নতুন দৃশ্য, নতুন পরিবেশ। কিন্তু কুসুমতলা সেদিক থেকে কেবল দরিদ্র নয়, একটা বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমি যেন চোখকে ক্লান্ত করে। উঁচু পাহাড়ের পাচীল তুলে কে যেন জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে। বন, জঙ্গল, ভেদ করে দৃষ্টি দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে না, ফিরে আসে যেন ব্যাহত হয়ে।

ফুলডিহীর সাঁওতালরা ছিল দরিদ্র, কিন্তু তাদের মধ্যে তদ্‌জনিত হীনতার এতটুকু প্রকাশ কখনো দেখেনি সরমা। বরং জীবন সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত নির্লোভ নিস্পৃহতা, যাকে জীবনবৈরাগ্য বললেও বোধ করি ভুল হয় না, তাদের চরিত্রকে যেন মহনীয় করে তুলেছিল সরমার চোখে।

কুসুমতলার আদিবাসীদের অবশ্য ফুলডিহীর তুলনায় নিঃস্ব বলা যেতে পারে। ওখানকার মত এরা বিদেশীদের সঙ্গে অসহযোগিতা করে না, বরং ঠিক তার উল্টো। কেউ চেঞ্জে এ এসেছে খবর পেলে একে একে, দুয়ে দুয়ে এসে হাজির হয়। কেউ ভিক্ষা চায় না, বা হাত পেতে বলে না একটা পয়সা দাও। যার ঘরে যা জিনিস আছে, তাই নিয়ে আসে তারা বিক্রী করতে। হোক তা সামান্য। কেউ হয়ত গাছের একটা পাকা পেঁপে নিয়ে যেমন আসে, তেমনি কেউ আসে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে পাহাড়ের দিক থেকে, কেউ বা কালো হাঁড়িতে দুধ ভর্তি করে নিয়ে আসে! তেমনি কেউ আসে মুরগী বেচতে, কেউ বা তরিতরকারী, লাউটা, বেগুনটা, শাকসব্জী যার যেমন সাধ্য নিয়ে আসে বেচতে, এক-একদিন এত সস্তায় জিনিস মেলে যে সরমা নিজেই অবাক হয়ে যায়। বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ছোট্ট একটা মুরগী হয়ত আট আনা কি দশ আনাতেই দিয়ে যায়। কলকাতায় যার দাম দেড়টাকা দুটাকার কম নয় কিছুতেই।

দিদিমণি মুরগী লিবে? বলে বাগানের ফটকে এসে দাঁড়ায় কোন একটা সাঁওতাল। তার পায়ের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে সরমা যে অনেক দূর কোন্ পাহাড়ের প্রান্তে হয়ত এক পাতার ঘরে সে বাস করে, কোন্ ভোরে উঠে হাঁটতে শুরু করেছে। কাঁধের ওপর লাঠির প্রান্তে দড়ি দিয়ে বাঁধা যে মুরগীগুলো ঝোলে, তারা নীরবে একবার সরমার মুখের দিকে তাকায়। কোন্‌টা লিবি বল? বলতে বলতে কাঁধ থেকে লাঠিটা নামায় তার সামনে।

সরমা সুন্দর পালক ঢাকা সতেজ পরিচ্ছন্ন একটা মুরগীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওটার দাম কত?

একটু থেমে সাঁওতালটা বলে, কত দিবি তুই বোল না?

তোর জিনিস তুই বল আগে কত, আমার পোষায় নেবো নয়ত নেবো না।

'নেবো না' বলে পাছে ফিরিয়ে দেয়, পাছে সে দাম বেশী চেয়ে বসলে 'না' বলে ফেরৎ দেয় এই আশঙ্কায় বুঝি তার বুকের ভেতরটা দুর দুর করে। মুখ ফুটে দাম বলতে গিয়ে ও তাই থেমে যায়। আবার সে অনুরোধ করে, তুই বোল না কত দিবি ?

না—না—সে আমি বলতে পারবো না, তোর জিনিসের কত দাম আমি কি বুঝি! এই বলে সরমা কথাটাকে যেন এড়িয়ে যায়।

আসলে এই ক'দিনেই সে জেনে ফেলেছে এরা কত নিঃস্ব কত অসহায়! দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে দিনের পর দিন অভুক্ত থাকতে থাকতে ওরা যেন ভুলে গেছে দরাদরি করা দাম নিয়ে টানাটানি করা। কোন রকমে যেন তার জিনিসটা গছাতে পারলে বাঁচে!

এক একদিন তাই সরমার বিবেক দংশন করে। খুব সস্তায় জিনিসটা কিনে ঘরে আনবার পর হঠাৎ মনের মধ্যে এই প্রশ্নটাই উঁকি মারে, তাহলে কি আমি ওর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ওকে ঠকালুম!

সেদিন দুটো মুরগীর ডিম নিয়ে একটা মেয়ে এলো, ডিম লিবি দিদি ?

কত দাম ?

দু' আনা।

ওই দুটোর দাম কলকাতায় চার আনা সাড়ে চার আনার কম নয়, সরমা জানে, তবু বলে বড্ড বেশী দাম চাইছিস তুই। ছ' পয়সায় দিবি ত দিয়ে যা নইলে দরকার নেই। বলে যেমন পিছন ফিরতে যাবে, মেয়েটি বলে, আর একটা পয়সা বেশী দে দিদিমণি!

না—না—এর বেশী হবে না। দরকার নেই।

অগত্যা মেয়েটি ওই দামেই দিয়ে চলে যায়।

কিন্তু ডিমের পোচ মুখে তুলতে গিয়ে হঠাৎ সরমার হাতটা যেন মুখের কাছে থেমে যায়। পরক্ষণেই আবার মনকে এই বলে বোঝায়, ওদের ঘরে ঘরে মুরগী আছে, তারা ডিম পাড়ে, তাই ওরা যা পায়, তাই লাভ। মুরগীগুলো মাঠে ঘাটে চরে খায়, তাদের খাওয়ানোর পিছনেও তাদের কিছু ব্যয় করতে হয় না। তাছাড়া জিনিসের মূল্য ত লোকের চাহিদার ওপর নির্ভর করে। এখানে লোকজন খুব কম। সে যদি না কেনে তাহলে হয়ত বিক্রীই করতে পারবে না, ঘরে গিয়ে নিজেরাই খাবে। তবু ওই ছ'টি পয়সা দিয়েই যা হয়

কিছু ছোলা, মটর বা মকাইয়ের দানা দোকান থেকে কিনে নিয়ে যাবে।

ওদের সঙ্গে কথা বলে, ওদের বাড়ীতে গিয়ে নিজে চোখে দেখেছে সরমা কি ভীষণ দারিদ্র্য ওদের। ভাত খাওয়াটা ওদের কাছে একটা বিলাসিতার বস্তু। কারুর ভাগ্যে হয়ত মাসে একটা কি দুটো দিন ভাত জোটে! আমাদের কাছে পোলাও-মাংসর যেমন কদর, ওদের কাছে তেমনি শুধু দু'টো ভাত?

একদিন ওদের বাড়ীতে কাজ করতে আসে যে ঝিটা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল সরমা, কি রান্না করবি এখন বাড়ী গিয়ে, ভাত?

কপালে হাত দেখিয়ে সে বলেছিল, হা বরাত, ভাত খায় ত যারা বড় লোক। ওরা গরীব ওদের কি সে সৌভাগ্য হবে কোনদিন।

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সরমা, তবে কি তোরা রুটি খাস?

গেঁহুভি বহুত মাঙ্গা দিদি!

তাহলে তোরা কি খাস রোজ?

ঘাটাই!

সেটা কি বস্তু? প্রশ্ন করে সরমা।

ঝি তখন বুঝিয়ে দেয়, মকাইয়ের দানা সিদ্ধ করে ফেনের মত এক রকম পদার্থ তৈরী করে ওরা। তাই খায়। এটাই ওদের পক্ষে খুব মূল্যবান খাদ্য, তাও সব দিন সকলের ভাগ্যে জোটে না। বেশীর ভাগ লোক কন্দ জাতীয় এক প্রকার মূল সিদ্ধ করে খায়। কেউ বা মোয়া আলু, কচু, বন্য ফলমূল খেয়ে পেট ভরায়।

এখানে আর একটা জিনিস দেখে বিস্মিত হয় সরমা। ওরা ভিক্ষে করে না বটে তবে খেতে চায়। কিন্তু যার তার কাছে খেতে চায় না। যার সঙ্গে ওদের ব্যবসার লেনদেন হয় কেবলমাত্র তার কাছেই খাদ্যের দাবী জানায়। আর তার কাছে দাবী জানাতে ওরা লজ্জা বা অপমান বোধ করে না। কেনা বেচার সম্পর্কটা আমাদের দেশে যেমন পয়সা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চুকে যায়, ওখানে একেবারে তার উল্টো।

চার পয়সার একটা লাউ, কি দু' আনার কাঠ কিনে যেই পয়সাটা হাতে দেয় সরমা, অমনি সে বলে ওঠে, এ দিদিমণি, কুছ জলখাবার দিজিয়ে, বহুত ভুখা আছি।

এর ব্যতিক্রম কোথাও দেখেনি! যে দুধওয়ালি দু'ক্রোশ পথ ভেঙে কেঁদে

মাথায় করে দুধ বেচতে আসে। সেও যেমন হাতে পয়সা পায় অমনি কিছু জলখাবার খেতে চায়, তেমনি মুরগীওলা, মাছওলা, ধোপানি থেকে কেউই বাদ যায় না! সেখানে কাছাকাছি বা দূরত্বের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওখানকার নাকি ওই রীতি! বাড়ী বয়ে যারাই জিনিসপত্র বিক্রী করতে আসে তারাই নাকি পয়সা নিয়ে তারপর কিছু বুঝি খেতে চায়। অন্য দু' পাঁচজন চেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করে দেখেছে সরমা এবং তাদের পরামর্শ মত, বাজার থেকে কিছু মোটা চিঁড়ে ও শুকনো গুড় কিনে এনে রেখেছেন! ঘরে সেদিন যা থাকে বাসি রুটি পরটা, কিংবা ভাত খেতে দেয়। নইলে ওই মোটা চিঁড়ের সঙ্গে একডেলা শুকনো গুড় এনে তাদের হাতে দেয় সরমা। আহা, বেচারীরা খেতে পায় না!

সরমার মা বাইরে বেরিয়ে এসে বলেন, হ্যাঁরে, তা তোরা এইসব বিক্রী করে যে পয়সা পাস, তা দিয়ে কি করিস?

কি করবো মা, পেট ভরে না। ঘরে বালবাচ্চা সব আছে ত! বলে চোখেমুখে একটা করুণ ভঙ্গী করে।

সরমার বাবা রাগ করে মেয়েকে বলেন, সস্তায় যে জিনিসটা কিনলি তার সঙ্গে এই জলখাবারের দামটাও যোগ করে দেখ, কত পড়লো!

সরমা বলে, বাবা তুমি যদি এদের বাড়ীর ভেতরে যাও ত দেখলে কষ্ট হবে বেচারীরা কি খেয়ে থাকে। এরকম দারিদ্র্য কল্পনা করা যায় না। ফুলডিহীর সাঁওতালরা এদের তুলনায় অনেক বড়লোক।

বিপিনবাবু বলেন, এদের যে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য বলতে কোন কিছু নেই, তাছাড়া জমিটার বেশীর ভাগ পাথুরে। চাষ-আবাদের দিক থেকেও অসুবিধা। ফুলডিহীতে যে জঙ্গলের কাঠ, নদীর বালি ও পাহাড় ভেঙে পাথরের টুকরো চালানীর কারবার ছিল!

সবচেয়ে বিস্ময় লাগে সরমার ওদের সরলতা ও সততা দেখে। কেউ মিথ্যা কথা বলে না বা চুরি করে না। এত দারিদ্র্য যাদের, কি করে তাদের পক্ষে সেটা সম্ভব, ভেবে কূলকিনারা পায় না। তবে কি এতকাল ধরে যা শিখেছে সব ভুল! 'দারিদ্র্যদোষ হরে গুণরাশি'—কথাটা যাঁরা প্রচার করেছেন, তাঁরা কি দেখেননি এঁদের?

এখানে সব চেয়ে অবাক করে সরমাকে ওই মুরগী কাটা বুড়োটা! সেই একমাত্র ব্যতিক্রম, সে খেতে চায় না, কাজ করে চায় শুধু পয়সা! যেসব সাঁওতালরা মুরগী বিক্রি করতে আসে তারা কাটতে রাজী হয় না। মুরগী কাটার আলাদা লোক আছে! বুড়ো থুরথুরে সেই লোকটা সরমার মনকে অদ্ভুত ভাবে নাড়া দেয়! বেলা ন'টা নাগাত সে আসে!

মানুষ দেখা যায় না। শুধু মনে হয় যেন একটা লাঠি আপনা আপনি হেঁটে আসছে কোন্ যাদুমন্ত্রে, ওই দূর পাহাড়ের কোল থেকে নেমে আসা ধানক্ষেতের মাথার ওপর বিছানো ঘন সবুজ কার্পেটের ওপর দিয়ে।

যাদের চোখের জোর আছে, সেদিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে, ঝাপড় মিঞা আসছে! ও তার লাঠি। বার্ধক্য যে তার পাকা শালের মত দেহটাকে ভাঙতে গিয়ে পারেনি, ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে শুধু কোমরটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে, ও যেন সেই বিজয়বার্তা ঘোষণা করে। লোকে বলে ও লাঠি নয়, ঝাপড় মিঞার বিজয়দণ্ড।

ডান হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে সেই লম্বা লাঠির মাঝখানটা চেপে ধরে কোমর থেকে সামনে নুয়ে-পড়া দেহটার ভার তার ওপর চাপিয়ে নীচু হয়ে অনায়াসে ঘুরে বেড়ায় ঝাপড় মিঞা সর্বত্র! মাঠে, ঘাটে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে কোথায় নয়। ওর যে এই চার কুড়ি তিন বছর বয়েস, কেউ তা বিশ্বাস করতে না চাইলেও, স্থানীয় লোকেরা জানে।

ওই যে দূরে সবুজ সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের মত এক খণ্ড জমি উঁচু হয়ে আছে, কয়েকটা চালা ঘর, কিছু বনজঙ্গল ও তার ভেতর থেকে উঁকি মারছে একটা পুরনো মসজিদের মাথা, ওইখানে ঝাপড় মিঞার ঘর। সোজা রাস্তা ধরে এলে তিন চারটে মাঠ ঘুরে স্টেশনের গুমটি পেরিয়ে, 'লেভেল ক্রসিং' ছেড়ে অনেক হাঁটতে হয়। তাতে কেবল যে পরিশ্রম বাড়ে তাই নয়, সময়ও লাগে অতিরিক্ত। সেই জন্যে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে পথটা সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে ঝাপড় মিঞা।

বেলা ঠাওর করতে পারে না। চলতে চলতে আলের ওপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে মুখ তুলে তাকিয়ে আবার শুরু করে যাত্রা!

কখন কোন বাংলায় হাজিরা দিতে হবে, সব তার মুখস্থ! একদিনও তার ভুল হয় না।

পরণে ময়লা একটুকরো লেংটি, গায়ে তার চেয়েও মলিন, ছেঁড়া একটা গেঞ্জি, কোমরে একখানা ভোঁতা ছুরি, একটা ছোট চটের থলে ঝোলে কোমর থেকে সামনের দিকে। মাথার চুল, দাড়ি, গোঁফ, সব পাকা, সাদা ধবধব করছে কিন্তু দেখলে মনে হয় যেন সুবিন্যস্ত, পরিপাটি করে ছাঁটা।

ও যখন এসে দাঁড়ায় বাড়ীর দোরগোড়ায়, ওর আবির্ভাব সহসা স্মরণ করিয়ে দেয় সরমাকে শিশিরকুমারের আলমগীরের কথা। বিশেষ করে প্রথম দৃশ্যে যেমন 'মেক্-আপ্' নিয়ে তিনি বেরুতেন স্টেজ্-এ। কোমরটাকে দুমড়ে, সামনের দিকে দেহটা ঝুঁকিয়ে, পিছনে হাত দুটো মুড়ে বলতেন, 'মন্দ কি, কাশ্মিরী বাঈয়ের দম্ভ চূর্ণ করা যাবে।' ঠিক সেই রকম ওর দাড়ি গোঁফের ভঙ্গী, দাঁড়াবার কায়দাও হুবহু যেন মিলে যায়। তার ঘোলাটে চোখের মধ্যে থেকে এখনো তেমনি হিংস্র দৃষ্টি ঝিলিক মেরে ওঠে থেকে থেকে!

সম্রাট আলমগীরও বোধহয় বেঁচে ছিলেন পঁচাশী বছর, কিন্তু ঝাপড় মিঞার মত এতখানি কর্মক্ষম যে এই বয়সে ছিলেন না একথা সবাই মানে।

যে বাড়ীর দোরে সে এসে দাঁড়ায়, ওর গলা শুনে ভেতর থেকে মুরগীগুলো ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে…কোঁক্-কোঁ-কোঁর-কোঁ…

তারা যেন গন্ধ পায় বাতাসে যে এসেছে তাদের হত্যাকারী, সেই নির্মম নিষ্ঠুর জল্লাদ—ঝাপড় মিঞা!

একটা, দুটো, পাঁচটা—যার যেমন প্রয়োজন তখনি জবাই করে দিয়ে চলে যায়! এই জবাই করাই ঝাপড মিঞার পেশা! তার নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম!

প্রতিদিন সকাল হতে না হতেই সে তাই ছোটে বাড়ী বাড়ী হাজিরা দিতে! দেরী হলে পাছে তার মুখের গ্রাস আর কেউ কেড়ে নেয়, এই আশঙ্কায় মাঠঘাট বনজঙ্গলের সংক্ষিপ্ত পথে হাঁটে!

কোন বাংলায় ক'টার সময় হাজিরা চাই, তার মুখস্থ! তাই মাঝে মাঝে সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেলা ঠাওর করে আবার হাঁটতে থাকে!

মুরগী পিছু রেট্ চার পয়সা। ছোট বড়র কোন তফাৎ নেই, একদর! যার যটা মুরগী কাটে, তত আনা পয়সা গুনে নিয়ে আগে ট্যাঁকে গোঁজে, তারপর নাড়িভুঁড়ি, মুরগীর মুখটা, নখশুদ্ধ ঠ্যাংয়ের নীচেটা চটের থলিতে ভরে নিয়ে, পালকগুলোকে বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে, আবার আর এক বাড়ীর পথ ধরে।

সরমাদের বাংলাটা অনেক দূরে। চড়াই উৎরাই অনেকগুলো ভাঙতে হয়। তবু চারটে পয়সার লোভ ছাড়তে পারে না ঝাপড় মিঞা! ঠিক সময়ে এসে

হাজির হয় কুসুমভিলায়।

ফটকের লোহার গেটটা ঠেলে, ইউক্যালিপটাস্ গাছের সারি দেওয়া লাল মোরামের ওপর লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সে সোজা ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসে।

সিমেণ্টের বাঁধানো ইঁদারাটার কাছে পৌঁছে লাঠিটা রেখে আগে একটু বিশ্রাম নেয়, তারপর পেয়ারা গাছের তলা দিয়ে এগিয়ে রান্নাঘর বাঁয়ে রেখে, খিড়কার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে। ডানপাশে সিঁড়ির নীচে যে মুরগীর ঘরটা, সেখান থেকে একটাকে ধরে নিয়ে বাইরে পেয়ারা গাছের তলায় জবাই করতে বসে ঝাপড় মিঞা হাঁক দেয়, ও দিদিমণি জল আনো।

সরমা শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে পিঠের ওপর লম্বা বিনুনীটা দুলিয়ে ছোট্ট এক বালতি জল ও একটা কাঁচের প্লেট্ সেখানে রেখে ছুটে পালিয়ে যায়। চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত জানোয়ারকে জবাই করার দৃশ্য সে সহ্য করতে পারে না।

বুড়ো মুরগীটাকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে রেখে বাঁ হাতে তার যখন গলাটা টেনে ধরে, তখন মুরগীটার কণ্ঠ ভেদ করে এক প্রকার বিকট চাপা আর্তরব কানে আসে সরমার। দু'হাতে কানটা চেপে সরমা আরো খানিকটা আড়ালে চলে গেল। ডান হাতের ছুরিটা দিয়ে বুড়ো মুরগীর গলাটা কেটে ফেলেই আঙুল দিয়ে টিপে থাকে ধড়টা। যাতে কাটাগলা থেকে রক্ত না ছুটে বেরিয়ে যায়। মাংসর নাকি তাতে 'টেস্ট্' খারাপ হয়ে যায়। ঝাপড় মিঞা দ্রুত হাতে মুরগীটার দেহ থেকে পালকগুলো টেনে টেনে ছাড়িয়ে যখন সাফ করে ফেলে, তখন সরমা এসে দাঁড়ায় তার সামনে। তারপর ছোট বালতির জল ঢেলে দেয়। বুড়ো দু'হাতে রগড়ে ধুয়ে মুরগীটার দেহ পরিষ্কার করে পিস্ পিস্ করে কেটে কাঁচের প্লেটে রাখবার আগে প্রশ্ন করে, আউর বড় পিস্ বানাবো দিদিমণি?

না-না—আরো ছোট করো। ম্যাগো, বড় বড় পিস্‌গুলো খেতে গেলে যেন ঘেন্না করে। বলতে বলতে বুড়োর সামনে নিজের শরীরটাকে একবার মুষড়ে নিয়ে, সে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বুড়ো, এই জানোয়ারগুলোকে কাটতে তোমার কষ্ট হয় না?

কষ্ট! কিসের কষ্ট?

শিউরে ওঠে সরমা। ওঃ কি নিষ্ঠুর তুমি।

বুড়ো বলে, তোমরা যখন মাছ কুটে রান্না কর তখন কি তোমাদের কষ্ট হয়?

কিন্তু মাছ আর এই মুরগী কি এক হলো। আহা, কি সুন্দর দেখতে, কত রং-বেরংয়ের পালক দিয়ে সাজানো সমস্ত দেহটা! আর কি সুন্দর ডাকে ভোরবেলা!

তোমার কাছে মাছ যা দিদিমণি, আমার কাছে মুরগীটাও তাই।

আচ্ছা বুড়ো, তুমি ক'টা করে মুরগী কাটো?

তার কি কিছু ঠিক আছে দিদিমণি। তবে 'সিজিন টাইমে' বেশী হয়। রোজ দু' আড়াই রুপিয়া কামাই করি!

এ্যা! কি বললে? অর্থাৎ ষোল দু'গুনে বত্তিরিশ আর আটে চল্লিশটা করে মুরগী কাটো?

কণ্ঠে ক্ষোভ এনে ঝাপড মিঞা বলে, সে আর ক'টা দিন দিদিমণি। পুজোর সময় বড় জোর পাঁচ-সাত রোজ! তারপর ত সব ফাঁকা। লোকজন কি আর এখানে কেউ থাকে! হাঁ, তবে যারা চেঞ্জে আসে এমন কিছু লোক থাকে। কিন্তু কেউই এখানে বেশী দিন থাকতে চায় না।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেয় সরমা, ঠিক ত। কেন থাকবে? কেবল পাহাড় আর বনজঙ্গল ছাড়া কি আছে তোমাদের এখানে। না সিনেমা, না রেস্তোরাঁ, না গাড়ীঘোড়া, না কোন দেবমন্দির। একটা দোকান পসার বাজার হাট পর্যন্ত বলতে কিছু নেই। পালাতে পারলে বাঁচি। এই ক'দিনেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। নেহাত প্রাণের দায়ে মানুষ এখানে পড়ে থাকে! জলহাওয়া ভাল, খাবার জিনিসপত্তরও সস্তা তাই।

বুড়ো কোন উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে তার হাতের কাজ করে যাচ্ছিল!

সরমা থামতেই সে সজোরে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। কেন করলে, তার অর্থ একমাত্র সে-ই জানে।

সরমা এবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা বুড়ো, তুমি কি ছেলেবেলা থেকেই এখানে আছো?

হাঁ দিদিমণি! ঘরবাড়ী ছেড়ে আর কোথায় যাবো!

তখন বোধহয় খুব বেশী বনজঙ্গল ছিল এখানে! বাঘ ভাল্লুক নেই এখানের পাহাড়ে?

এখন আর নেই। ছিল আগে, তখন আমার বয়েস ছিল কম। শিকার

করতে যেতুম জঙ্গলে ওই পাহাড়ের দিকে। কত ভারী ভারী সব বাবুরা আসত তখন এখানে শিকার করতে। ওই সব বড় বড় মোকাম, এখন যা খালি পড়ে আছে তখন সেখানে লোকজন, খানাপিনা, হৈ-হুল্লোড লেগে থাকতো শনিবার হলে। কি দু'চার রোজের ছুটি পেলেই বাবুরা ছুটে আসতো এখানে ফুর্তি করতে। কত বাইজীর নাচগান, সরাবের ফোয়ারা বয়ে যেতো ওইসব বাংলায় দিদিমণি।

বলতে বলতে হঠাৎ একটু চুপ করে, হাতের ছুরিটা দিয়ে মুরগীর একটা ঠ্যাঙ টুকরো করে, আবার ফিরে আসে বুড়ো নিজের বক্তব্যে। বলে, আচ্ছা ওইসব আমীর আদমীরা আজ কোথায় গেল বলতে পারো দিদিমণি?

মুচকি হেসে জবাব দেয় সরমা, তোমার মত অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে ত সবাই বসে নেই, তারা কবে ফৌত হয়ে গেছে!

ঝাপড় মিঞা যেন বিশ্বাস করতে পারে না তার কথা। ও যখন বেঁচে রয়েছে, তারাই বা কেন থাকবে না। এই কথাটাই বুঝি সে নিঃশব্দে ভাবে! একটু চুপ করে তাই বলে, তাদের সব বেটারা, ছেলে-পিলেরা—তারা গেল কোথায়?

এবার হাসি আর চেপে রাখতে পারে না সরমা। বুড়োটার মুখের ওপর এক ঝলক ছুঁড়ে দিয়ে বলে, তোমার বয়সটা যে চার কুড়ি পেরিয়েছে, এটা তুমি ভুলে গেছ, তাই বুঝতে পারো না যে তাদের আজ বেঁচে থাকার কথা নয়। আর যদিও বা বেঁচে থাকে ত অথর্ব হয়ে পড়েছে। ফুর্তি করার মত দেহ না মনের অবস্থা কারো নেই!

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ঝাপড় মিঞা সরমার মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, হাঁ, ঠিক বলেছো তুমি দিদিমণি। নইলে তারা বেঁচে থাকলে, আমার কি ভাবনা ছিল? ওই রাজবাড়ী, সিংহীবাংলা, সুরেনবাবুর কুঠি, রাজেন্দ্রভবন—ওই সব বাড়ীর বাঁধা বাবুর্চি ছিলুম আমি। তাদ্দাড়া ওই মল্লিকবাংলায় একদিন কত ওস্তাদ, বাইজীর নাচনা, গানা, খানাপিনা—রাতভোর, দিনভোর, খালি মৌজ-মৌজ-মৌজ—

বলতে বলতে যেন অতীতের এক রঙীন সুখস্বপ্নে ডুবে যায় বুড়ো। তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বুঝি আবার বেজে ওঠে সেই পুরনো দিনের সব স্মৃতি!

সরমা বলে, তা তোমার এত ভাবনা কিসের? তোমার ত ছেলেপিলে সব আছে!

আছে দিদিমণি। কিন্তু তাদের সকলেরই ত বালবাচ্চা আছে, নিজের নিজের সংসার আছে।

তা বলে তোমায় খেতে দেবে না? তুমি ত তাদের বাপ!

বুড়ো একটু থেমে তারপর বলে, যেখানে তারাই খেতে পায় না, সেখানে বাপ হয়ে কেমন করে তাদের সে মুখের গ্রাস কেড়ে নেবো আমি? খোদা মেহেরবান! যতদিন এই হাতখানায় তাকত রাখবে, ততদিন যেন অন্যের কাছে ভিখ মাঙতে না হয় দিদিমণি!

ওঃ, এত বুড়ো হয়েছো, তবু ত তোমার দেমাক্ দেখি খুব!

ইয়ে দিমাক্ নেহি, ইজ্জত কা বাত দিদিমণি! আমি মরদানা, মরদ্‌কা বাচ্ছা। 'যখন দশ বছরের লেড়কা তখন থেকে এই হাতে যে কাম শুরু করেছি আজও তা থামে নি।

মরদ্‌কা বাচ্ছা! ওই আশী বছরের বুড়োর মুখ থেকে কথাটা শুনে হেসে ওঠে সরমা, বিদ্রূপের হাসি! তারপর বলে, বুঝেছি। দীর্ঘদিনের অভ্যাস, অস্থি-মজ্জাগত হয়ে গেছে, তাই কারুর কাছে হাত পাততে অপমান বোধ হয়, তা ছেলেই বা কি, আর মেয়েই বা কি! হবেই। এটা খুব স্বাভাবিক! বলে সহসা চুপ করে যায় সরমা। কথাটা যে ঝাপড মিঞা মিথ্যা বলেনি, কল্পনায় সাহায্যে সরমা তা অনুভব করতে পারে। এ দীর্ঘ পরমায়ুর অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়। মনে মনে বুড়োর জন্যে সমবেদনা বোধ করে। দূরে লাঠি পাহাড়ের নেড়া মাথার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাই আপন মনেই বলে ওঠে সরমা, আহা বেচারি!

॥ ১৭ ॥

প্রথম দিন কাজ করতে এলে ফুলমণিকে সরমার মা জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা কি জাত বাছা! এ দেশীয় লোক ত?

হাঁ, মা। আমরা জাতে সাঁওতাল, তবে বড় গরীব, পাঁচটা ছেলেমেয়ে, তাদের খেতে দিতে পারি না বলেই পেটের দায়ে এই ঝুটা কাম করছি, নইলে

আমাদের জাতে কেউ একাজ করে না।

তুমি ত দেখছি বেশ ভাল বাংলা বলতে পারো। এদেশের লোক বলে মনেই হয় না!

এখানে বহুত বাঙ্গালী লোক আসে মা, তাদের কথা শুনতে শুনতে শিখে গেছি। আজ পনেরো বছর ধরে ত এই কাজ করছি মা! তোমার কলকাতার অনেক বাবুকে আমি চিনি। আমার নাম তাদের জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে। শ্যামবাজারের বোস বাবু, টালিগঞ্জের সরকারবাবু, বারাকপুরের শশধরবাবু, ওরা ত এক সাল, দু' সাল বাদ বাদ এখানে আসে। ওরা এলেই আগে আমার খোঁজ করবে। লোক পাঠাবে আমার কাছে, ডেকে আন ফুলমণিকে! বড্ড ভাল আদমি সব। যাবার সময় কত বকশিশ দেয়, কাপড়-জামা একটা দুটো দিয়ে যায়। ও বছর পূজোর সময় আমার ছোট ছেলেটাকে শশধরবাবু, তার ছেলের একটা প্যাণ্ট, একটা গেঞ্জি দিয়ে গেল মা!

এ পর্যন্ত বলে, সরমার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কি ভেবে বলে, তোমার ত দেশের লোক, কলকাতায় গিয়ে তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো আমার কথা সত্যি কিনা।

সরমার মা ফিক্ করে হেসে ফেলে বলেন, কলকাতার শহরটা কি তোদের এই কুসুমতলার মত, যে সেই বাবুদের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

কেন মা, শ্যামবাজার ত কলকাতায়, আবার টালিগঞ্জও তোমার কলকাতায়, তবে দেখা হবে না কেন?

তুমি বুঝি কখনো কলকাতায় যাও নি!

না মা, আমরা গরীব দুঃখী আদমি, এত টাকা কোথায় পাবো? রেল ভাড়া ত কম নয়! তবে আমার একটা ছোট বোণ আছে, তার মরদটা কাম করে ইটাগড়ের মিল-এ। তার কাছে শুনেছি, বহুত ভারী শহর! আজব শহর কল্‌কাত্তা! ওদের যে ঘর দিয়েছে কোম্পানী, তার দেওয়াল টিপলে বিজলী বাতি জ্বলে, কল আছে বাড়ীতে, দিন ভোর জল। যত ইচ্ছা বাল্‌তি কলসী ভরে ভরে লাও—আপনি জল পড়ছে, নলের মুখ থেকে! আমাদের মত কুঁয়ো থেকে রশি খিঁচে খিঁচে জল তুলতে 'জান্' নিকলে যায় না!

সরমা ঘরের ভেতর থেকে সবই শুনতে পাচ্ছিল। এবার বেরিয়ে এসে বলে, চলো না আমাদের সঙ্গে কলকাতায়?

না দিদিমণি, বাচ্ছাগুলোকে কোথায় রেখে যাবো!

কেন তোমার বাড়ীতে আর কোন লোক নেই? তার কাছে রেখে যেয়ো।

আছে, আমার মরদটা, তা ও ত দিন ভোর কাজ করে আমারই মত লোকের বাড়ী। কুঁয়ো থেকে জল তুলে দেয়, ঝুটা বাসন ওসব মাজে!

ওমা, তোমার স্বামী আছে! সরমার মায়ের কণ্ঠে বিস্ময় জাগে। তা সিঁদুর পরোনি যে! তোমাদের জাতের সধবা মেয়েরা ত সবাই খুব সিদুঁর পরে দেখেছি ফুলডিহীতে।

হ্যাঁ পরে মা। বলে হঠাৎ মুখটা নীচু করে নেয়। তারপর আস্তে আস্তে বলে, আমার 'সাঙা' হয়েছিল কিনা, তাই সিদুর পরতে নেই।

সাঙা? সে কি?

'ফুলমণি বলে, আমার আগের স্বামীটা মরে গেল মা, তারপর আবার এর সঙ্গে বিয়ে হলো কিনা।'

সরমা প্রশ্ন করে, বিধবা বিয়ে হলে বুঝি সিদুঁর পরতে নেই তোমাদের!

না। একটা ফুলে সিঁদুর দিয়ে মরদরা সেই ফুলটা বাঁ হাতে করে মেয়েদের মাথার চুলে শুধু আটকে দেয়, এই বিয়ের নিয়ম!

তা তোমার স্বামীরও কি এই প্রথম বিয়ে না আগে কোন বৌ ছিল, মরে গিয়েছে কিংবা কারুর সঙ্গে পালিয়েছে ওর বৌ— বলে মুচকি হাসেন।

'না। আমায়-ই সে প্রথম বিয়ে করে।

তোমার স্বামীকে ত ভাল বলতে হবে। কিছু মনে করো না বাপু, তোমাদের জাতের মধ্যে বড্ড বেশী বউ পালায়। যার যাকে পছন্দ হলো, অমনি ঘর দোর ছেড়ে ভাগলো তাকে নিয়ে!

ফুলমণি ছাই দিয়ে বাসন রগড়াতে রগড়াতে বলে, হাঁ দিদিমণি, ও ত হচ্ছে। তবে বড় কড়া আমাদের আইন! তাকে আর দেশে গাঁয়ে ঢুকতে দেয় না কেউ। সমাজে তাকে একঘোরে করে দেয়!

সরমার মা মুখ-ঝামটা দেন মেয়েকে, তোমাদের সমাজে আজকাল যা হচ্ছে তার চেয়ে এরা শতগুণ ভালো! যার যাকে মনে লাগল, তাকে নিয়ে চলে গেল বাপু দেশ গাঁ ছেড়ে, সেখানে কে কি করছে কেউ জানতে যায় না। দেখতে পায় না। কিন্তু তোমাদের এই শিক্ষিত লেখাপড়া সমাজে আজকাল যা হচ্ছে তার মুখে খ্যাংরা মারো। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, ভেবে দেখ দেখি তোদের বুদো বোসের কাণ্ডটা! লেখাপড়া জানা বিদ্বান শিক্ষিত লোক, তার স্ত্রী কিনা একটা পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে দিনের পর দিন একই বাড়ীতে পাশের

ঘরে। স্বামী জানে, আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শীরা সবাই জানে, অথচ মুখে একটা 'রা' কাড়ে না কেউ!

তুমি চুপ করো মা। এদের সামনে আর নিজেদের কেচ্ছা ঘেঁটো না!

সরমার মা বলেন, কেচ্ছা ঘাঁটার জন্যে আমার 'বয়ে' গেছে, আমি শুধু বলতে চাই ভালমন্দ সব জাতের মধ্যেই আছে। একলা ওদের দোষ দিলে চলবে কেন? তা বলে কি ওদের মধ্যে সবাই খারাপ, না আমাদের সমাজেও সকলের ঘরে ঘরে ওই হচ্ছে!

ফুলমণি চাপা গলায় বলে, হাঁ, এইখানে সব বাগানবাড়ীতে কত কত তোমাদের কলকাতার লোকেদের কাণ্ড দেখি মা, কত মেয়েমানুষ নিয়ে আসে, মদ খায় ফুর্তি করে, কেউ বা পরের মেয়ে বোনকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়, সবই জানি মা। এখানে কত থানা-পুলিসও হতে দেখলুম। আমি ত কাজ করেছি এমনি সব লোকের বাড়ীতে। আমাকে নিয়ে পুলিসে কত টানাটানি করেছে। থানায় গিয়ে সাক্ষী দিতে হয়েছে!

তাই নাকি? সরমার চোখ দুটো কৌতহলে জ্বলে ওঠে।

গলাটা আরো নামিয়ে ফুলমণি বলে, একবার ত একটা কুমারী মেয়ের এখানে বাচ্চা হলো মা। আট মাস ছিল ওই লাহাবাংলা ভাড়া করে। আমি তাদের বাড়ী ঝিয়ের কাজ করতুম। খুব বড় ঘরের মেয়ে, বিয়া সাদি হয় নি, একটা ছেলের সঙ্গে ভাবসাব হয়েছিল, সে ওই কাজ করে পালিয়ে গেল। ওর মা-টা কত কাঁদলো আমার কাছে। দিন রাত তার চোখের জল শুকোয না। এখানেই মেয়েটার প্রসব হলো। একটা বেটাছেলে হয়েছিল মা। আমি ধাই ডেকে আনলুম, সে সব কাজকাম করে দিয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে চলে গেল। তাকে দশ টাকা বকশিশ দিলে মাইজী।

তারপর আমি একমাস ধরে ওর আঁতুড় ঘরের সব কাচাকাচি ধোয়ামোছা করে ছিলুম। আমাকে কুড়ি টাকা বকশিশ, আর আমার মেয়েকে একটা সোনার মাকড়ি দিয়ে গেল। মিথ্যা কথা বলবো না মা। মানুষটা বড় ভাল ছিল। মেয়েটার বয়সভি খুব কম—চোদ্দ কি পনেরো হবে। যাবার সময় আমার হাতটা চেপে ধরে কত কাঁদলে। বললে, কাউকে একথা বলিসনি ফুলমণি তোর স্বামীর দিব্যি রইলো।

বাচ্চাটার কি হলো!

একটা গরীব সাঁওতাল মেয়েকে দিয়ে চলে গেল।

হুঁ! বলে সরমার মা একটা অর্থপূর্ণ শব্দ করলেন মুখে। তারপর বললেন, এখন হয়ত কোন ধনীর ঘরে সতীলক্ষ্মী রূপে তিনি বিরাজ করছেন, কে জানে!

ফুলমণি হেসে ওঠে, বিদ্রূপের হাসি।

সরমা রাগে লাল হয়ে ওঠে, হাসছিস যে। তোদের জাতে বুঝি এরকম হয় না!

হবে না কেন দিদিমণি। তবে এভাবে বাচ্ছাকে ফেলে দিয়ে কেউ পালায় না। আমাদের সমাজে ওই বাচ্ছাওলা মেয়েরও বিয়ে হয় এবং সেটা এমন কিছু অপরাধের নয়।

তাই নাকি?

হাঁ, দিদিমণি। তোমাদের জাতের মত আমাদের ত মেয়ের বাপকে এত টাকা পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে হয় না। ছেলেদের কাছ থেকে মেয়ের বাপ-মাই পণের টাকা পায়, তাই এরকম মেয়েকে যে পুরুষ বিয়ে করে, তাকে পুরোপণ দিতে হয় না, অর্ধেক দিলেই চলে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, বিয়েটা ঠিক কুমারী মেয়ের মতই সম্পন্ন হয়। সমাজে যার যেটুকু পাওনা-গণ্ডা সবাই ঠিক ঠিক মত পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোন নিয়মকানুন, বিবাহের প্রক্রিয়া কিছুই বাদ যায় না। অথচ বিধবা কিংবা স্বামী-পরিত্যক্তা বা 'ডিভোর্স' করা মেয়ে বিয়ের ক্ষেত্রে শুধু কেবল অর্ধেক কন্যাপণ দিলেই হয় মেয়ের বাপকে, আর আট আনা জগমাঝিকে তার ফি বাবদ, ব্যস্ আর কেউ কিছু পায় না। গাঁয়ের যিনি মাঝি, তিনিও যেমন এক পয়সা পান না তেমনি বিয়ের আর কোন কিছু অনুষ্ঠান হয় না। জলসওয়া, মাথা ঘষা, স্নান সিঁদুর পরা প্রভৃতি কিছু করার নিয়ম নেই।

সরমা বলে, 'সাঙা'টাকে ঠিক বিয়ে না বলে বরং একটা অস্থায়ী চুক্তি—একটা মেয়ের সঙ্গে একটা পুরুষের ঘরকন্না করার অনুমতি বলা যেতে পারে!

সরমা আবার বলে, শুনেছি নাকি তোদের সমাজে আগেকার দিনে এইসব বিধবা ডিভোর্স করা মেয়েদের কেউ 'সাঙা'ও করতো না।

ফুলমণি বলে, হাঁ দিদিমণি। ওসব জমানা ত চলে গেল। এখন আর সেসব গোঁড়ামির দিন নেই। অনেক কিছু কমেছে। তাই এখন এইভাবে সমাজে 'সাঙা' খুব হচ্ছে। এই সাঙাকরা বৌটা যখন মরে তখন তাকে সিঁদুর দিয়ে চিতায় তুলে দেয় মরদরা, এই আমাদের সমাজের নিয়ম।

তাই নাকি!

হাঁ, নিয়ম ত অনেকরকম আছে দিদিমণি। আবার যদি কোন লোকের বৌ মরে যায় বা তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে পালিয়ে যায়, সে লোক যদি কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করে, সে বিয়েটাকে আমাদের সমাজ মানবেক। তখন কুমারী মেয়ের সঙ্গে কুমার ছেলের বিবাহের মতই সমস্ত অনুষ্ঠান হবে। শুধু এক্ষেত্রে কন্যাপণ পাঁচ টাকা কি সাত টাকা মেয়ের বাপ-মাকে দিতে হয়, আর বরপক্ষের কিছুই দাবী-দাওয়া বা পাওনা থাকে না কন্যাপক্ষের কাছে।

সরমার মা এবার প্রশ্ন করেন, তোমার আগের পক্ষে কোন ছেলে-পিলে হয়নি?

হয়েছে মা। একটা ছেলে, একটা মেয়ে।

আর এ পক্ষের?

ছ'টা! তা একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ত মরে গেল মা। আজ চার সাল হলো। খুব বসন্ত হলো সে বছর, আমার গাঁয়ের অনেক আদমী মরে গেল মা!

সরমার মা সহানুভূতি জড়ানো কণ্ঠে বলেন, তা তোমার আগের পক্ষের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে সাদী দিয়েছে!

হাঁ মা। ছেলেটার বিয়ে হলো তিলুয়ার কাছে কদমপুর, সেখানে ওর শ্বশুর-বাড়ীতেই সে থাকে, ওর শ্বশুরের ওই একটা মেয়ে কিনা।

সরমা জিজ্ঞেস করে, এখন তোমরা ত নীচুতে নেমে গেছ, বিয়ে তোদের জাতের ঘরে ত হবে না!

হাঁ দিদিমণি। তবে ওরা আমাদেরই মত নীচু ঘরের আছে। মেয়েটারও বিয়ে হয়ে গেছে, মধুপুরে।

তোমার এ পক্ষের ছেলে বড় না মেয়ে বড়?

মেয়ে মা।

তার বিয়ে দিয়েছো কোথায়?

এখনো তার বিয়ে দিতে পারিনি মা।

তার বয়েস কত?

পনেরো ষোল হয়েছে মা।

সরমা বলে, তোমাদের ঘরে ত সব ছোট ছোট মেয়ের বিয়ে হয়!

তা ত হয়। কিন্তু ছেলে না পেলে কি হবে দিদিমণি। এখনও তোমাদের

ঘরে যেমন হচ্ছে, আমাদেরও তেমনি মেয়েদের বেশী বয়সে বিয়ে হচ্ছে!

তার জন্যে তোমাদের সমাজে কিছু বলে না।

বলবে কাকে দিদিমণি! যারা সমাজের মাথা, তাদের ঘরেও সব মেয়ে বড় বড় থাকছে।

সরমার মা বলেন, তোমার মেয়ের কোথাও বিয়ের কথা হচ্ছে না?

হচ্ছে ত মা। পনেরোটা টাকা ত সে ছেলেটার বাবা যোগাড় করতে পারছে না। আজ দু'বছর ধরে ত ঠিক হয়ে আছে বিয়ের।

সে ছেলেটা কি করে? সরমা শুধায়।

কি করবে দিদিমণি। বাপের থোড়া জমিন আছে, চাষ করে আর জঙ্গল থেকে কাঠকুঠো এনে হাটে বাজারে বিক্রী করে যা দু' চার আনা পায়।

ওমা, তাহলে তোমার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে কি করে?

ম্লান হাসি হেসে জবাব দেয় ফুলমণি, আমরা গরীব, আমাদের ঘরে এমন বিয়ে হয় দিদিমণি। আমি-ই বা তাকে কি খাওয়াতে পারি। এই বলে একটু থেমে সে আবার বলে, আমাদের ঘরে মেয়েছেলেদের বয়েস হলেই বিয়ে দিতে হয় এটাই নিয়ম। শ্বশুরঘরে গিয়ে কে কি ভাবে থাকবে, সেটা তার ভাগ্য! আমরা গরীব দুঃখী, আমাদের এই ভাবেই সব বিয়ে-থা হয় দিদিমণি!

সরমা আর কিছু না বলে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ঘরের ভেতর চলে যায়।

॥ ২০ ॥

সেদিন ঝাপড় মিঞা যখন মুরগীটাকে জবাই করার পর টুকরো টুকরো করে কেটে রাখছিল প্লেটে, তখন সরমা হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করে বসলো, আচ্ছা বুড়ো, তুমি ত জাতে মুসলমান!

হাঁ, তা কেয়া বাত?

না, অন্য কিছু নয়। এখানে ত সব সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি যত সব আদিবাসীদের বাস, এর মধ্যে হঠাৎ তোমরা কেমন করে এলে, জিজ্ঞেস করছি।

ছুরি দিয়ে মুরগীর একটা পা চুপিয়ে চুপিয়ে কাটছিল ঝাপড় মিঞা। হাতটা থামিয়ে সরমার মুখের ওপর চোখ রেখে বলে, আমরাও আগে সাঁওতাল ছিলুম, আমার ঠাকুরদাদা মুসলমান হয়েছিল দিদিমণি। আমার বাবার কাছে শুনেছি

একবার একটা বাইজী এসেছিল এখানে এক রহিশ আদমীর। বাগানে ক'দিন ধরে খুব ফুর্তি নাচগান চলার পর হঠাৎ বাইজী অসুস্থ হয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে তার সর্বাঙ্গ বসন্তের গুটিতে ভরে উঠলো। আমার ঠাকুরদাদা ছিল ওই বাগানের মালী। তার জিম্মায় বাইজীকে ফেলে রেখে বাবুরা সব পালিয়ে গেল। বড় সাংঘাতিক বসন্ত হলো বাইজীর, বাঁচবার আশা একেবারেই ছিল না। চার পাঁচ দিন আর তার কোন জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হতে, আমার ঠাকুরদাদাকে সে জিজ্ঞেস করে, বাবু কোথায় ?

ঠাকুরদাদা বলে, সব পালিয়ে গেল ভয়ে।

এ্যাঁ। পালিয়ে গেছে! আমার তা হলে কি হবে। কে আমায় দেখবে!

ঠাকুরদাদা বলে, আমি দেখবো, আমার দেহে যতদিন এক ফোঁটা রক্ত থাকবে তোমাকে ফেলে আমি কোথাও পালাব না! তোমাকে আমার হাতে ছেড়ে তারা চলে গেছে। তাদের আমি কথা দিয়েছি তোমায় দেখব বলে! তাই, যখন জবান দিয়েছি তখন জীবন গেলেও রক্ষা করবো, আমরা সাঁওতাল মিথ্যা কাকে বলে জানি না।

তোমার 'জানের ভয় নেই! জিজ্ঞেস করে ছিল বাইজী।

ঠাকুরদাদা বলে ছিল, জানের চেয়ে কথার দাম বেশী আমার কাছে। মরতে ত একদিন হবেই—দু'দিন আগে নয়ত দু'দিন পরে।

খোদা তোমার মঙ্গল করুক। বলতে বলতে বাইজী কেঁদে ফেলে। তার পর অনেকক্ষণ বাদে একটু সামলে নিয়ে আবার বলে, আমি বাঁচবো ত মালী ?

খোদাকে ডাকো, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় দয়া করবেন। এই বলে হঠাৎ থেমে যায় ঝাপড মিঞা।

সরমা বলে, তারপর কি হলো—ভাল হলো ?

হাঁ ভাল হলো, কিন্তু দুটো চোখ অন্ধ হয়ে গেল!

এ্যাঁ! আঁতকে উঠলো সরমা। তারপর ?

তারপর যখন সুস্থ হয়ে উঠলো তখন ঠাকুরদাদা বললে, তোমাকে তোমার বাড়ীতে রেখে আসি চলো।

বাইজী বললে, না, এ চেহারা নিয়ে আমি সেখানে যেতে পারবো না কিছুতে। আমায় দয়া করো তুমি। বলে কাঁদতে কাঁদতে আমার ঠাকুরদাদার পায়ে লুটিয়ে পড়লো!

ঠাকুরদাদা তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বোঝালে। বললে, তোমার বাড়ীতে কে কে আছে বলো।

সে বলে, কেউ নেই। বাবা নেই, মা নেই, আপনার জন কেউ নেই। পয়সা নিয়ে নাচ গান করে নিত্য নূতন বাবুর মন ভুলিয়ে এসেছি এতদিন। এখন আমি কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো, কে আমায় আশ্রয় দেবে এ অবস্থায়! বলে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লো।

ঠাকুরদাদা তার চোখের জল মোছাতে গেলে, হঠাৎ বাইজী তার হাতটা দু'হাতে চেপে ধরে বলে, মালী, তুমি আমায় এখানে রাখতে পারবে না? বলো, কথা দাও!

আমি একটা গরীব সাঁওতাল। মালীর কাজ করি তিন টাকা মাইনে পাই। আমার কি সঙ্গতি আছে যে তোমায় রাখতে পারি?

বাইজী তখন ডুকরে কেঁদে উঠলো, তোমার মন আছে, তোমার হৃদয় আছে, লক্ষ টাকার বিনিময়ে যা পাওয়া যায় না, তুমি সেই দুর্লভ ধনের অধিকারী। জানো, আমার অনেক টাকা আছে, হাজার হাজার; টাকা সোনা হীরা জহরত অনেক আছে, এই রূপ দিয়ে এই কণ্ঠের সঙ্গীত দিয়ে একদিন সব উপার্জন করেছি! বিশহাজার টাকা তোমায় দেবো আর দেবো হীরা জহরত সোনা যা কিছু এতদিন ধরে সঞ্চয় করেছি সব, শুধু তার বিনিময়ে আমি চাই তোমার এই মন! তোমার এই সেবাপরায়ণ দু'খানা হাত! বলো, কথা দাও, চুপ করে থেকো না। মালী, তুমি পুরুষ, আর আমি নারী। আজ আমি অন্ধ হয়েছি। সারা দেহে মারী গুটিকার চিহ্ন ভরে গেছে, কিন্তু ভেবে দেখো একদিন শুধু আমার এই দেহটা একবার স্পর্শ করবার জন্যে কত ধনী যুবক, কত রাজা মহারাজা কাকুতি-মিনতি করেছিল! সেই দেহ, সেই মন, সেই সব আজো লুকনো আছে আমার মনের গভীরে। তাদের যা কখনো দিইনি তাদের সঙ্গে যা নিয়ে প্রতারণা করেছি, বিশ্বাস করো, এই তোমার বুকে হাত দিয়ে বলছি, সেই অমূল্য রত্ন আমার সেই মন, যাকে আমি কলুষিত হতে দিইনি, দেহ থেকে সরিয়ে মনের গভীরে লুকিয়ে রেখেছিলুম—সব আজ উজাড় করে তোমায় দেবো। শুধু তুমি বলো, আমায় গ্রহণ করবে। নেবে আমার এই বাকী জীবনটার ভার? বলো, বলো, চুপ করে থেকো না!

মুরগীর গলাটা ধড় থেকে ছুরি দিয়ে ছিন্ন করতে করতে ঝাপড় মিঞা বলে, আমার ঠাকুরদাদা লোকটা খুব ভালমানুষ ছিল, তাই আর না বলতে পারলে

না। শুধু বললে—কিন্তু আমি সাঁওতাল, আমাদের সমাজে যে তাহলে আমাকে জাতিচ্যুত করবে।

আমার যথাসর্বস্ব আর তার সঙ্গে যদি এই মন প্রাণ দেহ তোমার হাতে তুলে দিই, তার চেয়েও কি তোমার কাছে তোমার জাতের মূল্য বেশী!

ঠাকুরদাদা এবার আর না বলতে পারেনি। সেই থেকে আমরা জাতিচ্যুত হয়ে মুসলমান হয়েছি। ঠাকুরদাদার তাতে লোকসান হয়নি। এখানে বহু টাকার সম্পত্তি করেছিল। ছেলেবেলায় আমরা খুব সুখ ভোগ করেছিলুম, কিন্তু বাবা মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আমার চাচারা আমাদের সব ঠকিয়ে নিয়েছিল। আমরা তখন খুব ছোট ছিলুম, কিছুই বুঝতুম না।

সরমার মনে হয় ঝাপড মিঞার মুখ থেকে সে যেন একটা রোমান্টিক উপন্যাসের কাহিনী শুনলে।

॥ ২১ ॥

এখানকার এই সরল অসভ্য মানুষগুলোকে খুব ভাল লাগে সরমার

ফুলডিহীর মত এরা গম্ভীর বা স্বল্পভাষী নয়। তাদের দেখলে যেমন মনে হতো, ওরা তাদের কাছে একটা অবাঞ্ছিত অতিথ, তাদের চোখে মুখে ছিল কেমন একটা যেন অসহযোগিতার ভাব, এদের ভেতর কিন্তু সেটা একেবারেই নেই। বরং এরা তাদের উল্টো স্বভাবের। সব সময় সরমাদের সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহশীল।

সরমারা যেখানে ছিল। তার অল্প দূর থেকেই শুরু ছোট ছোট অসংখ্য কুঁড়ে ঘর—মাটির দেওয়ালের নীচের দিকটার অর্ধেক কালো রং আর ওপরটা সব গেরুয়া মাটি দিয়ে নিকানো মোছানো খট্‌খটে পরিচ্ছন্ন। ওই পাহাড় জঙ্গল ও উঁচু নীচু ঢেউ খেলানো প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় সুন্দর দেখাতো।

সরমারা যখন বেড়াতে বেরুত, কিংবা স্টেশন বা পোস্ট অফিসে কোন কাজে যেতো তখন এইসব বস্তিগুলোর কাছ দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে হাঁটতো।

ওকে দেখে মেয়ে-পুরুষরা লতাপাতায় ঘেরা কঞ্চির বেড়ার ওপর দিয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকতো। কেউ কেউ আবার উপযাচক হয়ে জিজ্ঞেস করতো, তুরা কোন্ বাংলায় এসেছিস রে!

সরমা হেসে জবাব দেয়, ওই যে লাহাবাবুদের বাংলা, তার সামনে লোহার

ফটকওলা বাগান, সেইখানে।

পরস্পরের মধ্যে তখনই আপনভাষায় কি সব আলোচনা যেন শুরু হয়ে যায়। সরমা তার এক বর্ণ বুঝতে পারে না। তবে এইসব মুখের অনেককে দেখতে পায় তাদের বাগানের ফটকে। কেউ গোটা কতক ঝিঙে, কেউ বা চারটি কাঁচা লঙ্কা, কেউ বা দুটো গাছের কাঁচা পেঁপে নিয়ে এক-একদিন বেচতে আসে।

আবার সরমাও অনেক সময় ওদের বাড়ীতে গিয়ে ইচ্ছামত তরিতরকারী কিনে আনে।

কারো মাচায় লকলকে পুঁইশাক দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর তাদের বাড়ীর ভেতরে ঢুকে বলে, দে তো দু'পয়সার পুঁই শাক।

তারা যেন হাতে চাঁদ পায়। সাগ্রহে মেয়ে-পুরুষ যে থাকে, গোটাকতক ডগা কেটে দেয়।

এমনি করে অনেকের সঙ্গেই আলাপ জমিয়ে ফেলে সরমা। ইদানীং ওকে পথে দেখলে তারাই বাড়ীর ভিতরে ডাকে। বলে, দিদিমণি কি বেড়াতে যাচ্ছো নাকি?

হ্যাঁরে। কেন?

এই উচ্ছেগুলো নিবি নাকি, বলে হয়ত কেউ এগিয়ে আসে।

সরমা বলে, আমি ত এখন বেড়াতে বেরিয়েছি, তোরা কেউ যদি দিয়ে আসিস আমার মায়ের কাছে তাহলে নিতে পারি।

তখনি ছোটে একটা ছেলে বা মেয়ে সেইগুলো হাতে নিয়ে।

কোন কোনদিন কিছু ফলমূল বা তরিতরকারী কিনতে এসে জমিয়ে গল্প করে সরমা। তাদের ঘর-সংসারের কথা জিজ্ঞেস করে। সত্যি কথা বলতে কি, এত দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাদের মুখে চোখে কেমন একটা খুশি-খুশি তৃপ্তির ভাব লক্ষ্য করে সে বিস্মিত হয়।

একদিন এমনি বসে গল্প করছে সরমা একটা বাড়ীতে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে একটা চৌদ্দ পনেরো বছরের ছুঁড়ি বাড়ীর ভেতরে এসে যেমন সামনের ঘরটাতে ঢুকতে যাবে অমনি ঘরের ভেতর থেকে একটা ছোঁড়া এসে দু'হাত দিয়ে তার পথটা রুখে দাঁড়ালো। বললে, খবরদার, ঘরের ভেতর ঢোকার চেষ্টা যদি করবি ত তোকে মেরে ফেলবো। দূর হয়ে যা এখান থেকে, শিগগির।

তুই আমায় বিয়া করবি না?

না।

এবার মেয়েটা প্রাণপণে ছেলেটাকে ঠেলতে থাকে তাকে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢোকার জন্যে। কিন্তু ওই জোয়ান আঠারো উনিশ বছরের ছেলেটার সঙ্গে পেরে ওঠে না। অবশেষে হার মেনে গালাগালি দিতে দিতে আবার ছুটে বেরিয়ে যায়।

সরমা এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিল তাদের দিকে। মেয়েটা চলে যাবার পর, ছেলেটাও যখন ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো, তখন সে বৌটাকে জিজ্ঞেস করে, ব্যাপার কি!

বৌটা বলে, ও মেয়েটাকে ও বিয়া করবেক নাই।

কেন রে?

এবার বৌটা কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। যেন কারণটা তাকে জানতে দিতে চায় না।

সরমা জানতো কোন মেয়ের কপালে সিঁদুর লেপে দিলে, তাকে ছেলেরা বিয়ে করতে বাধ্য হয় এবং সেক্ষেত্রে মেয়ের আত্মীয়-স্বজনরাই ছুটে আসে। ফুলডিহাতে দেখেছিল। কিন্তু মেয়েকে নিজে এইভাবে ছুটে এসে ছেলের সঙ্গে লড়াই করতে দেখেনি।

তাই আবার সে প্রশ্ন করে, তোদের ত বিয়ের সময় মেয়ে নিজে এইভাবে ছুটে আসে না। পিরীত হলে মেয়ের আত্মীয়-স্বজনরা ছুটে আসে। নয়ত ঘটক-ঘটকী লাগিয়ে উভয় পক্ষে কথাবার্তা দেখাশুনা হয়ে তবে বিয়ে হয়। এটা তবে কি রকমের বিয়ে রে?

মেয়েটা নিজে এসে যেচে ওকে বিয়ে করতে বলছে, অথচ ও তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না, কেন?

এবার আসল কথাটা বৌটা তাকে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে। অর্থাৎ ছেলেটার সঙ্গে ইতিমধ্যে মেয়েটার অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক ঘটে গেছে, তাই সে যেচে এসেছে, তার ঘরে ঢুকতে। তাকে ঘরের ভেতর ঢোকার অনুমতি দেওয়ার অর্থ, তাকে বৌ বলে স্বীকার করে নেওয়া। আর তাড়িয়ে দেওয়া মানে, তাকে বিয়ে করতে সে চায় না।

সরমা বলে, কি হবে তাহলে এখন ওর?

বৌটা বলে, ও এখন যাবেক জগমাঝির কাছে। তাকে সব বলবেক। সে উভয় পক্ষের কর্তাব্যক্তিদের ডাকবে এক জায়গায়। তাদের নিয়ে একটা মীমাংসার বৈঠক বসবে।

সরমার এতে আরো কৌতূহল বেড়ে যায়। বলে, তারপর কি মীমাংসা

তারা করবে ?

ও যখন মেয়েটাকে বিয়া করবেক নাই, তখন ছেলেটা তিন টাকা জরিমানা দিবেক তাকে। এছাড়া তারা যা বললে, তার মোদ্দা কথা হলো এই যে এইজন্যে তাদের উভয় পক্ষের বাপকে পাঁচসিকা করে জরিমানা দিতে হবে। তারপর মেয়েটি তার প্রাপ্য সেই টাকাটা হাতে পেলে তখন সেই জগমাঝি মেয়েটিকে নিয়ে তার বাপ-মায়ের কাছে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসে।

সরমা খিলখিল করে হেসে ওঠে। অর্থাৎ একটা কুমারী মেয়ের ইজ্জতের মূল্য তোদের দেশে মাত্র তিন টাকা !

কি করবে দিদিমণি। এই আমাদের জাতের নিয়ম। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের কাছে ওই টাকাটার মূল্য কম নয়। তোমরা আমীর আদমি, তোমরা আমাদের দুঃখ বুঝতে পারবে না।

ওর শেষের কথাটা সরমার কানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। সে চুপ করে থাকে। হঠাৎ কে যেন তার কানে মুখ দিয়ে চুপি চুপি বলে, এদের তবু ইজ্জতের মূল্য তিন টাকা। তোমাদের কত ? একটা সিনেমার টিকিট আর তার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বড জোর চপ-কাটলেট খাওয়া। এমন অনেক মেয়ের কাহিনী সে জানে।

বৌটা সরমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে যায়। ভাবে, ওর কথায় হয়ত সরমার ইজ্জতে ঘা লেগেছে। তাই কুণ্ঠার সঙ্গে আবার বলে, দিদিমণি, তুমি আমার ওপর রাগ করো না। আমরা জংলী, অসভ্য, তোমাদের মত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে হয় কি করে তা জানি না।

সহসা সরমার চমক ভাঙে। বলে, আরে না না, আমি অন্য কথা ভাবছিলুম, রাগ করতে যাবো কেন তোর ওপর। বরং খুশি হয়েছি তুই সত্যি কথা বলেছিস বলে। নইলে তোদের সম্বন্ধে আমরা ত কিছুই জানি না !

বাড়ী ফেরার পথে সারাক্ষণ কেবল একটা প্রশ্নই ওর মনের গভীরে পাক খেয়ে মরতে লাগল, সত্যিসত্যি আমরা কি এদের চেয়ে এগিয়েছি ?

॥ ২২ ॥

প্রত্যেকদিন 'মর্নিং ওয়াক্' করে সরমা যখন ফিরে আসে দেখে রান্নাঘর ধোয়া-মোছা, রাত্রের এঁটো বাসনগুলো মেজে দেওয়ালের একপাশে গোছ করা

আর রান্নার জল বালতিতে ও খাবার জল মাটির কলসীতে চাপা দিয়ে রেখে উনুনে আঁচ দিয়ে চলে গেছে ফুলমণি।

সে চটিটা খুলে রান্নাঘরে ঢুকেই আগে চায়ের জলটা উনুনে বসিয়ে দিয়ে তবে অন্য কাজ করে।

কিন্তু সেদিন ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সরমা। এঁটোবাসনগুলো তখনো তেমনি পড়ে আছে, বাসি ঘর ধোয়া হয়নি, জলের বালতি কলসী-গুলো শূন্য।

হাঁ মা, ফুলমণি বুঝি আজ আসেনি? প্রশ্ন করে সরমা।

ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দেন সরমার মা, কেন আজ এত দেরী করছে, বুঝতে পারছি নারে। ওর ত কোনদিন সময়ের এদিক-ওদিক হয় না।

তাহলে বোধহয় নতুন বাড়ীর কাজটা করে দিয়ে তারপর আসবে এখানে।

হতে পারে। আমিও সেইকথা ভাবছি। দেখা যাক আর একটু।

স্টেশনের কাছে আর এক বাড়ীতে লোক এসেছে, সেখানে কাজ পেয়েছে ফুলমণি। তাদের গিন্নী অসুস্থ। সাতটা বাজবার আগেই গিন্নার জলখাবারের ব্যবস্থা ঠাকুর করতে না পারলে বাবু খুব রাগারাগি করে, তাই তাকে সাড়ে ছ'টার আগে তাদের বাইরের সব কাজ সেরে, জল তুলে দিতে হয়। তারও আগে এসে ওদের কাজ সেরে দিয়ে সেখানে চলে যায় ফুলমণি। যাবার সময় সরমার মার কাছে প্রায়ই একটা কথা সে যেচে বলে, ফুলমণি বেইমানী কাম করে একথা কেউ বলতে পারবে না মা! তুমি আমার আগের মুনিব, তোমাকে আগে খুশি করে তবে অন্যের কাজ! আমি সাচ্চা আদমি, সিধাবাত আমার কাছে মা!

পাঁচদিন চুপ করে থেকে একদিন সরমার মা বলে উঠলেন, তা তুই রোজ ওকথা আমায় শোনাস কেন, আমি কি তোকে কোনদিন বেইমান বলেছি?

জিব কেটে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় ফুলমণি, ছি—ছি—ছি মা, এমন মিথ্যা কথা আমি বলবো তোমার নামে!

তাহলে ওকথা আমায় শোনাস কেন!

ওই বাবুটা বলে কিনা, আমার কাজ যদি আগে করে দিস ত দু'টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো! আমি বলি—না, সে বেইমানী কাম আমি করতে পারবো না। আমার জান যাবে, তবু মুখের জবান যা দিয়েছি তার এতটুকু নড়চড় হবে না।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ এই কথাটা মনে পড়ে সরমার মায়ের। তখন তিনি মেয়েকে ডেকে বলেন—এই, যা তো সরো একবার মালীটার কাছে, তাকে গিয়ে বল একবার ফুলমণির বাড়ীতে খবর নিতে, কেন সে এলো না। আমার মনে হচ্ছে, হয়ত অসুখবিসুখ করেছে কিংবা অন্য কোন কারণে আসতে পারেনি এতক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা না করে, আরো আগে খোঁজখবর করা উচিত ছিল।

তখনি সরমা বনুয়া মালীকে ডেকে বললে ফুলমণির খবর আনতে।

বনুয়া বাগানে কাজ করছিল। ঝুড়ি কোদাল ফেলে তখনি ছুটলো।

একটু পরে বনুয়া এসে যা খবর দিলে, তা শুনে ওরা সবাই স্তম্ভিত! অসুখ-বিসুখ কিছুই করেনি, ও গিয়ে দেখে তার বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য, ফুলমণি কাঁদছে, সঙ্গে তার ছেলে-মেয়েরাও সবাই কাঁদছে।

ফুলমণির স্বামী সকালে একটা মেয়েটার কপালে সিঁদুর লেপে দিয়েছে, তাই নিয়ে হুলুস্থুল পড়ে গেছে ওর বাড়ীতে।

সেকি! সে ত শুনেছি বুড়ো? সরমা মা প্রশ্ন করেন।

হাঁ। বুড়ো বলেই ত ওই কাম করেছে মা!

হাসি চেপে রাখতে না পেরে সরমা বলে, সে আবার কি। তোমাদের জাতে ত কোন মেয়েকে সিঁদুর দিলে তাকে বিয়ে করতে হয়।

হ্যা, তা ত হয়!

কিন্তু ওর বউ রয়েছে, এতগুলো বড় বড় ছেলে-মেয়ে রয়েছে যে! সরমার মা বলেন।

সরমা কণ্ঠে কৌতুক এনে প্রশ্ন করে, হাঁরে, মেয়েটার বয়েস কত হবে?

একটু ভেবে বনুয়া বলে, তা বারো-তেরো হবে দিদিমণি!

এবার হাসতে হাসতে সরমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। ওর মা ধমক দেন, চুপ কর, যে দেশের যে নিয়ম।

হাঁ, ঠিক বলেছ মা। বনুয়া বলে।

এ্যাঁ! বলিস কিরে? তোদের জাতে এরকম বিয়ে হয় নাকি! সমাজে ওকে কিছু বলবে না। একবার যে 'সাঙা' করে, তাকে বুঝি এইভাবে সুদে আসলে পুরিয়ে নিতে হয় পরে, এই তোদের নিয়ম?

না দিদিমণি। 'সাঙা' করা লোকদের কেউ দু চক্ষে দেখতে পারে না। যে সব মেয়ের স্বামী মরে গেল, বা তার পুরুষটা ওকে ত্যাগ করলে কুলটা

চরিত্রহীনা বলে কিংবা তার মরদটা আর একটা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেল, তাদের যেমন সবাই ঘেন্না করে তেমনি ওই রকমের পুরুষ, যাদের বৌটা পালাল বা মরে গেল তাদের সবাই হীন চোখে দেখে। কোন কুমারী মেয়ে তার গলায় মালা দেয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে সে নিয়ম খাটছে না। ফুলমণির স্বামী ত আগে কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করেনি। প্রথম 'সাঙা' করেছিল ওই ফুলমণিকে। তাই ও যদি কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে সমাজে ওকে বাধা দেবে না।

বেশ ত মজার সমাজ তোদের, ওই বুড়োটার সঙ্গে জোর করে এতটুকু কচি মেয়েটাকে বিয়ে দিতে বাধ্য করাবে!

বন্নয়া বলে, সিঁদুর দিয়েছে বলে সে মেয়েটাকে যে উয়ার ঘর করতেই হবে, এমন নিয়ম নাই। ও ইচ্ছা করলে উয়াকে না নিতে পারে।

সরমা বলে, তা হলেই ত মেয়েটা দাগী হয়ে যাবে। স্বামী-পরিত্যক্তার শ্রেণীতে নেমে যাবে। তখন আর ওর 'সাঙা' করা ছাড়া গতি থাকবে না।

বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে জবাব দেয় বন্নয়া, হাঁ। ওটা ঠিক। তবে ও ছোট মেয়ের সঙ্গে 'সাঙা'য় বসতে আসবে অনেক ছোঁড়া। বরং তাদের সুবিধা হবে, উয়ার বাপকে অর্ধেক টাকা পণ দিয়ে কাজ সারবে। তাছাড়া বিয়ের জন্যে আর কোন খরচা করতে হবে না। লোকজন খাওয়ানো লোক-লৌকিকতা কিছুই লাগবে না। এসব মেয়ের বিয়ে চট করে হয়ে যায়। গরীব ছেলে, যারা টাকা-পয়সার অভাবে বিয়ে করতে পারছে না, এমন ছেলের ভাবনা নেই।

সেদিন বিকেলেই যখন কাজে এলো ফুলমণি, তার মুখে চোখে কোথাও দুঃখ বা শোকের এতটুকু চিহ্ন দেখতে না পেয়ে সরমারা সবাই আশ্চর্য বোধ করে। রান্নাঘরে এঁটো বাসন নিতে ঢুকলে সরমা ও তার মা সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে ওকে।

হাঁরে ফুলমণি, তোর বর নাকি আর একটা ছোট মেয়েকে আজ সিঁদুর দিয়েছে?

হাঁ, মা। খুব সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিলে ফুলমণি।

সরমা বলে, তা হলে ওকে ত বিয়ে করতে হবে তোর বরকে! তোর আর একটা সতীন হবে?

না দিদিমণি।

কেন? তোদের সমাজের ত এই রকম নিয়ম শুনেছি। যদি কেউ কোন মেয়ের কপালে সিঁদুর দেয়, তাকে বিয়ে করতে হয় সেই মেয়েকে।

হাঁ। ওইটাই নিয়ম বটে, তবে আমার স্বামী আগে কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে না করে প্রথমেই 'সাঙা' করেছিল, তাই ও যদি ইচ্ছা না করে, তাহলে কেউ ওকে জোর-জুলুম করবে না। আমাদের দেশে আর একটা নিয়ম আছে, যে পুরুষ প্রথমে 'সাঙা' করে সে যদি কোন কুমারী মেয়ের কপালে সিঁদুর না দেয়, তাহলে পরের জন্মেও কোন কুমারী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবে না পুরুষদের এইরকম বিশ্বাস! তাই একটা মেয়ের কপালে সিঁদুর দিয়ে, তারা আগামী জন্মের বিয়ের পথ এইভাবে সুগম করে রাখে! এর জন্যে কোন জোরজুলুম নেই, ইচ্ছে করলে ও বিয়ে করতেও পারে, আবার নাও পারে।

সরমা বলে, এর জন্যে শুনেছি ত জরিমানা দিতে হয়।

হাঁ। সে যেমন নিয়ম আছে, দিতে হবে বৈ কি!

তোর বর দিয়েছে?

হাঁ।

একটুখানি চুপ করে থেকে সরমা বলে, আচ্ছা ফুলমণি, যদি তোর বর ওকে বিয়ে করতে চাইতো, তাহলে কি করতিস!

কি করবো দিদিমণি, বরাত তেমন খারাপ হলে সবই সহ্য করতে হয়। এমন ত অনেকেই করে।

সরমার মা এবার বলেন, তোর মানুষটাকে তাহলে ভাল বলতে হবে!

হাঁ মা। লোকটা খুব সাচ্চা। তিরিশ বছর হয়ে গেল, আমরা একসঙ্গে ঘর করছি।

সরমার মনে কৌতূহলের অন্ত নেই। বলে, আচ্ছা ফুলমণি, তোদের ঘরে যখন একটা সতীন নিয়ে আসে কোন পুরুষ, তখন তার বিয়েটা কি আগের মত ঘটা করে হয়, না অন্য কোন নিয়ম আছে?

দেখবে দিদিমণি, কেমন করে হয়? আচ্ছা, আমার বাড়ী যেয়ো, শনিবার একটা মরদের তেমনি বিয়ে হবে, তোমাকে দেখাবো।

ঠিক ত? ভুলে যেয়ো না যেন! উৎসাহে ফেটে পড়ে সরমা।

সরমার মা রাগ করেন, দেখে একেবারে চারটে হাত বেরুবে! যে দেশের

যেমন নিয়ম তেমনি হবে, তোদের দেশেও ত পুরুষরা ছুটো-তিনটে বিয়ে করছে, টোপর মাথায় দিয়ে।

তা কি রকম নিয়মটা জানতে ইচ্ছে করে না মানুষের! দেখলে দোষটা কি?

॥ ২৩ ॥

শনিবার দিন ফুলমণির সঙ্গে তার বাড়ীতে গিয়ে সরমা দেখে, ঠিক ওর পাশেই যে চালা ঘরটা, তার উঠোনে গ্রামের মাতব্বর কয়েকজন লোক বসে আছে। সবাই ওদেশের মানুষ। বেশভূষা, আকৃতি-প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য নেই।

ছোট একটা বাছুর এনে একজন পুরুষ একটা স্ত্রীলোকের হাতে দিলে। তারপর সেই পুরুষটার সঙ্গে সেই স্ত্রীলোকটা আর একজন অল্পবয়সী মেয়েকে নিয়ে পাশাপাশি বসলো সেই সব মাতব্বর ব্যক্তিদের সামনে। তারা বসলো সূর্যের দিকে মুখ করে, সেই অল্পবয়সী মেয়েটাকে মাঝখানে রেখে। ফুলমণি সরমাকে চুপি চুপি বললে, ওই ছোট মেয়েটা হলো দ্বিতীয় স্ত্রী। আর তার ছু'পাশে ওরা স্বামী-স্ত্রী।

পুরুষটার ডানদিকে ছিল এই নতুন স্ত্রী। পুরুষটা প্রথমে সিঁদুর নিয়ে তার প্রথম স্ত্রীর কপালে লেপে দিলে। তারপর যেটুকু সিঁদুর অবশিষ্ট রইলো সেটা একটা ফুলের ওপর মাখিয়ে, বাঁ হাতে করে সেই ফুলটা নতুন বৌয়ের মাথায় চুলের ভেতর গুঁজে দিলে।

ব্যস্, হয়ে গেল। সপত্নী গ্রহণের প্রক্রিয়া বলতে ওইটুকু মাত্র!

সরমা তখন জিজ্ঞেস করে, ওই বাছুরটা দিলে কেন লোকটা প্রথম স্ত্রীকে?

ফুলমণি বলে, ওটা ক্ষতিপূরণের মূল্য। পাঁচটা টাকা অথবা একটা বাছুর প্রথম স্ত্রীকে দিতে হয়, তার অনুমতি পাবার জন্যে। এটাই আমাদের নিয়ম। তবে ওর অনুমতি ছাড়া কাজ হবে না।

তোদের বৌগুলোকে ভাল বলতে হবে! হাসি চেপে জবাব দেয় সরমা।

কি করবে দিদিমণি, মরদগুলোদের সঙ্গে, আমরা জেনানা, পারবো কি করে! যদি তুমি মত না দাও, তাহলে ওকে নিয়ে হয়ত পালাবে। তখন মারপিট, খুনখারাপি আরো কত কি নোঙরা ব্যাপার ঘটবে। তার চেয়ে, এতে অনেক শান্তি।

একটু ভেবে সরমা বলে, তা ঠিক! আবার প্রশ্ন করে, হ্যাঁরে, তা দু'জনে ঝগড়া হয় না?

হয় দিদিমণি। দুটো ছেলেমেয়ে একসঙ্গে থাকলে ঝগড়া ত লাগবেই। তবে বড বৌটা বিশেষ ঝগড়া করে না। ও জানে, ওর বয়েস হয়েছে, বুড়ো হচ্ছে তাই চুপ করে নিজের সংসারের কাজকামে ডুবে থাকে। বরং সতীনকে সে আদর যত্ন করে বেশী করে, স্বামীর সুনজরে থাকার জন্যে!

সরমার মনে পড়ে যায়, এককালে সপত্নী নিয়ে ওদের সমাজের মেয়েরাও এমনি করে বাস করতো! আজ ওরা সভ্য হওয়ার ফলে যে প্রথাটার উচ্ছেদ হয়েছে সেটা এখনো রয়েছে এদের মধ্যে। এই যা তফাৎ!

॥ ২৪ ॥

ওইদিন দুপুর বেলা সরমা একটু দিবানিদ্রা দিচ্ছিল, শরীরটা ভাল ছিল না। হঠাৎ বনুয়ার ডাক শুনে বাইরে বেরিয়ে এলো। দিদিমণি, দিদিমণি?

কেন রে, বলে বাইরে এসে দেখে,—বনুয়া একা নয়, তার সঙ্গে সামনের বাগানের মালী নান্দুয়াও রয়েছে।

মধ্যে মধ্যে চিঠিপত্র লেখাতে আসতো এই নান্দুয়া সরমার কাছে। তাছাড়া ওদের বাগানে ছিল অনেক ফুলের গাছ। সরমা ইচ্ছামত যখন তখন ফটকের ভেতর ঢুকে, ফুল তুলে নিয়ে আসতো, তার জন্যে কিছু বলতো না নান্দুয়া। উল্টে নিজে থেকে কোনদিন গোটাকতক পেয়ারা পেড়ে দিতো, কোনদিন বা বিলাতী আমড়া, কোনদিন বা জলপাই। টক খেতে ভালবাসে খুব সরমা। একটু নুন দিয়ে টক্ খেতে খেতে নান্দুয়ার বাগানের ভেতর গাছপালা দেখতে দেখতে ওর বাবুদের কথা সব জিজ্ঞেস করতো। বাবুরা বছরে ক'বার আসে, কতদিন করে থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাই নান্দুয়াকে দেখে সে প্রশ্ন করলে, কি খবর নান্দুয়া, তুমি খেতে যাওনি এখনো বাড়ীতে?

ওখানের বাগানের মালীদের অধিকাংশর বাড়ী দূরে পাহাড়ের দিকে। বেলা একটা দেড়টার সময় কেউই বাগানে থাকে না। ফটকে চাবী দিয়ে চলে যায় খেতে, আবার সাড়ে তিনটে নাগাদ ফিরে আসে।

গিয়েছিলুম দিদিমণি! বলেই হঠাৎ চুপ করে গেল। বনুয়াও তার মুখের

দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে!

সরমা তাই দেখে আবার জিজ্ঞেস করে, এত তাড়াতাড়ি যে আজ ফিরে এলে? চিঠিপত্র কিছু লিখে দিতে হবে নাকি?

না দিদিমণি। বলে এমন ভাবে ঢোক গিললে যেন কি একটা কথা বলতে চায়, অথচ পারছে না।

তা হলে? এই দুপুরে কি মনে করে?

এবার বনুয়া আসল কথাটা পাড়লে। আস্তে আস্তে বললে, কুড়িটা টাকা যদি ধার দিতে পারো এখনি দিদিমণি ওকে, বড্ড দরকার।

কুড়ি টাকা! এত টাকার কি দরকার হলো তোর এখুনি রে নান্দুয়া? বলতে বলতে সরমা তার কাছে আরো একটু এগিয়ে এলো।

নান্দুয়া ধরা-ধরা গলায় বলে, মেয়েটার বিয়ের জন্যে।

সেকি রে! তোদের ঘরে ত মেয়ের বিয়েতে তোরা পণ পাস, তবে তোর টাকার এত দরকার কিসের!

নান্দুয়া এর জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকতে বনুয়া বললে, হাঁ, সেটা ত নিয়ম হচ্ছে, তবে ওর মেয়েটার একটা ছানা হয়েছে কিনা, তাই এখন ত কেউ ওকে টাকা দিয়ে বিয়া করবেক না!

এঁ্যা! চমকে ওঠে সরমা। কি বললি, ওর মেয়ের ছানা হয়েছে! মানে, ছেলে হয়েছে?

হাঁ দিদিমণি!

তার ত বিয়ে হয়নি বলাছস, তবে?

হাঁ, ওই জন্যেই ত বেচারা বড্ড লাচারে পড়ছে! ওর বাবুর কাছে চিঠিও দিয়েছে। তিন কুড়ি টাকা ওর তলব বাকী। এক কুড়ি এসে যাবে এই মাহিনার শেষে, ও তখন দিয়ে দিবেক! আমি তোমার জামিন রইলুম দিদিমণি।

আচ্ছা, তোরা এখন যা। বাবা মা এখন ঘুমুচ্ছে। ওরা উঠলে আমি বলবো, তোরা বিকেলের দিকে একবার আসিস।

তাই আসবো। তখন যেন ঠিক পাই দিদিমণি, নইলে বড্ড মুস্কিলে পড়বো। একটা মরদ বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। কালকে যদি তাকে টাকা দিতে না পারি, তাহলে সে চলে যাবে। মেয়েটার আর বিয়া দিতে পারবে না।

কেন পারবি না?

যে মেয়েটার বাচ্ছা হয়েছে বিয়ের আগে, তাকে বিয়া করতে চায় না কেউ 'দিদিমণি'! আমাদের সমাজের নিয়মটা বড্ড কড়া আছে। বলতে বলতে তারা চলে গেল।

ফুলমণি দুপুরে কাজ করতে এলে সরমা তাকে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে ফুলমণি, নান্দুয়ার মেয়ের নাকি বিয়ের আগেই ছেলে হয়েছে।

হাঁ দিদিমণি। তোমাকে কে বললে? মানুষটা বড় মুস্কিলে পড়েছে, এখন মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না!

কেন, তোদের সমাজে ত এরকম মেয়ের বিয়ে হয়।

হয় দিদিমণি! তবে এখানে একটু গণ্ডগোল হয়েছে। একটা পুরুষের সঙ্গে যদি মেয়েটা মিশতো, তাহলে ত কোন ঝঞ্ঝাট হতো না। মেয়ে যাকে বাচ্ছাটার বাপ বলবে, সমাজের নিয়মে তাকে মেয়েটাকে বিয়ে করতেই হবে কিন্তু যখন একজন পুরুষ না হয়ে অনেক জন হয় তখনি ত যত গোলমাল দিদিমণি! বলে এ টোবাসন মাজতে মাজতে ফুলমণি বললে, নান্দুয়ার মেয়ের যখন বাচ্ছা হবে তখন ওরা গ্রামের মাতবরদের গিয়ে খবর দিলে, তারা সবাই সঙ্গে সঙ্গে আসে। নান্দুর মেয়েটা কিন্তু 'কে ওর বাপ' জিজ্ঞেস করলে সে চুপ করে থাকে, কারুর নাম করতে পারে না। ওর মা-বাপও অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না কারো নাম ওর মুখ থেকে বার করতে।

সরমা এবার মুখ টিপে একটু হেসে বলে, কেন, সেই লোকটার ভয়ে নাকি?

না দিদিমণি, ভয়টা ওর-ই। কারণ যার নাম ও করবে, সে যদি প্রমাণ করে দেয় যে অন্য আরো দু'চারজন পুরুষের সঙ্গে সে তখন মেলামেশা করতো তাহলে তাকে কিছুতেই বাধ্য করতে পারবে না বিয়ে করতে।

তাহলে মেয়েটার কি হবে?

কি আর হবে! যে ক'জনের সঙ্গে মেলামেশা করেছিল তাদের সকলকে কিছু কিছু করে টাকা জরিমানা দিতে হয় এবং যে বাচ্ছাটা জন্মালো 'বিধুয়া' হয়ে, তখন সেই বাচ্ছাটার মাথাটা জগ্‌মাঝির নামে কামিয়ে, তাকে জগমাঝির বংশভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। তারপর যে টাকাটা সকলের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তার কিছুটা সেই মেয়েটিকে দেওয়া হয়, তার বাচ্ছাকে মানুষ করার জন্যে, তারপর কিছুটা পায় সে, যার নামে মাথা কামানো হয়, আর বাকীটা পায় গ্রামের লোক। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হলো যখন মেয়েটা কোন পুরুষের-ই নাম করতে পারে না! নান্দুয়ার হয়েছে তাই, ওর মেয়ে কারুর-ই নাম বলছে না।

সরমা কৌতূহল চেপে বলে, কিন্তু নান্দুয়া যে বললে ওর মেয়ের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। তবে কুড়িটা টাকা দিতে হবে যে বর বিয়ে করবে তাকে।

হাঁ দিদিমণি। সেই কথাই আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি। যখন কোন পুরুষের নাম করতে পারে না মেয়েটা, তখন ওর আত্মীয়-স্বজনরা যদি কাউকে ওই মেয়েটার স্বামী হতে রাজী করাতে না পারে তখন সেই বাচ্ছাটা 'বিধুয়া' হয়ে যায়। কিন্তু যদি তারা টাকা দিয়ে কোন পুরুষকে তার স্বামী হিসেবে কিনতে পারে, তখন সেই পুরুষের নামানুসারে বাচ্ছাটার মাথা কামিয়ে সেই পুরুষের বংশজাত বলে তাকে ধরে নেওয়া হয়। তখন থেকে সেই পুরুষের পদবী সেই বাচ্ছাটা পায়। কুড়িটা টাকা দিতে হয় পুরুষটাকে এই স্বামী-স্বত্ব কেনবার জন্যে। এর সবটাই তাই তার প্রাপ্য। শুনেছি নান্দুয়া তার মেয়ের জন্যে নাকি একটা স্বামী যোগাড় করেছে। বলে বালতি থেকে জল ঢেলে দিলে ফুলমণি ছাই দিয়ে মাজা বাসনগুলোর ওপর।

সরমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তোদের জাতের এ নিয়মটা কিন্তু ভালো।

ভালো। তবে যদি সাঁওতাল ছাড়া অন্য জাতের পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে এই বাচ্ছা হয়, তাহলে তার স্থান নেই আমাদের সমাজে দিদিমণি। তাকে জাতিচ্যুত করা হয়। তারা তখন দেশ গাঁ ছেড়ে দূরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

॥ ২৫ ॥

ওদের ভেতর যেমন অপরের বউ নিয়ে পালানো, কি কোন মেয়েকে নিয়ে উধাও হওয়াটা খুব বেশী, তেমনি তার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থাও বিবিধ রকমের আছে। ডিভোর্স, জাতিচ্যুতি, জরিমানা, জলবন্ধ অর্থাৎ কেবল বিয়ে-থা'র ব্যাপার নয়, সামাজিকতা বলতে যা কিছু বোঝায় সব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রভৃতি। অপরাধের তারতম্য হিসাবে বিধিনিষেধেরও কড়াকড়ি।

সরমার উৎসাহ দিন দিন বেড়ে যায়। ওদের আচার-আচরণ ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার অনেক কিছু ঘুরে ঘুরে নিজের চোখে দেখে, শেখে ও জানে। এখানে কাছাকাছি আদিবাসীদের পল্লীগুলো থাকায় ওর খুব সুবিধা হয়েছে, বেশ ভাবসাব করে নিয়েছে অনেকের সঙ্গে। ওদের বৌঝিরাও ওকে পছন্দ করে। সকালে, দুপুরে, বিকেলে যখনই অবসর পায়, কোন না কোন

একটা বাড়ীতে ঢুকে জমিয়ে গল্প করে, শহরের একটা শিক্ষিত ভদ্রমেয়ে তাদের ঘেন্না না ক'রে, এইভাবে তাদের সঙ্গে যে মেলামেশা করছে এতেই তারা যেন নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করে।

ফুলডিহীর সঙ্গে এখানকার লোকগুলোর মানসিক গঠনের অনেক পার্থক্য। তারা ছিল যেমন আত্মকেন্দ্রিক, নিজেদের এলাকার মধ্যে অন্য কাউকে প্রবেশাধিকার দিতে নারাজ, এরা তেমনি উদার প্রকৃতি, প্রাণখোলা মানুষ, অপরের সঙ্গে যে মিলতে মিশতে চায় বেশী, এটা বেশ ভালভাবেই অনুভব করে সরমা। বড গরীব, নিঃস্ব, অসহায়, তাই বুঝি এত আগ্রহশীল, কে জানে! সরমার চোখে নতুন বিস্ময় আনে ওরা।

কোন বাডীতে গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিদের সমাবেশ দেখলেই এখন ও বুঝতে পারে একটা কোন কিছু সামাজিক গণ্ডগোল নিশ্চয়ই ঘটেছে!

সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। ওর অনুমান যে কতটা সত্য, তার প্রমাণ হাতে হাতে পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কতকগুলো লোকের ভীড একটা বাড়ীতে দেখে সেদিন সরমা ঢুকে পড়লো সেখানে। চালাঘরের সামনেই একটুকরো উঠোন, সমাজের মাতব্বরেরা সেখানে জাঁকিয়ে বসে আছেন। একটা জলভর্তি লোটা মাটির ওপর রয়েছে বসানো আর তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন—একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক। এদের দু'জনের দৃষ্টি পরস্পরের মুখের ওপর নিবদ্ধ। এরা দু'জনে স্বামী স্ত্রী। স্ত্রী স্বামীকে 'ডিভোর্স' বা ত্যাগ করতে চায় কারণ তার স্বামী সপত্নী গ্রহণ করেছে।

স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় পক্ষের গ্রাম্য মাতব্বররা তাই উপস্থিত হয়েছেন। পুরুষ পক্ষের মোড়ল উঠে দাঁড়িয়ে ওদের নাম ধরে বলে উঠলো, শোনো পালুরাম আর যশোমণি, একদিন শুভক্ষণে শুভলগ্নে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে তোমাদের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তোমাদের দু'জনের জীবনকে আমরা একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিলুম, কেবল একদিন দু'দিনের জন্যে নয়, যাতে চিরজীবন তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করতে পারো তার জন্যে। তাই তোমাদের জানাচ্ছি আজ তোমরা দু'জনে যখন দু'জনকে সহ্য করতে পারছো না, তোমাদের বনিবনাও হচ্ছে না, তখন আমাদের কোন দোষ নেই, আমরা তোমার গ্রামবাসীরা কি করতে পারি? তোমরা দু'জনে ভাল করে চিন্তা বিবেচনা করে দেখো, আমাদের যেন পরে এর জন্যে কোন দোষারোপ করো

না যে আমরা তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ এনে দিয়েছি। তাই আবার বলছি পালুরাম যদি, তুমি সত্যি সত্যি তোমার স্ত্রীকে চিরদিনের মত ত্যাগ করতে মনস্থ করে থাকো তাহ'লে তোমার সেই পূর্বপুরুষদের কাছে ও ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানিয়ে তারপর মন স্থির করো পাতা ছিঁড়বে কি ছিঁড়বে না ?

এই কথাগুলি বলার পর তারা পালুরামকে বাঁ পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে সূর্যের দিকে মুখ তুলে, দু'হাত উঁচু করে ক্ষমা চাইতে আদেশ দিলে। তারপর তারা তিনটে কাঁচা শালপাতা এনে তার হাতে দিল।

পালুরাম সেগুলো নিয়ে প্রথমে গলায় জড়ানো চাদরটা ধরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে, তারপরে একটা একটা করে সেই শালপাতা তিনটে বোঁটা থেকে ডগার দিকে মাঝামাঝি চিরে ফেলে দিলে।

ছেঁড়া হয়ে গেলে, সে ঘুরে দাঁড়ালো এবং ডান পা দিয়ে লাথি মেরে সেই জল ভর্তি লোটাটা ফেলে দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করলে। তারপর গ্রাম্যপ্রধান থেকে শুরু করে একে একে মান্যক্রমে নমস্কার করলে সেখানে যারা উপস্থিত ছিল সকলকে।

পালুরামের স্ত্রীও তখন সেই রকম একই ভঙ্গী করে সকলকে প্রণাম করলে।

সরমার কানে এলো তার আশেপাশের লোকেরা ফিসফিস করে বলাবলি করছে, ওরে পাতাটা ঠিক মাঝামাঝি ছেঁড়েনি, তাহলে হয়ত আবার ওদের মিল হতে পারে।

আবার দু'চারজন বললে, ওই দেখ জলটাও সব নিঃশেষে ঘটি থেকে পড়ে যায় নি। তার মানে ওদের মনে নিশ্চয় ভালবাসা রয়ে গেছে, আবার একদিন ওদের মিল হবেই হবে।

সেদিন ফুলমণি কাজ করতে এলে সরমা যা-যা দেখেছে তার কাছে হুবহু বর্ণনা দিয়ে বললে, এমনি করে বুঝি তোমাদের দেশে বৌ ত্যাগ করে ?

ফুলমণি বলে, হাঁ দিদিমণি। যদি মেয়েটার দোষে হয়, তাহলে যে টাকাটা ওর বরকে বিয়ের সময় পণ দিতে হয়েছিল ফিরত দিতে হবে। মেয়েটা কিছুই পাবে না। শুধু উপস্থিত গ্রাম্যমুরুব্বিরা প্রত্যেকেই উভয় পক্ষ থেকে পাবে পাঁচটা করে সিকি।

কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদ দাবী করে, স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছে বলে সেক্ষেত্রে স্বামী তার দেওয়া পণ্যমূল্য আর ফেরত পাবে না।

বরং তাকেই দিতে হবে তার স্ত্রীকে একটা গাই গরু, এক বাণ্ডিল ধান, একখানা শাড়ী ও একটা কাঁসার বাটি !

সরমা এবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা, ওদের ছেলে-মেয়েদের এক্ষেত্রে কি হবে, কার কাছে থাকবে ?

যদি ওদের মায়ের কোন কলঙ্ক, বা দোষ না থাকে, বাপ যেখানে বিনা অপরাধে ত্যাগ করে স্ত্রীকে, সেখানে বাপকে তার প্রতি ছেলে-মেয়ের জন্যে মাকে এক বাণ্ডিল ধান, একটা কাঁসার বাটি, একটা শাড়ী এবং একটা গাইগরু দিতে হবে। এ ছাড়া যদি এমন কোন বাচ্চা থাকে যে তখনো বুকের দুধ খায়, তার জন্যে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ষোল মণ ধান ও একখানা শাড়ী পাবে তার মা। এই বাচ্চার অসুখ-বিসুখের জন্যে যা কিছু খরচ হয়েছে, সব দিতে হবে তার বাপকে !

ফুলমণির বয়েস হয়েছে। অনেকদিন ধরে সমাজের অনেক কিছু দেখেছে। তাই সরমার কৌতূহল সহজেই চরিতার্থ হয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে জানতে চায় তার কাছে, বিশেষ করে ওদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে।

সরমা বলে, যারা অপরের স্ত্রী নিয়ে পালায় কিংবা আত্মীয়স্বজন যাকে বিবাহ করা সামাজিক আইন বিরুদ্ধ তেমন মেয়েকে নিয়ে পালায়, সেক্ষেত্রে তোমাদের কি শাস্তির ব্যবস্থা ?

ফুলমণি বলে, এ সব ব্যাপারে সমাজ তাদের ডবল কন্যাপণ দিতে বাধ্য করে এবং যে পুরুষটা এই বে-আইনী কাজ করে তাকে নিজের গ্রামের মোড়লকে পাঁচ টাকা জরিমানা দিতে হয়। এটাকে তার মাথা বাঁচানো মূল্য বলে। তবে আত্মীয়স্বজনের ক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা। তাদের একেবারে সমাজচ্যুত করা হয়। যদি তারা পরস্পরকে ত্যাগ না করে, তাহলে সারাজীবন তারা ওই সমাজচ্যুত-ই থেকে যায়। কেউ তাদের হাতে জল খায় না, একসঙ্গে আহার করে না। তাদের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে অন্য কেউ বিয়ে-থাও দেয় না।

সরমা একটু হেসে বলে, তাহলে আত্মীয়স্বজনের ক্ষেত্রে শাস্তিটাই সব চেয়ে বেশী, কি বলো ফুলমণি ?

হাঁ দিদিমণি। তবে তারা যদি নিজের অপরাধ স্বীকার ক'রে একজন আর একজনকে ত্যাগ করে, তাহ'লে অবশ্য আবার তাদের সমাজে গ্রহণ করার আইন আছে। তবে তার জন্যে অনেক হাঙ্গামা, বিস্তর টাকা-পয়সাকড়ি খরচা ও বহু লোকজনকে খাওয়াতে হয়।

তাই নাকি ?

হাঁ দিদিমণি। ওদের ছ'পক্ষের বাপ-মাকে তাদের আবার জাতে তোলার জন্যে অনেক কিছু করতে হয়। যে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করতে হয় তার জন্যে অনেক টাকা লাগে!

আর যাদের তা করার ক্ষমতা নেই, তারা কি করবে?

তারা কি করবে জানি না। তবে তাদের কেউ আর ঘরে ঠাঁই দিতে পারবে না। যদি কোন বাপ-মা এই ভাবে আত্মীয়ের মধ্যে বে-আইনী করে বিয়ে-করা ছেলে-মেয়েকে ঘরে স্থান দেয়, তাদের সবংশে সমাজচ্যুত করা হয়। এবং সেই গ্রামবাসীদের পর্যন্ত শাসিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা কেউ কোনদিন ওই বংশের কারো সঙ্গে বিয়ে-থা না দেয় বা না করে।

সব শুনে সরমা মন্তব্য করে, তোমাদের জাতের মধ্যে সব চেয়ে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা দেখছি ছুটো ক্ষেত্রে। এক আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কোন যৌন সম্পর্ক ঘটলে, আর এক ভিন্ন জাতের সঙ্গে।

হাঁ দিদিমণি, সমাজচ্যুত করে ওই ছুটো ব্যাপারে।

একটু থেমে ফুলমণি তাকায় সরমার মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে, তোমাদের সমাজে এরকম হলে নিশ্চয়ই খুব শাস্তির ব্যবস্থা আছে?

এর কি জবাব দেবে খুঁজে পায় না সরমা। বার কতক ঢোঁক গিলে বলে শুধু, হ্যাঁ।

॥ ২৬ ॥

একদিন বেলা ঠাহর করতে পারেনি ঝাপড় মিঞা। সকাল থেকে আকাশে কেমন যেন একটা মেঘলা-মেঘলা ভাব, তাই আসতে একটু বিলম্ব হয়েছিল।

বাঁধানো ইঁদারাটার কাছে পৌঁছবার আগেই সরমা তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করেছিল। সে তখন বাগানের এক কোণে দাঁড়িয়ে একটা পেয়ারা গাছের ডাল থেকে ডাঁসা পেয়ারা ছিঁড়ে চিবোচ্ছিল। ছুটতে ছুটতে বুড়োর কাছে এগিয়ে এসে সরমা বললে, বুড়ো, আজ আর দরকার নেই।

যেন এমন অসম্ভব কথা কখনো শোনেনি, এইভাবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রশ্ন করলে, কাহেঁ?

কাহে আবার কি! বলে ডাঁসা পেয়ারাটায় জোরে একটা কামড় দিয়ে হেসে উঠতেই সরমা দেখে—ড়োর কপালের ওপর কয়েকটা মোটা মোটা শিরা যেন

ফুলে উঠেছে।

সরমার মুখের ওপর মুহূর্ত কয়েক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুড়ো বললে, কেন দিদিমণি, আজ মুরগী খাবে না?

খাব্যো না কোন্ দুঃখে! তোমাদের এখানে ওছাড়া আর কি ছাইপাঁশ মেলে যে মানুষ খাবে! এই একটা জিনিসই যেমন সস্তা তেমনি প্রচুর।

তবে?

তবে আর কি, আর একজন কেটে দিয়ে গেছে! তোমার দেরী দেখে ভাবলুম আজ বুঝি তুমি এলে না, তাই।

আর একজন কে কেটে দিয়েছে দিদিমণি! কো-উ-ন্?

সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর চোখের ভেতর থেকে তারা দুটো যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলো। যেন তাকে পেলে, কোমরের ওই ছুরিটা দিয়ে এখনি জবাই করে ফেলে।

বুড়োকে ক্ষেপাবার জন্যে সরমা তার নাম বললে না। কি জানি যদি তার সঙ্গে এখুনি গিয়ে ঝগড়া বাধায়! তাই মিথ্যা করে বললে, একটা ছোকরা এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, সে কেটে দিয়ে গেছে!

ও ছোকরার কি নাম?

অতশত জানি না। নাম নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো। তবে তোমার চেয়ে ও ভালো করে বানিয়ে দিয়েছে।

দেখি কেমন বানিয়েছে। তুমি নিয়ে এসো ত দিদিমণি মাংসর টুকরো-গুলো।

সরমা রগড় করার জন্যে বলে, সে কি এখনো আছে, রান্না হচ্ছে।

বুড়ো এবার দাড়িটা হাত দিয়ে মুচড়ে বললে, আমার চেয়ে ভাল কাটনে-ওলা কোন্ শালা এখানে আছে, শুনি!

চারটে পয়সা ওই বুড়োর কাছে চারটে কলিজার সমান, তা জানতো সরমা। সে যে তারই লোভে এই দীর্ঘ পথ ওই লুব্ধ দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে আসে এই কদিনেই তা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এ কাজ আর কেউ করলে যে তার ওপর এমন হিংস্র হয়ে উঠবে ভাবতে পারেনি। অভাব যেমন তার আছে, তেমনি আরো দশজনেরও থাকতে পারে। সরমা তাই কণ্ঠে গাম্ভীর্য এনে বলে, মুরগী কাটবে, তার মধ্যে আবার ভালমন্দ কি আছে জানি না। বরং তোমার চেয়ে অনেক জলদি বানিয়ে দিয়ে গেছে সে ছোকরা।

ইয়ে কাম ছোকরা লোক কেয়া সম্‌ঝাতা হ্যায়!

রেগে ওঠে সরমা, তুমি ঘাটের মড়া, তুমি-ই বোঝ যত কাম, আর কেউ কিছু বোঝে না!

আলবৎ! আসলি কামমে ত থোড়াবহুত্‌ দেরী হোগা জরুর! নেহি ত উস্‌কা পুরা মজা, পুরা রস নেহি আতি দিদিমণি! সবুরে মেওয়া ফলে জানো ত দিদিমণি!

একটা মুরগী ত করবে জবাই। তার মধ্যে আসলি-নকলি কি, আর পুরো মজা, পুরো রসেরই বা কি আছে বুঝি না। আমাদের কাছে সময়টার মূল্যই বেশী! তোমার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বানিয়ে দিয়েছে সে ছোকরা, তাই বললুম।

যো কাম্‌কো যো দস্তুর দিদিমণি! ফাঁকির কাম আমার কাছে পাবে না। আগে কাম পিছু সেলাম! ছেলেবেলা থেকে এইটাই শুধু শিখেছি!

রেগে গেলে বুড়োর মুখ দিয়ে হিন্দী উর্দু বাত আপনা-আপনি বেরিয়ে পড়ে: নইলে বেশ ভাল বাংলাতেই কথা বলে।

সরমা অর্ধভুক্ত পেয়ারাতে আর একটা কামড় দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওর শেষ কথাটা শুনে খাওয়া ভুলে সজোরে হেসে উঠলো।

তুমি হাসছো কেন দিদিমণি, ভাবছো বুড়োর মাথা খারাপ, যা-তা বকছে। ফাল্‌তু কথা বলছে। তুমি ছেলেমানুষ, ছোকরী, তাই-জানো না, এ-কামে কত রস! আসুক সে ছোকরা, আমার সঙ্গে পাল্লা দিক, কোন সমঝদার আদ্‌মিকে তুমি ডাকো, সে বিচার করুক কার কাম আচ্ছা!

বলতে বলতে পাকা দাড়িটায় আর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বক্রোক্তি করে বুড়ো, দু'দিনকা যোগী, উয়ো কেয়া জানেগা ইয়ে কাম্‌কো!

তারপর গলার স্বরটা একটু নামিয়ে এনে সরমাকে বলে, জানি, ছোকরী লোক ত সব নওজোয়ান আদমির কাম পছন্দ করে। কিন্তু যে সমঝদার একবার স্বাদ পেয়েছে এই বুড়োর কামের, সে আর কাউকে চাইবে না। আমার নসিব খারাপ দিদিমণি, তাই তোমাকে খুশি করতে পারিনি।

সরমা বেকুব বনে যায়। বলে, আরে, তুমি ত রোজ কাটো, একটা মুরগী আজ অন্য লোক কেটে দিয়েছে, তার জন্যে তুমি এত বকবক করছো কেন?

বুড়ো তখনো নিজের স্বপ্নলোকে বিচরণ করে। বলে, জানো, কত ভারি ভারি আদ্‌মি, আমীর জমিনদার লোক সব আমায় বড় বড় সার্টিফিকেট দিয়েছে?

কত ইনাম, বকশিশ পেয়েছি একাজের জন্যে তার হিসেব নেই! আজো আমার ঘরে গেলে তোমায় দেখাতে পারি দু-চারটে!

আ মলো যা। বকেই চলেছে। কে তোমার সার্টিফিকেট দেখতে চায়। যাও ততক্ষণ অন্য বাড়ী কাজ করোগে! বলে হাতের পেয়ারাটায় যে অবশিষ্টাংশটুকু ছিল, খপ্ করে গালের মধ্যে পুরে দিলে সরমা।

এই সরি, সরি, কোথায় গেলি রে! সরমার মায়ের ডাক বাড়ীর ভেতর থেকে কানে আসতেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, এই যে এখানে, যাচ্ছি মা!

বুড়োর বুঝি তখনো সব কথা বলা হয়নি। তাই সরমাকে উদ্দেশ করে বলে, মুরগী বানানো এত সহজ কাম নয় দিদিমণি। মোরগ-মসল্লা, রোস্ট, কাবাব, কোর্মা, কারী, কাট্লেট, বিড়িয়ানী—সব একরকমের কাম নয়। আলাদা আলাদা বানাবার কায়দা আছে। দশবছরের লেড়কা থেকে আজ চার কুড়ি ওমর হলো দিদিমণি, এই হাতে কত বানিয়েছি তার ঠিক নেই। ওসব রহিস্ আদমি, সমঝদার আদমি ত সব গুজার গেয়ি—তাই আজ এমনি করে লোকের বাড়ী গিয়ে কামের তাল্লাস করতে হচ্ছে আমায়। নইলে একদিন ছিল, লোকে ছুটতো আমার ঘরে, আমাকে কে আগে কামে লাগাবে, তার জন্যে!

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি! সরমার মনের অবস্থা এখন প্রা[illegible]সেইরকম। মনে মনে সে বলে, কে জানতো এত রস, এত মজা মুরগী জবাইয়ের মধ্যে আছে, তাহলে যেচে বুড়োকে এইভাবে কে ক্ষেপাতে যেতো! তাই হেসে জবাব দেয় সে, আমরা কেউ এ রসের রসিক নই! মুরগী আমরা খাই না। নেহাত অসুখের জন্যে ডাক্তারবাবু খেতে বলেছে বলেই আমরা খাচ্ছি। কাজেই এত কথা বলে আর মিছিমিছি দম নষ্ট না করে তুমি অন্য কাজে চলে যাও! তোমার চারটে পয়সা হয়ত আমি আজ লোকসান করেছি, কিন্তু ভেবে দেখো আর একজন গরীব লোক, সে তোমার দেশেরই আদমি ত, সেই পয়সাটা পেয়েছে!

এ চার পয়সার লাভ-লোকসানের বাত নেহি দিদিমণি! এ ইজ্জত কি বাত, এ সব ত আমার জমানা আছে! এদিকের বাংলায় যে কেউ বাবু আসে সকলের মুরগী আমি বানাই। আজ তিরিশ চাল্লিশ বছর ত এইভাবে চলছে! আমার এক্তিয়ারমে যদি আর কেউ দুশমন্ ঢুকবে তাহলে আমাকে লোকে 'থুক্' দেবে! আমি মরদ্‌কি বাচ্ছা, সে অপমান কেন সহ্য করবো যতদিন হিম্মত আছে!

ঠিক কথা! তুমি মরদ কি বাচ্চা বটে। হলোই বা চারকুড়ি বছর বয়েস! ঠোঁটের কোণে হাসি টিপে যে সরমা তাকে ব্যঙ্গ করে, বুঝতে পারে না বুড়ো। তাই আরো উৎসাহের সঙ্গে বলে, বয়সে কি এসে যায় দিদিমণি! যে মরদ সে মরদ-ই। যেদিন সে মাটিতে কবরে শোবে, সেদিনও সে পুরুষের ইজ্জত নিয়ে যাবে!

ঠিক বলেছো। বলে সরমা হাসি চেপে নিতে, বুড়ো লাঠিটা হাতে নিয়ে পিছন ফিরলো।

ফটকটা খুলে সবে বাইরে বেরুতে যাবে এমন সময় পিছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে সরমা তাকে ডাকলে, এই বুড়ো, বুড়ো—

হাঁ দিদিমণি! বলে ফিরে দাঁড়াতেই সরমা বললে, দেখো শনিবার দিন তুমি এসো না। আমরা কেউ বাসায় থাকবো না। পিক্‌নিক করতে চলে যাবো হাতীঝরণায়।

সে ত এখান থেকে অনেক দূর দিদিমণি! গরুর গাড়ী ত লাগবে।

হাঁ, তা জানি। দু'খানা গরুর গাড়ী করেই আমরা সবাই যাবো। স্টেশনের কাছে লাল কুঠিতে যে বাবুরা এসেছেন তাঁদের সঙ্গে যাবো। গরুর গাড়ী তাঁরাই ঠিক করবেন।

বুড়ো আপন মনে গজ গজ করতে করতে চলে যায়।

সরমা ওর কথা কিছু বুঝতে না পারলেও, সে যে খুব চটেছে এটা অনুমান করতে পারে।

শনিবার দিন সকালে লালকুঠির ছোকরা চাকরটা এসে বললে, দিদিমণি, গাড়ী এনেছি!

সরমা বলে, তোমার বাবুরা কৈ, এসেছেন?

না, ভৃত্যটি বলে, ওঁরা যাবার সময় উঠবেন। ওই পথ দিয়েই ত গাড়ী যাবে, তাই আপনাদের আগে নিতে এসেছি।

সরমা বাবা-মাকে প্রস্তুত হতে বলে একটা শতরঞ্চি ভৃত্যটির হাতে দিয়ে বলে, এটা নিয়ে চলো তো, গাড়ীতে বিছোতে হবে।

বাইরে এসে অবাক হয়ে যায় সরমা, দেখে বুড়ো ঝাপড় মিঞা ছপ্‌টি হাতে নিয়ে গরুর মুখের দড়ি ধরে সামনের গাড়ীটার ওপর বসে আছে। আর একটা গাড়ীর চালক একটি দশ বারো বছরের বালক!

একি বুড়ো, তুমি যে গাড়ীতে !

এ আমার গাড়ী দিদিমণি। তোমার মুখ থেকে যখন শুনলুম লালকুঠির বাবুরা গাড়ী ঠিক করবে, তখন আমি গিয়ে ওদের সঙ্গে ভাড়া ঠিক করে ফেললুম।

এ দু'টো গাড়ীই কি তোমার নাকি ?

হ্যাঁ।—বলতে বলতে থেমে গেল।

বুড়ো তার গাড়ীর একটা বলদকে কিছুতেই পিছনের দিকে হটাতে পারছিল না। যত ছপটি মারে, হেট্ হেট্ করে হাতের দড়ি টানে, পায়ের গোড়ালি দিয়ে বলদটার পেটে গোঁত্তা দেয়, তত সে যায় বিগড়ে। বেঁকে মুখটা ঘুরিয়ে সারাদেহটা গাড়ীর বাইরে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে. যেন সে যেতে নারাজ।

বেশ কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও বুড়ো যখন তাকে বাগ মানাতে পারে না, তখন অপর গাড়ীর সেই ক্ষুদে চালকটি থপ করে তার গাড়ীর ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লো। তারপর ছপটিটা হাতে করে এগিয়ে এসে বললে, সরে যান মাইজি, এ শালা বহুত বদমাইশি করছে, একে আগে সামাল দিই।

সরমা ভীতকণ্ঠে বলে, এই রকম দুষ্ট গরুর গাড়ী আনলি কেন ? শেষে যদি উল্টে দেয় তখন, না বাবা, আমি এ গাড়ীতে উঠছি না !

না—না—কিছু ভয় নেই তোমার দিদিমণি। এখনি শালাকে জব্দ করে দিচ্ছি। বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাচ্ছাটা বলদের লেজটা ধরে সজোরে মুচড়ে, ঘা কতক চাবুক যেই তার পিঠে কষিয়ে দিলে, অমনি সুড়সুড় করে বলদটা যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়ালো।

বুড়ো বললে, দেখলে ত দিদিমণি। নাও এবার তোমার বিছানা বিছাও গাড়ীতে।

না বাবা। তোমার গাড়ীতে আমি উঠছি না। বলে সেই ছোট ছেলেটার গাড়ীর মধ্যে শতরঞ্চিটা মেলে দিলে। তারপর বেরিয়ে এসে বললে, এ গাড়ীর গাড়োয়ান কই, কে চালাবে ?

কেন, ও চালাবে, ও আমার বেটা ! বলে সেই ছোট ছেলেটাকে সগর্বে দেখায় ঝাপড় মিঞা।

ওই অতটুকু ছেলে পারবে, এত বড় বড় দু'টো বলদকে সামলাতে ! বলো কি ?

বিস্ময় উপচে পড়ে সরমার কণ্ঠে।

ও ত আমার ছেলে। 'বাপ কো বেটা সিপাই কী ঘোড়া, কুছ নেহি ত থোড়া থোড়া'!

এবার বুড়োর গাড়ীটা দেখিয়ে সরমা প্রশ্ন করে, তোমার ওই গাড়ীটা কে চালাবে?

আমার গাড়ী, আমি চালাবো, আবার কে?

সরমার যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। বলে, শুনেছি হাতী ঝরণা অনেক দূরপথ, তুমি বুড়ো মানুষ কি করে চালাবে?

জিন্দিগী ভোর ত এই কাম করছি দিদিমণি!

তুমি কত কাম করো? এই ত সেদিন বললে, বাবুর্চির কাজ করেছ ছেলেবেলা থেকে, মুরগী তোমার মত কেউ বানাতে পারে না!

হাঁ ওভি ঠিক, আবার এভি ঠিক! এ গাড়ী ত আমি হাতে করে বানিয়েছি, অন্য কাউকে এগাড়ী চালাতে দিলে সে ত সব খারাপ করে দেবে, আমার মত দরদ তার থাকবে কেন এ গাড়ীর ওপর। তাই খোদা মেহেরবাণী করে যতদিন হাতে শক্তি দিয়েছে, নিজের কাজ নিজেই করি দিদিমণি! 'আমি মরদকা বাচ্ছা, অন্যের কাছে কেন মাথা নীচু করবো'?

ঠিক, বলে কণ্ঠের বিদ্রূপ চেপে নেয় সরমা। মুখে পৌরুষের বড়াই যতই করুক বুড়ো আসলে ওটা যে তার পয়সার লোভ, এটা বুঝতে তার দেরী হয় না। একটা পয়সা যেন তার বুকের এক ফোঁটা রক্ত! তাই যতক্ষণ পারে, দেঁড়েমুষে আদায় করে নেয় লোকের কাছ থেকে! অন্য কাউকে ভাগ দিতে গেলে, ওর বুকটা চড়চড করে! সে স্বার্থপর, কৃপণ, অর্থগৃধ্নু সরমার এই দৃঢ় বিশ্বাস! নইলে সত্যি সত্যি এই বয়সে কি কেউ এত খাটতে পারে!

গরুর গাড়ী করে যেতে যেতে সরমা তার মা বাবাকে এই কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করে!

ওর মা বলেন, যাই হোক, ও ত চুরিচামারি করছে না, গতর খাটিয়ে 'উপায়' করছে! এর জন্যে ওকে বাহাদুরী দেওয়া উচিত. আমাদের দেশের লোক হলে এই বয়েসে কি করতো ভেবে দেখদিকি!

সরমার বাবা নিঃশব্দে সিগারেট টানছিলেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন. আমিও ঠিক ওই কথাটাই চিন্তা করছি, ভগবান এদের দেহ কি দিয়ে তৈরী করেছেন!

ভোরে কাজ সেরে প্রতিদিন. যেমন চলে যায় ফুলমণি সেদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি. তাই সকালে আবার তাকে লোহার ফটকটা টেনে খুলে দ্রুতপদে ভেতরে আসতে দেখে সরমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, কি গো ফুলমণি, কি খবর, আবার এলে যে!

তোমার কাছেই এসেছি দিদিমণি!

কেনগো! বলতে বলতে যেমন তার সামনে এসে দাঁড়ালো, ফুলমণি বললে, একটা জিনিস তোমাকে দেখাবার জন্যে ডাকতে এসেছি দিদিমণি!

কি জিনিস রে, কৌতূহলী হয়ে ওঠে সরমা।

যশোমণির বেটা মংরু পালিয়েছিল ওর এক আপনার লোকের মেয়েকে নিয়ে, এতদিন ওকে দেশেঘাটে কেউ ঢুকতে দেয়নি, একঘরে করে রেখেছিল, আজ মংরুটা প্রায়শ্চিত্ত করে ঘরে আসবে, তাই তোমাকে দেখাবার জন্যে ডাকতে এসেছি।

বেশ করেছিস, দাঁড়া মাকে বলে, এখুনি আসছি।

হঁ, তুমি যখন ভালবাস আমাদের জাতের সব খবর জানতে, তখন ভাবনুম এতবড একটা কাণ্ড হচ্ছে, কত লোকজন এসেছে, তোমাকে ডেকে আনি দেখাবার জন্যে। একাজে অনেক টাকা পয়সা খরচা লাগে, অনেক লোকজন খাওয়াতে হয় তাই ইচ্ছা থাকলেও অনেকে, অর্থাভাবে শুধু সমাজে ফিরে আসতে পারে না!

চটিটা পায়ে গলিয়ে, স্কার্ফটা গায়ে জড়িয়ে সরমা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। প্রায়শ্চিত্ত করতে একবার সে দেখেছিল রেখার দিদিমাকে, তাদের পাশের বাড়ীতে ভাড়া থাকতো তারা। বুড়ী যখন মর-মর, তখন নাপিত ডাকিয়ে মাথাটা কামিয়ে পুরোহিত অনেক মন্ত্র পড়ে তার ইহজন্মের সব পাপ স্খালন করে দিয়ে দক্ষিণা নিয়ে চলে যাবার পর বুড়ী মারা গেল।

প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে এর বেশী আর কোন ধারণা ছিল না সরমার। তাই এদেরটা চোখে দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না।

ফুলমণি বলে, একটু হাঁটতে হবে কিন্তু তোমায় দিদিমণি, লোকজন সব আমাদের গাঁয়ের শেষে, ওই নদীটার ধারে অপেক্ষা করছে।

ওঃ সে আর এমন কি বেশীদূর, আমরা ত প্রায়ই বিকেলে নদীর দিকে বেড়াতে যাই।

সত্যি, সরমা সেখানে গিয়ে দেখে অনেক লোক জন! ফুলমণিকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করে, এরা সব কে?

ফুলমণি বলে, আমাদের জাতের লোক যেসব গাঁয়ে আছে, সেইসব দেশের যারা মাতব্বর ব্যক্তি সবাই এসেছে, সবাই ওর সঙ্গে আজ খানাপিনা করবে তবে ত ও জাতে উঠবে।

তাই নাকি!

ওই দেখো না, আসছে মংরু। একঘটি জল হাতে নিয়ে।

ওঃ, ওই ছেলেটার নাম মংরু! ওর ত বয়েস বেশী নয়, চব্বিশ পঁচিশের বেশী হবে বলে ত মনে হচ্ছে না!

হাঁ, আমার বড় ব্যেটার সঙ্গে ও খেলা করতো।

সরমা দেখে চাদরের মত নতুন এক টুকরো কাপড় মংরুর গলায় জড়ানো। দু'হাতের তালুর ওপর জলভর্তি ঘটিটা রেখে, উঁচুতে হাত দুটে তুলে আগে সে সিং বোঙার কাছে কি প্রার্থনা করলে করুণ মুখে, তখন সেইসব মাতব্বরদের মধ্যে থেকে একজন খুব বুড়োগোছের লোক, উপস্থিত সব বাইরের লোকদের এবং গ্রামের মাথাওলা ব্যক্তিদের উদ্দেশ করে বললে, এসো ভাই, আমরা সকলে ওর আত্মার সান্ত্বনার জন্যে প্রার্থনা করি! এখন ওর সবচেয়ে প্রয়োজন আমাদের সকলের করুণা।

এই বলে সেই বৃদ্ধ লোকটি সকলকে নিয়ে এগিয়ে গেল মংরুর কাছে।

যখন তারা সকলে মংরুর কাছে এসে দাঁড়ালো, তখন সে 'সিং বোঙা'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাদের সকলের দিকে ফিরে বললে, হে ঈশ্বর, আমি সাংঘাতিক পাপ কাজ করেছি, তার জন্যে আমি সকলের সামনে আমার দোষ স্বীকার করছি, আমায় দয়া করো।

এইবার সেই বুড়ো লোকটি সেই জলের ঘটিটা মংরুর হাত থেকে নিয়ে 'সিং বোঙা'র কাছে প্রার্থনা ক'রে মংরুকে বললে, তুমি তোমার পাপ সকলের সামনে স্বীকার করলে বলে আমরা সকলে তোমার এই পাপের বোঝা আমাদের ওপর তুলে নিলুম। এই বলে ঘটি থেকে একটু জল হাতে ঢেলে মুখের ওপর বুলিয়ে সেই ঘটিটা আর একজনের হাতে দিলে।

সেও ঠিক তেমনিভাবে একটু জল ঘটি থেকে নিয়ে নিজের মুখে বুলিয়ে

আবার পরবর্তী লোকটিকে দিলে।

এমনি করে একে একে সব মাতব্বর ব্যক্তিদের মুখ ধোয়া যখন শেষ হলো, তখন তারা সবাই দল বেঁধে গ্রামের মধ্যে ঢুকলো।

এবার মংরু তার বাড়ীর উঠোনে তাদের নিয়ে গিয়ে একে একে সেই মুরুব্বিদের পা ধুইয়ে দিলে।

তারপর উঠোনে শালপাতা পেতে সকলে যখন সারি বেঁধে খেতে বসে গেল, তখন মংরু আগে ভাত এনে সকলের পাতে পরিবেশন করলে; তারপর শুয়ার ও খাসির মাংস; তারপর জল দিলে প্রত্যেককে। এতেই কিন্তু শেষ হলো না।

এবার প্রত্যেক পরগণার মাতব্বরদের পাতে পাঁচটা করে টাকা দিলে এবং প্রত্যেক গাঁয়ের সর্দারকে একটা করে টাকা। এদের সকলকে দেওয়া হয়ে গেলে তারপর মংরু নিজের গাঁয়ের সর্দারের পাতে পাঁচ টাকা রাখলে।

এতক্ষণ তারা হাত গুটিয়ে বসেছিল এইবার খাওয়া শুরু করলে এবং ভোজন পর্ব শেষ হতে সেই বুড়োলোকটি গাঁয়ের লোকদের বললে, আজ থেকে আমরা এই মংরুকে আমাদের নিজের লোক বলে আবার সমাজে গ্রহণ করলুম। যত কিছু কলঙ্ক ও পাপ ওর ছিল আজ থেকে সব দূর হয়ে গেল। এখন থেকে আমরা ওর সঙ্গে একত্র পান ভোজন করবো। ওর সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়ের বিয়ে দেবো এবং এই ব্যাপার নিয়ে যদি কেউ ওকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, বা অন্য কোথাও আলাপ-আলোচনা করে, তাহলে তাকে একশো টাকা সামাজিক জরিমানা দিতে হবে, আর একশো জনকে ভাত খাওয়াতে হবে।

এই বলতে বলতে তারা সকলে উঠে পড়লো এবং সেখানে একটা বড় গর্ত খুঁড়ে, কতকগুলো গোবরের গোলা হাতে পাকিয়ে তার মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে একখণ্ড পাথর পুঁতে দিলে তার ওপর।

এবার সকলে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলে।

সরমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলে। তার বুঝতে এতটুকু দেরী হলো না, যে ওদের মত গরীব লোকের পক্ষে এত খরচ পত্তর করা সহজসাধ্য নয়। তাই এটা ওদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তির শামিল!

॥ ২৮ ॥

একদিন সকালে কাজে আসতে ফুলমণির বিলম্ব দেখে সরমাকে ওর মা বলেন, হাঁরে সরো, একটু খোঁজ নিয়ে আসবি দেরী হচ্ছে কেন ?

আজ অনেক দূরে বেড়াতে গিয়েছিলুম, পা ব্যথা করছে মা, তুমি একটু মালীকে যেতে বলো না।

সকালে গাছে জল দিচ্ছে, বিরক্ত হবে না ত ?

সরমা জবাব দেয়, বরং মনে মনে তোমার ওপর খুশি-ই হবে মা, তবু ত জল তোলার হাত থেকে এইটুকু সময়ের জন্যে রেহাই পেলে।

পরের খুঁত কাটা তোর স্বভাব। কেন, রোজই ত দেখি ভোর থেকে উঠে ওই বড় ইঁদারাটা থেকে টেনে টেনে জল তুলে গাছে দেয়। এ কি সহজ কাজ! আমাদের দেশের কোন জন মজুর হলে কি করতো বল দেখি!

কি আবার করতো। ও ভারী ত শক্ত কাজ, আমিও পারি। যেমন গভীর ইঁদারা, তেমনি ব্যবস্থারও ত্রুটি নেই। ওই 'লাঠাটা' তুমি একদিনও টেনে দেখোনি তাই বলছো। আমিও আগে ভেবেছিলুম হয়ত ওর খুব কষ্ট হয়। তারপর একদিন ওই দড়িটা টেনে দেখি খুব সহজ। ওই লম্বা বাঁশটার সামনে যেমন দড়ির সঙ্গে বড় বালতি বাঁধা, তেমনি পিছনে পাথর ও ইঁটের ওজন দিয়ে ওকে এমনভাবে 'ব্যালান্স' করে রেখেছে যে একটুও পরিশ্রম লাগে না।

তা ওই বড় বড় ঝারি করে কুয়োতলা থেকে জল টেনে টেনে বাগানে নিয়ে যেতেও কি কোন কষ্ট হয় না ওর বলতে চাস!

না। তা বলতে চাই না। তবে এখন আমরা রয়েছি বলে এত কাজে মনোযোগ, নইলে দেখছো না আশেপাশের বাগানগুলো, কার দায় পড়েছে ভোর থেকে উঠে এই শীতে জল টানবার। আমরা ওর মনিবের কাছে যদি বলে দিই।

আচ্ছা আচ্ছা, মিছিমিছি একটা মানুষের নামে দোষ দিতে হবে না।

আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তুমি বাবাকে জিজ্ঞেস করো।

কেন আমার কি চোখ নেই, দেখছি না। বাজে কথা বলিস নি। বলতে বলতে তিনি খিড়কীর দরজা দিয়ে বাগানের দিকে চলে গেলেন।

কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে হলো না। ফুলমণিকে দ্রুত পদে এগিয়ে আসতে দেখলেন।

কোথায় যাচ্ছিস মা? বলতে বলতে ফুলমণি কাছে আসতেই সরমার মা বলেন, তোর দেরী হচ্ছে দেখে, একবার মালীকে পাঠাবো ভাবছিলুম।

আমার বড় মেয়েটার একটা বেটি হয়েছে মা। তাই সব গোছগাছ করে আসতে একটু দেরী হয়ে গেল।

কখন হয়েছে রে?

এই ভোর রাতে মা!

সঙ্গে সঙ্গে এক পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর বললেন, আঁতুড় ছোঁয়া কাপড়ে আমার বাসন মাজতে হবে না মা, আজ থাক! আমরা মায়ে ঝিয়ে এবেলা চালিয়ে নেবোখন।

জিব কেটে ফুলমণি বলে, মা, স্নান করে কাপড় কেচে তবে আমি এসেছি তোমার কাজ করতে। তোমরা ভদ্দর আদমি, তোমাদের লোকের কাম আমি এত দিন করছি—আমি কি জানি না মা স্নান না করে কোন কিছু ছুঁতে নেই।

তা হলে চান করে এসেছিস?

হাঁ মা। তোমার সঙ্গে ঝুট্ বলবো কেন? তুমি ত আমাকে ছুটিই দিচ্ছ এখন, তবু আমি একথা বলছি কেন?

তোদের সব একঘর একদোর, ছোঁয়া-ছুঁয়ি, লেপ্‌টা লেপ্‌টি, এত মানামানি কি তোরা জানিস?

কেন জানবো না মা! আমরা জংলী আদমি কিন্তু তোমাদের মত আমাদেরও সব নিয়ম কানুন আছে?

তাই নাকি? বলে একটু ঢোক গিলে সরমার মা প্রশ্ন করলেন, তা প্রসব ও তুই করিয়েছিস্?

নেহি মা। আমি বোকা আদ্‌মি, আমি ও সবের কি জানি। তোমাদের মত আমাদেরও মেয়েলোক আছে, যে ওই কাম করে।

তাই নাকি, তোদেরও ধাই আছে?

হাঁ মা। সেই সব কাজ করে, তবু আমাদের আইনটা বড় কড়া। আমার ঘরে মেয়ে হয়েছে বলে তিনদিন গাঁয়ের কেউ আমার বাড়ীতে জল পর্যন্ত খাবে না। এমন কি এ গাঁয়ে কোন বোঙার পুজো বা কোন শুভ কাজও হবে না, যতখন না আমরা কামিয়ে পরিষ্কার হচ্ছি। কারুর ঘরে ছেলেপিলে হলে সারা গাঁয়ের শুভ অশৌচ হয়। বড় ঝামেলা আমাদের মা। তাই তিনদিনের

দিন কেবল আমাদের কামালেই চলবে না, গাঁয়ের সব লোককে ডাকতে হবে বাড়ীতে। গাঁয়ের পুরুত থেকে শুরু করে সমাজের কর্তাব্যক্তি মাতব্বর সবাইকে ত বটেই! তোমাদের ত খুব সহজ ব্যাপার মা। এখানে অনেক লোকের বাচ্চা হতে দেখেছি। মেয়ে হলে একুশ দিন আঁতুড়, আর ছেলে হলে তিরিশ দিন। বাচ্চা ও মাকে একটু আলাদা ঘরে রাখে, ব্যস্। শেষে নাপিত ডেকে বাচ্চার মায়ের নখ্ কেটে স্নান করে লাল পাড় শাড়ী পরলেই পরিষ্কার। তারপর অবশ্য পুরুত ডেকে সামান্য একটু কি বলে যেন মা, হাঁ হাঁ মনে পড়েছে, ষষ্ঠীর পুজো দিলেই হয়ে গেল। আমাদের কিন্তু বড় ঝামেলা মা।

তাই নাকি, কি রকম শুনি?

ও মা, সে অনেক ব্যাপার। নাপিত এসে সকলের প্রথমে কামাবে গাঁয়ের পুরোহিতকে, তারপর ক্রমশঃ পদমর্যাদা হিসাবে বড় থেকে ছোটকে কামিয়ে তারপর গাঁয়ের লোকদের কামাবে! এবং সব শেষে কামায় বাচ্চার বাপকে। বাপের হয়ে গেলে তখন নাপিত ডাক দেয় বাচ্চাটাকে কামাবার জন্যে। যে মেয়েলোকটা ধাইয়ের কাজ করেছে সে তখন বাচ্চাটাকে কোলে করে ঘরের বাইরে গিয়ে বসে দু'হাতে দু'টো শাল পাতার দোনা নিয়ে। একটা দোনায় থাকবে জল, আর একটা শূন্য। নাপিত বাচ্চাটার মাথায় এই দোনার জল মাখিয়ে তাকে নেড়া করে দেয়। এবার সেই চুলগুলো ওই খালি পাতার দোনায় তুলে নিয়ে ধাই দু' পাক সুতো বাঁধে সেই তীরটাতে, যার ফলা দিয়ে সে নাড়ী কেটেছিল বাচ্চাটার।

এখন ওই বাচ্চার বাপ তেল ঢেলে দেয় সেই পাতার দোনায়। তারপর সেই সব গাঁয়ের লোকদের নিয়ে স্নান করতে যায় ঘাটে। আবার ওরা ফিরে এলে ধাই তখন তেল, হলুদ, ও সেই তীরে বাঁধা সুতো দু'টো নিয়ে গাঁয়ের সব বৌ ঝিদের সঙ্গে স্নান করতে যাবে। প্রথমে ঘাটে গিয়ে ধাই সেই চুলগুলোর সঙ্গে একগাছা সুতো দোনায় করে ভাসিয়ে দেয় জলে। তারপর সকলের স্নান হয়ে গেলে সেই তীর ও বাকী সুতোটা ধাই সেখানের জলে ধুয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে এবং বাড়ীতে এসে ওই সুতোটা হলুদের জলে ছুপিয়ে সেই বাচ্চাটার কোমরে দেয় বেঁধে। এরপর প্রসূতি চালাঘরের ছাঁচের নীচে এসে বসে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে তবে শুদ্ধ হয়।

এরপর আরো অনেক আছে মা। ধাই খানিকটা গোবর ও জল নিয়ে

সেইখানে ছাঁচতলায় বসে গুলে এর কিছুটা গোবর জল ফোঁটা ফোঁটা করে ফেলে ছেলের মায়ের মাথায়, তখন বাঁ হাতে করে সেই জল ধরে প্রসূতি খানিকটা বাচ্ছার মাথায় চাপড়ায় এবং একটুখানি গোবরজল নিজে খেয়ে, বাচ্ছাটাকে নিয়ে ঘরে উঠে গিয়ে একটা খাটিয়ায় শুইয়ে দেয়।

এইবার ধাই তিনটে পাতার দোনায় আটার সঙ্গে একটু জল মিশিয়ে প্রথম দোনাটার সব জলটা ছিটিয়ে দেয় বাচ্ছাটার খাটিয়ার চারটে পায়ায়। তারপর সেই দোনাটা ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় দোনাটা নিয়ে প্রথম গাঁয়ের পুরোহিতকে, তারপর মর্যাদা ক্রমে সব মাতব্বর ব্যক্তিদের বুকে ছিটিয়ে দিয়ে সব শেষে দেয় গাঁয়ের সব লোকদের। এরপর তৃতীয় দোনাটার আটা-জল নিয়ে ঠিক তেমনি ভাবেই প্রথমে পুরোহিতের স্ত্রী এবং মর্যাদাক্রমে আর সব স্ত্রীলোকদের বুকে ছিটিয়ে দিয়ে সব শেষে গাঁয়ের মেয়েদের দেয়। এবার বাচ্ছার মা এবং বাবা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে, কি নাম রাখবে ছেলের? যদি ব্যাটাছেলে হয় তাহলে বাপের দিকের নাম রাখে, আর মেয়ে হলে মায়ের দিকের নাম।

সরমার মা এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিলেন, এবার প্রশ্ন করেন, সে কি রকম রে, বাপ মায়ের দিকের নাম!

হাঁ, মা। এটাই আমাদের নিয়ম। সব প্রথম যে সন্তান জন্মায়, যদি ছেলে হয় তার নাম রাখতে হবে বাপের বাপের নামে, আর মেয়ে হলে বাপের মায়ের নামে।

তার মানে হয় ঠাকুরদা নয়ত ঠাকুরমার নাম হবে, এই ত?

হাঁ মা। আবার দ্বিতীয় সন্তানের বেলা, তেমনি ছেলে যদি হয়ত মায়ের বাপের নাম পাবে, আর মেয়ে হলে, মায়ের মায়ের নাম। এরপর আবার যে সব ছেলে মেয়েরা জন্মাবে তাদেরও নাম ঠিক এইভাবে বাপ ও মায়ের ভাই ও বোনের দিক ঘেঁষে হয়।

বাইরে বেরিয়ে এসে এবার ধাই যে নামটা ঠিক হয়, সেটা উপস্থিত গ্রামবাসীদের সকলকে জানিয়ে দেয়, বলে এবার থেকে যেন সেই নামে তারা ডাকে নবজাতককে। ছেলে হলে বলে, যখন শিকার বা জন্তুজানোয়ার তাড়াতে যাবে তখন যেন তারা তাকে ওই নাম ধরে ডেকে নিয়ে যায়। আর মেয়ের বেলা বলে, যখন জল আনতে যাবে তখন যেন পল্লীবাসিনীরা তাকে ওই নামে ডেকে জলকে নিয়ে যায়।

এবার গৃহস্থরা পাতার দোনায় করে একটু দুধ ও তার সঙ্গে দু'একটা

নিমপাতা উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে ঠিক আগের মতই মর্যাদা ক্রমে পরিবেশন করে।

এতকাণ্ডের পর তবে আমাদের অশুচিতা যায় মা! অবশ্য আর একটু কাজ এখনো বাকী রইলো।

আরো বাকী রইলো? সেটা কি শুনি? সরমার মা প্রশ্ন করেন!

সে এমন বেশী কিছু নয় মা। এর পাঁচ দিন পরে আবার ওই ধাই এবং নাপিত এসে কেবল মাত্র সেই বাচ্চার মাথাটা কামিয়ে দিয়ে যায়। ব্যস্, তাহলেই সব শেষ।

সরমার মা এবার জিজ্ঞেস করলেন, তা এর জন্যে তোদের ধাইকে ত টাকা পয়সা দিতে হয়?

হাঁ মা, তা বেশ কিছু দিতে হয়। ছেলে হলে, একখানা কাপড়, এক মণ ধান আর একটা রূপোর বালা নাড়ীকাটার জন্যে। অবশ্য মেয়ের বেলা কম। একখানা শাড়ী ছ'হাত, আধমণ ধান এবং একটা বালা! বলে একটু থেমে সে প্রশ্ন করে, তোমাদের ঘরেও ত দিতে হয় অনেক কিছু ধাইকে মা!

হাঁ এককালে হতো। এখন সব হাসপাতাল হয়েছে, সেখানে টাকা দিয়ে ভর্তি করে দিলে, আর বিশেষ কিছু লাগে না। তবে ষষ্ঠী পূজোর জন্যে পুরুতকে এবং নাপিতের কাছে কামিয়ে শুদ্ধ হওয়া জন্যে তাদের টাকা পয়সা দিতে হয়।

তোমাদের সঙ্গে আমাদের অনেক মিল আছে মা, দেখেছি ত সব বাবুরা যখন আসে এখানে! শুধু তোমরা ভদ্দর লোক, লেখাপড়াজানা আদমি তোমাদের টাকা পয়সা দিলেই হয়। আমাদের মত এতসব কাণ্ডকারখানা করতে হয় না!

ঠিকই বলেছিস, তোর দেখছি বুদ্ধি আছে বেশ। বলে হেসে ওঠেন সরমার মা।

॥ ২৯ ॥

একটা জিনিস লক্ষ্য করে সরমা যে অসুখ বিসুখ এদের ভেতর বড় একটা দেখা যায় না। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলে বলেই বোধহয় এদের স্বাস্থ্য এত ভাল। রোদে পুড়ছে, জলে ভিজছে, মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে থাকে, তাই বুঝি এমন হয়। আর যদি হঠাৎ কারো অসুখ করে তাহলে মরে গেলেও

ডাক্তার ডাকে না। সেই আদিম অভ্যাস আঁকড়ে ধরে আছে এখনো। অসুখ হলে ওরা জড়ি বুটি গাছগাছড়া পাতা শিকড় বন জঙ্গল থেকে খুঁজে এনে আগে রোগীকে খাওয়ায়। আর তাতে যদি রোগ ভাল না হয় তখন ছোটে ওঝার বাড়ী। নিশ্চয় কেউ গুণ তুক্ করেছে এই তাদের বিশ্বাস।

খানিকটা তেল ও শালপাতা হাতে নিয়ে ওঝার বাড়ীতে লোক যায় এবং সেগুলো তাকে দিয়ে বলে, একটু তেল পড়া করে দেখো তো বাবা।

ওঝা তখন জিজ্ঞেস করে, রোগীর নাম কি? কোন গাঁয়ে ঘর?

সব শুনে ওঝা খানিকটা তেল একটা পাতায় ঢেলে নিয়ে, তিনবার মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে তার উপদেবতাকে জাগ্রত করে। একখানা শালপাতার ওপর আর একখানা চাপা দিয়ে ঘষতে থাকে এবং মুখে কি সব মন্ত্র আওড়ায়। একটু পরে সেই পাতা দু'টোকে মাটিতে রেখে, তারপর নমস্কার করে উঠিয়ে নেয়। এবার পাতা দুটো খুলে, পাতার মধ্যে তাকিয়ে যেন কি দেখার চেষ্টা করে। তখন রোগীর লোক প্রশ্ন করে, বাবা কি দেখলেন, কোন রোগ না কোন দুষ্ট বোঙার নজর লেগেছে।

ওঝা তখন জবাব দেয়, তোমার বাস্তুবোঙা ক্ষুধার্ত হয়েছে, তাছাড়া রোগীর ওপর কুদৃষ্টিও পড়েছে কোন ডাইনীর, শুধু এইটুকুই বলে চুপ করে যায়। নাম করে না কারো।

এইভাবে আরো দু'তিনটে গাঁয়ের ওঝার মত নিয়ে যখন সে ব্যক্তি দেখে যে সবাই এক কথাই বলছে, তখন তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। সে বাড়ীতে পৌঁছেই দরজায় জল ঢালে, যে বোঙার নাম করেছে, তার কোপ থেকে মুক্ত হবার আশায়। তখন সে মনে মনে প্রার্থনা জানায় যদি অমুক লোক রোগ থেকে সেরে ওঠে তাহলে তোমায় খেতে দেবো, যত চাও পেট ভরে।

তারপর সে নিজ গ্রামের ওঝাকে ডেকে নিয়ে আসে। সে মন্ত্র পড়ে, নানা প্রক্রিয়া করে, গাঁয়ের প্রান্তে যে সব বোঙা থাকে তাদের ধরার জন্যে।

এবার ওঝা যে বোঙার কুদৃষ্টি পড়েছে, তার নাম বলে।

গৃহস্বামী তখন বলে, তাকে তুষ্ট করো যেমন করে পারো।

ওঝা তখন কিছু আতপ চাল আনতে বলে।

একটা শালপাতার ওপর সেই চালগুলো নিয়ে ওঝা তখন রোগীর কাছে গিয়ে তাকে বাঁ হাতে সেটা ছুঁতে বলে। তারপর সেই চালগুলো রোগীর গায়ের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে তার ভূত ছাড়ায় মন্ত্র পড়তে পড়তে।

এই প্রক্রিয়া শেষ করে ওঝা বাড়ীর সঙ্গে লাগোয়া যে বাগান তার শেষ প্রান্তে গিয়ে একটা কাঁটা নিয়ে তার নিজের উরুতের ওপর পাঁচ জায়গায় ফুটিয়ে রক্ত বার করে এবং সেই রক্ত কিছু আতপচালে মাখিয়ে, শালপাতায় রাখা আগের চালের সঙ্গে সেগুলোকে মিশিয়ে ফেলে। তারপর বাঁ হাতে করে সেইগুলো নিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়, যে বোঙার নজর লেগেছে, তার উদ্দেশ্যে। চীৎকার করে সেই বোঙাকে সাবধান করে, হুসিয়ার, তোকে আমি ধরে ফেলেছি, আজ থেকে তুই অমুককে ছেড়ে এই ভিটে ত্যাগ করে চলে যা, ওর যা কিছু রোগ, যা কিছু অসুখ সব যেন সেরে যায়, সে যেন আজ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠে।

সবশেষে হে আমার ঠাকুর, ওকে সুস্থ সবল রোগমুক্ত করে দাও, বলে নমস্কার করে সেই বাড়ীর চারি দিকের সীমানায় স্থানে স্থানে সেই চাল ছড়িয়ে দেয়, বাস্ত বোঙার উদ্দেশে। তারপর প্রার্থনা করে এই বলে, হে ভগবান তুমি এইসব স্থানে রয়েছ, জলে, স্থলে, গর্তে, বৃক্ষমূলে, তুমি দেখো প্রভু, তুমি একে দয়া করো!

এই বলে কয়েকটা শিকড় সেখান থেকে তুলে এনে, পিষে তার রস বার করে রোগীকে খাইয়ে দেয়। যদি রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে, তাহলে আর কিছু বলার নেই। আর যদি উল্টোটা হয়, অর্থাৎ রোগ না সারে তখন ওঝা বলে, গাঁয়ের সর্দারকে ডেকে খোঁজ করতে, কে তার মঙ্গলের পথে বাধা হানছে এবং তার জন্যে তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে।

॥ ৩০ ॥

বিকেলে কাজ শেষ করে ফুলমণি অন্য অন্য দিন চলে যাবার সময় সরমার মার ঘরের কাছে গিয়ে একবার বলে, মা যাচ্ছি! অনেক সময় এর উত্তর দের সরমা-ই। ওর মা তখনো হয়ত দিবানিদ্রায় থাকেন। তবে সবদিন যে ঘুমোন, তা নয়। ওর বাবার সঙ্গে কোন কথাবার্তা বা আলোচনায় মগ্ন থাকেন। ফুলমণি বাইরে থেকে কিছুই বুঝতে পারে না। তাই সরমার মাকেই ডাকে।

দুপুরে সরমা ঘুমতে পারে না। তার চোখের ঘুম যেন কে কেড়ে নেয়। একটা উপন্যাস কিংবা সেলাই ফোঁড়াই নিয়ে সে সময় কাটায়! ফুলমণির কণ্ঠস্বর কানে যেতেই সে তার জবাব দেয়, এসো বলে। কিন্তু সেদিন ফুলমণি

বাইরে থেকে বিদায় না চেয়ে কেন জানি না যে ঘরে ওর বাবা মা শুয়েছিলেন আর সরমা জানলার ধারে বসে একখানা উপন্যাস পড়ছিল, সেই ঘরের দরজাটার বাইরে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো।

ফুলমণি বোধহয় সঙ্কোচ বোধ করছিল, মা বলে ডেকে ঘুম ভাঙানো উচিত হবে কিনা। অন্যদিন বাইরে থেকে ডেকে চলে যায় ঠিক সরমার মা কি অবস্থায় থাকেন হয়ত বুঝতে পারে না। আজ তাই একটু ইতস্তত করতে লাগল। মুখে না ডেকে, তার হাতের রূপোর চুড়িগুলোর এমন শব্দ করলে যে সরমা সচকিত হয়ে জানলার ধার থেকে উঠে এলে। কে—বলে দরজার কাছে এগিয়ে এসে সরমা থমকে দাঁড়ায়। ও তুমি? কি খবর গো ফুলমণি, এমন করে দাঁড়িয়ে আছো কেন এখানে চুপচাপ?

একটা কথা বলবো দিদিমণি। সঙ্কোচ ও দ্বিধা জড়ানো স্বর।

কি কথা, বলো না?

এই বলছিলুম কি, কাল আমি আসতে পারবো না। ছুটি চাই। তাই আগে বলে যাচ্ছি দিদিমণি।

কেন গো? কাল কোথায় যাবে নাকি, কুটুমবাড়ী?

না। কাল আমাদের পরব দিদিমণি!

কি পরব গো?

সোহ্‌রাই পার্বণ দিদিমণি।

সেটা আবার কিসের পার্বণ!

এটা আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। পাঁচদিন ধরে চলে, কাল থেকে শুরু! তোমাদের যেমন নবান উৎসব, আমাদেরও এটা তেমনি। নতুন ফসল ঝাড়াই বাছাই করে ঘরে উঠলে, আত্মীয়স্বজন, সবাইকে নিয়ে গ্রামবাসীরা মিলেমিশে আনন্দ উৎসব করে, খায়দায়, নাচ-গান করে। এই সময় সবাই যে যার কুটুম, আত্মীয়কে নেমন্তন্ন করে পাঠায়।

তা এর কি কোন দিন ক্ষণ নেই?

হাঁ আছে দিদিমণি। এই পৌষ মাসেই হয়। তবে গাঁয়ের মাঝি একদিন সবাইকে ডেকে এই দিনটা স্থির করে বলে দেয়, কবে থেকে শুরু করতে হবে। এ পার্বণটা আমাদের সবচেয়ে বড়। পাঁচ দিন ধরে চলবে। নানা আয়োজন এর! ঘরে ঘরে খাদ্য খাবার তৈরী হয়, পচাই মদ চোলাই হয়। প্রত্যেকেই যে যার আপনার কুটুম-আত্মীয়দের খেতে ডাকে!

তা কালকে বুঝি তোমাদের বাড়ীতে অনেক লোকজন থাবে?

হাঁ দিদিমণি। শুধু খাবে না। গাঁয়ের মাঝির হুকুম তার সেই গদেট্ বা তোমাদের দেশে গাঁয়ে যাকে বলে ডাকহরি অর্থাৎ যে লোক কোন কিছু হলেই সর্দারের তরফ থেকে গিয়ে গ্রামের সবাইকে ডেকে আনে বা কোন কিছু খবর দিয়ে আসে, সেই গদেট্ এসে বলে যায়, অমুক দিন আমরা সবাই সকালে স্নান করে উৎসব শুরু করবো।

এই বলে সে প্রত্যেক বাড়ী থেকে কিছু কিছু 'পচাই' ও একটা করে মুরগী সংগ্রহ করে নিয়ে চলে যায়। উৎসবের দিন সকলে স্নান করে দেবতাকে প্রথমে এই মাংস ও পচাই উৎসর্গ করে দেয়, তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে প্রসাদ খেয়ে শুরু হয় পার্বন।

বাঃ, বেশ ত তোদের নিয়ম।

হাঁ দিদিমণি, আপনার আদমিদের সঙ্গে এই সময় ত সকলের দেখাশুনা মেলামেশা খাওয়া-দাওয়া হয়।

তা তোমার সব কুটুম্বদের নেমতন্ন করেছো?

হাঁ দিদিমণি। যেটা নিয়ম, সেটা ত করতেই হবে। তবে আমি ত গরীব আদমি—সকলকে ডাকবার ক্ষমতা আমার নেই!

তবে যাদের বলেছো, তারা সকলে আসবে ত?

না, সে কি পারে! তবে যারা আসে, তাদের নিয়েই উৎসব হয়। আগের কালে আমরা যখন ছোট ছিলুম তখন দেখেছি খুব জাঁকজমক, খানাপিনা, হৈ-হুল্লোড় হতো। দূর দূর গ্রাম থেকে সব আপনার লোকেরা এসে যোগ দিতো। আজকাল লোকের মনে তেমন স্ফূর্তি নেই দিদিমণি। সকলেরই ত অভাব, কষ্ট। এত দূর গাঁ থেকে হেঁটে হেঁটে সবাই আসতেও পারে না। তাই এ সব পার্বণের জলুস এখন আর আগের মত নেই। অনেক কমে গেছে।

তোমরা কাল কখন স্নান করতে যাবে ফুলমণি!

সকাল ন'টার সময় দিদিমণি।

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটাও ত সেইখানেই হবে।

হাঁ দিদিমণি।

দেখি যদি পারি ত কাল নদীর ধারে গিয়ে দেখে আসবো। আমাদের যেমন সব শুভ কাজেই গঙ্গাস্নান করার নিয়ম, তোমাদের দেখছি তেমনি নদীতে স্নান করতে হয় সব পাল পার্বণে, না?

হাঁ, ফুলমণি বলে, স্নান না করলে দেহটা শুদ্ধ হয় না, মনটা কার ভাল লাগে দিদিমণি ?

ঠিকই।

আচ্ছা মাকে তাহলে বলে দেবেন। আমি যাচ্ছি দিদিমণি। বলে বাগানের ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এছাড়াও পৌষ মাসে ওখানে আরো একটা উৎসব দেখলে সরমা, তার নাম শাক্‌রাত। পৌষ সংক্রান্তির দিন এই পার্বনটা হয়। আমাদের দেশে যেমন পিঠেপুলি খায় তিনদিন ধরে, ওদের ওখানে শাকরাত অবশ্য একটা দিন, সেদিন ভোরে উঠে কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীতে একটা করে মুরগী কাটে, তারপর স্নান করে এসে, মুরগীর মাংস ও ভাত মুখে দিয়ে সবাই চলে যায়। কেউ তীর ধনুক নিয়ে বনে গিয়ে শিকার করে, হরিণ, শুয়ার, খরগোশ কেউ বা মাছ ধরতে নদীতে নামে জাল নিয়ে; কেউ বা কাঁকড়ার গর্ত থেকে কাঁকড়া টেনে টেনে বার করে ধরে।

শাক্‌রাত উৎসবটা ওদের কাছে শিকারের উৎসব। এই উৎসবের দিনে যেন ওদের ভেতর একটা নূতন প্রাণের সাড়া জাগে। ওদের সেই আদিম বর্বর সত্তাটা যেন বেশী করে অনুভব করে সরমা।

বেশ লাগে। এদের সঙ্গে তুলনায় নিজেদের উৎসবগুলোকে একেবারে প্রাণহীন মুমূর্ষু বলে মনে হয় সরমার। সবচেয়ে 'সোহ্‌রাই' পার্বণটাকে ভুলতে পারে না সরমা। পাঁচদিন ধরে হৈ হুল্লোড়! স্ত্রী পুরুষ যুবক-যুবতী মিলে মিশে সারা রাত ধরে কত নাচ গান আমোদ প্রমোদ, যেন সমস্ত গ্রামটা রঙে রসে উৎসবে মেতে ওঠে।

অথচ দুর্গাপুজো যেটা বাঙ্গালী জাতির সবচেয়ে বড় উৎসব, আজ তাকে প্রাণহীন মনে হয়, তার কি শোচনীয় পরিণাম হয়েছে, ভাবতে গেলে কষ্ট লাগে সরমার। ছেলেবেলায় সরমা দেখেছিল তিনদিনের পুজো কিন্তু তার জন্যে কতদিন ধরে চলে উদ্যোগ আয়োজন, তারপর বিজয়ার দিন কত খাওয়া দাওয়া, আত্মীয়স্বজনের বাড়ী বাড়ী আসা যাওয়া, মিষ্টিমুখ করা। অথচ আজ আর তার কিছু নেই, এতবড় জাতীয় উৎসবে যেন ভাটা পড়ে গেছে। বিজয়ার দিন আত্মীয়রা পর্যন্ত আর কেউ আত্মীয়দের বাড়ীতে আসে না। নমস্কার করে, কোলাকুলি করে, পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মিষ্টিমুখ করাটা, এখন অসভ্যতার পর্যায়ভুক্ত হয়েছে।

ফুলমণি সেদিন দুপুরে কাজ করতে এসে বলে, মা আজ তোমাদের মালীর বাপটা মারা গেল!

কখন রে?

এই বেলা বারোটা সাড়ে বারোটা হবে মা! আমি তখন সবে স্নান করে এসে খেতে বসেছি, খুব কান্না শুনলুম। ছোট ছেলেটা ছুটে এসে খবর দিলে, বন্ধুয়ার বাপটা মরলো! বুড়োটা রোগে ভুগছিল অনেকদিন।

সরমার মা বলেন, সেইজন্যে আজ সকাল থেকে মালীকে দেখছি না বাগানে।

সরমা বলে উঠলো, কিন্তু আমি যখন বেড়িয়ে ফিরছি তখন ত দেখলুম ও 'লাঠা'য় করে জল তুলে নালিতে ঢেলে দিচ্ছে!

তাহলে হয়ত খবর পেয়ে পরে চলে গেছে। কিন্তু আমি তাকে সকাল থেকে দেখিনি।

সরমা প্রশ্ন করে ফুলমণিকে, তোদের এখানে শ্মশানটাশান কোথায় রে?

আমাদের এখানে ত ওরকম শ্মশান বলতে কিছু নেই দিদিমণি।

তাহলে পোড়ায় কোথায়?

এই যার যেখানে ক্ষেত খামার জমি আছে নদীর দিকে সেইখানেই নিয়ে গিয়ে পোড়ায় মা!

তাই নাকি? তাহলে নদীর ধারে গেলে এখন দেখা যাবে?

সরমার মা এবার রেগে ওঠেন, বলি মড়া পোড়াবে, তার আবার দেখার কি আছে শুনি!

বারে, ওরা কি করে পোড়ায়, ওদের নিয়মকানুন কি রকম দেখতে দোষ কি?

বেশ ত, তুমি যখন বেড়াতে বেরোবে, যেয়ো না নদীর দিকে সব দেখতে পাবে! ফুলমণি বলে।

দেখে ত চারটে হাত বেরুবে। সরমার মা বিরক্তি প্রকাশ করেন, তারপর মড়া ছুঁয়ে কে ওকে ছোঁবে, তখন কাপড়-চোপড় কেচে স্নান করতে হবে এই অবেলায়।

তোমার কেবল সব সময় ওই ছুঁই ছুঁই বাতিক! কেন আমার কি চোখ নেই যে লোকের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়বো। বলে মায়ের দিক থেকে মুখটা

ফিরিয়ে আবার ফুলমণিকে প্রশ্ন করে, তাহলে এখনো মড়া নদীর ধারে নিয়ে যায় নি ?

না, দিদিমণি। আমাদের ত সব অনেক নিয়ম কানুন আছে—গাঁয়ের সদারকে আগে খবর দিতে হবে। সে পাড়ার লোক পাঠিয়ে গাঁয়ের সব লোকদের এক জায়গায় জড়ো করবে। তারা সব কুড়ুল দিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে হাজির হবে ওখানে।

সরমা বলে, তারপর বুঝি সবাই মড়াকে নিয়ে নদীর ধারে যাবে!

না—দিদিমণি। বাড়ীর মেয়েদের আরো অনেক কিছু কাজ থাকে, তোমাদের মত আমাদের এত তাড়াতাড়ি করে না।

সরমা বলে, তাই নাকি! কি রকম কি সব কাজ মেয়েদের আছে শুনি ?

সরমার মা বলেন, শুধু তোদের কেন, আমাদেরও ঘরে অনেক কিছু ক্রিয়া কর্ম করতে হয় মানুষ মরে গেলে! এতকাল ধরে যে লোকটা ঘর সংসার করলে ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী নিয়ে, এক কথায় কি তাকে কেউ বিদেয় করতে পারে ?

তাহলে কি হয় মা, আমাদের জাতের বড্ড ঝঞ্ঝাট, অনেক নিয়মকানুন। এতক্ষণ সব বাড়ীর মেয়েলোকরা হল্‌দী গুঁড়ো করে, তুলোর বিচি ভেজে খৈ ভাজতে বসে গেছে। ওদিকে বেটাছেলেরা একটা মুরগীকেও ধরেছে।

সরমা বলে, তোর কাজ হয়ে গেলে আমায় একটু নিয়ে যাবি বনুয়াদের বাড়ী, আমি দেখবো ওরা কি করে!

আচ্ছা নিয়ে যাবো দিদিমণি। আমাদের দেশে যখন এসেছো তুমি আমাদের জাতের সব নিয়মকানুন জানতে চাও, সে ত ভাল কথা। কেন নিয়ে যাবে না ?

সত্যি, বনুয়াদের বাড়ী গিয়ে সরমা দেখে, ও যা বলেছে ঠিকই। মেয়েরা হলুদ গুঁড়ো, খৈ ও সেই তুলোর বীজ ভাজা একটা ভাঙ্গা কুলোয় করে যেমন এনে রাখলে উঠোনে, কয়েকটা পুরুষ অমনি একটা খড়ের তৈরী দড়িতে আগুন ধরিয়ে এবং কিছু শুকনো ঘাস ঘরের চাল থেকে টেনে নিয়ে, একটা মুরগীকে বেঁধে সেই কুলোর ওপর রাখলে। তারপর একখানা ধুতি, একটা কাঁসার বাটি, কিছু টাকা পয়সা, একটা কুড়ুল, তীর ধনুক, একটা লাঠি, একটা বাঁশী আরো অনেক-কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র এনে তারই পাশে এক জায়গায় সব জড়ো করলে।

যখন এইগুলো সব গোছগাছ হয়ে গেল, তখন চারজন লোক ঘরের ভেতর ঢুকে যে খাটে বুড়োটা মরেছিল, সেটাকে উঠোনে বার করে আনলে। তারপর চার জনে কাঁধে করে সেই খাটিয়াটা বয়ে নিয়ে গিয়ে গ্রামের শেষ প্রান্তে এক রাস্তার সংযোগস্থলে নামালে। এখানে বাড়ীর সব মেয়েরা এবং গাঁয়ের আরো অনেক স্ত্রীলোক এসে আগে মড়াকে তেল ও হলুদ মাখালে, তারপর তার কপালে একটা সিঁদুর টিপ পরিয়ে দিলে। এবার সেই খাটিয়াটার চারটে পায়ার ওপর সেই খৈ, তুলোর বীজ ভাজা প্রভৃতি ঢেলে দেবার পর একজন ওঝা এসে মন্ত্র পড়ে সেই মুরগীটা নিয়ে তিনবার খাটিয়াটাব চারিপাশে ঘুরলে।

এখন মেয়েরা যে যার বাড়ী চলে গেল। আর পুরুষরা সেই খাটিয়াটা কাঁধে নিয়ে মৃতদেহটা সংকার করতে চললো অল্প একটু দূরে বন্নুয়াদেরই নীচু একটা ধানক্ষেতের পাশে, ছোট্ট একটা বাঁধের ধারে। এই বাঁধে অনেকটা জল জমে ছিল।

এইখানে কাঠ সাজিয়ে তারা তখনই একটা চিতা তৈরী করে ফেললে। চিতার চার কোণে চারটে কাঠের খুঁটি পুঁতে দিলে যাতে না কাঠগুলো গড়িয়ে পড়ে যায়।

এবার তারা বন্নুয়ার হাত পা ধুইয়ে দিলে, কারণ ও বুড়োর জ্যেষ্ঠপুত্র, উত্তরাধিকারী। শুধু হাত পা ধোয়ালে না, বন্নুয়ার চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে, সেই জল একটু তার মুখে ঢেলে দিলে।

এর পর খাট থেকে মৃতদেহটাকে বাহকরা তুলে নিয়ে তিনবার সেই সাজানো চিতার চারিপাশে ঘুরিয়ে কাঠের ওপর দিলে শুইয়ে। তারপর মড়ার দেহ থেকে তারা খুলে নিলে সব কিছু। পরনের কাপড়, কোমরের ঘুনসী, পেতলের আংটি, কানের রিং। এছাড়া আর যে সব জিনিসগুলো বাড়ী থেকে মড়ার সঙ্গে শ্মশানক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছিল সব কিছু সরিয়ে নিয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে আগে চাপা দিলে তার লজ্জাস্থানে—তারপর চারখানা কাঠের টুকরো নিয়ে একটা বুকে, একটা পেটে, একটা কোমরে এবং একটা পায়ের ওপর রাখলে।

গাঁয়ের সব লোকেরা এবার চিতার চারিপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। তখন সেই ওঝা মন্ত্র পড়তে পড়তে সেই মুরগীটাকে সকলের ওপর দিয়ে তিনবার ঘুরিয়ে চিতার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিয়ে, সেই খাটিয়াটাকে কেটে ফেললে। তারপর বন্নুয়া এগিয়ে গিয়ে তার বাপের পরনের সেই কাপড়টা ছিঁড়ে, তাই দিয়ে

দড়ি করে খাটিয়ার একটা কাঠের সঙ্গে শুকনো ঘাসের একটা ভাল বেঁধে তাতে আগুন লাগিয়ে মৃত বাপের মুখে একবার ঠেকিয়ে দিয়ে 'আগ্‌মুখ' করলে। তখন আত্মীয়স্বজনরা সবাই এক এক টুকরো কাঠ আগে মৃতদেহের ওপর ফেলে দিলে, তারপর দিলে গাঁয়ের লোকেরা। এবার নিজের ভাষায় কি এক স্তব পাঠ করে, সবাই একসঙ্গে চিতায় আগুন জ্বালিয়ে দিলে।

আর দাঁড়ালো না সরমা, বাড়ী চলে এলো। ফুলমণিকে সে পথে বললে, আমাদেরও অনেকটা এই রকম নিয়মকানুন।

না দিদিমণি, তুমি ত শেষটা দেখলে না, এরপর আরো অনেক কিছু আছে।

সে আবার কি ?

ফুলমণি বলে, হাঁ, যখন দাহ শেষ হয়ে যাবে তখন একজন লোক সবাইকে কামিয়ে দেবে। তারপর সকলে কলসী করে জল এনে চিতায় ঢেলে আগুন নিভিয়ে দিলে, তখন ওই বুড়োর ছেলে বহুয়া গিয়ে চিতা থেকে খুঁজে খুঁজে হাড়গুলো নিয়ে জলে ধুয়ে আনলে তার ওপর হলুদের জল ও দুধ ঢেলে একটা মাটির হাঁড়ির মধ্যে রাখবে। তারপর সেটা নিয়ে গিয়ে দামোদর নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে আসবে? একে বলে আমাদের দেশে 'জান্‌বহা'। এটা যে আজই করতে হবে, এমন কোন আইন নেই। যারা অনেক দূর দেশে থাকে, তারা কেউ একমাস পরে, কেউ বা দু'মাস পরে, কেউ বা আরো পরে করে থাকে।

সরমা বলে, আমাদের মধ্যেও এরকম নিয়ম আছে শুনেছি। গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন দিলে তবে মৃতের ঊর্ধ্বগতি হবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে দূর অ-গঙ্গার দেশ থেকে অস্থিবহন করে এনে গঙ্গায় ফেলে যায়।

ফুলমণি বলে, হাঁ, আমিও শুনেছিলুম একটা বাবুর কাছে। ওই বাবুটা সে বছর এখানে 'চেঞ্জ'-এ এসে তিনমাস ছিল। হাঁ দিদিমণি, সেই বাবুটা বলেছিল, আমাদের জাতের যা আছে, তোমাদের ভেতরও নাকি সব তেমনি আছে।

একটু ভেবে সরমা বলে, হাঁ! ঠিকই বলেছিল বাবু। তবে তোদের মত এতসব পঞ্চাশ রকমের ফ্যাচাং আমাদের এখন নেই। এককালে হয়ত ছিল, যখন অশিক্ষিত ছিল লোকেরা তোদের মত। এখন সে সব নিয়মকানুন উঠে গেছে—শিক্ষিত লোকরা এত সব কেউ মানেই না!

আমরা জংলী আদমী দিদিমণি। আমাদের আইনটা বড় কড়া, শুনেছি আগের দিনে নাকি আরো কড়া ছিল।

সরমা জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, তোমাদের অশৌচ হয় ত?

হাঁ দিদিমণি। পাঁচ দিনে আমাদের অশৌচ যায়। 'তেলনাহান্' বলে ওই দিনকে। মৃতের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গাঁয়ের লোকেরা সব একত্র হয়ে কামিয়ে তারপর মাটি দিয়ে মাথা ঘষে, তেল মেখে স্নান করে সব শুদ্ধ হয়। মেয়েদেরও এইভাবে শুদ্ধ হতে হয় আলাদা এক জায়গায় গিয়ে স্নান করে।

সরমা বলে, আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের দশ দিন, আর শূদ্রদের একমাস অশৌচ—এই ছিল নিয়ম। এখন শূদ্ররা কেউ তা মানে না, অধিকাংশই বারোদিনে শ্রাদ্ধ ক'রে শুদ্ধ হয়।

ফুলমণি বলে, আমাদের এখানে পুরোপুরি শুদ্ধ অবশ্য 'ভানদন্' না হওয়া পর্যন্ত হয় না। দিন স্থির করে' তারপর খবর দিতে হয় সকলকে। সেই দিনে আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসীরা সবাই মিলিত হয়ে মৃতের বাড়ীতে এসে কামাবে, তার-পর স্নান করে ফিরে এসে একত্রে পানভোজন করবে। আবার মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতির জন্যে তোমাদের যেমন শ্রাদ্ধ হয়, আমাদেরও তেমনি অনেক কিছু পূজো মানসিক করতে হয় ওই সময়ে। এটাই আমাদের মৃত ব্যক্তির প্রতি শেষ শ্রদ্ধার্ঘ দান।

যখন কোন লোক মারা যায়, তখন যত দিন না এই 'ভান্দন্' বা শেষ শ্রাদ্ধ হচ্ছে, ততদিন সেই পরিবারের লোকেরা কেউ সিঁদুর পরে না, পচাই তৈরী করে না, এমন কি তাদের ঘরে কোন বিয়ে-থা প্রভৃতি শুভকর্মও হয় না।

সরমা বলে, আমাদের দেশেও এই ধরনের নিয়ম আছে, একে বলে কালাশৌচ। এক বছর এই অশুভকাল থাকে। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কোন শুভকর্ম করতে নেই।

সরমা বাড়ী ফিরে এলে, ওর মা ওকে স্নান করে তবে ঘরে ঢুকতে বললেন।

সরমা রেগে ওঠে, আমি ত কাউকে ছুঁইনি, দূর থেকে দেখেছি।

ওর মা বলেন, এত মানুষের মধ্যে কি খেয়াল থাকে! দু'ঘটি জল মাথায় ঢাললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে শুনি!

তার জন্যে নয়, এই শীতের বিকেলে স্নান করে ভিজে চুলে থাকতে বুঝি খুব ভাল লাগে! দিন দিন তোমার এই অকারণ ছুঁইছুঁই বাই বেড়েই চলেছে। বলে গজ গজ করতে করতে বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে।

কিছুদিন হলো ঝাপড মিঞা আর আসে না। সরমার ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করে, লাঠিটা দেখা যাচ্ছে কিনা কোথাও ধানক্ষেতের ভেতরে। কামাই ত সে করে না। চারটে পয়সা তার কাছে যেন চারখানা বুকের কলিজার সমান। মুরগী সবদিন সরমারা খায় না। তবু এতটা পথ এসে জিজ্ঞেস করতে ভুল হয় না কোনদিন ঝাপড মিঞার। এই দু'মাস এসেছে, এর মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখেনি।

সরমা বেশ মুস্কিলে পড়ে। মুরগী কাটার লোক এখানে পাওয়া দুষ্কর, যারা বিক্রী করতে আসে তারা কেউ কাটতে রাজী হয় না। লাহা বাংলা থেকে মালীটাকে ডেকে এনে তবে কাটায়। এদিকে একমাত্র ওই লোকটাই মুরগী জবাই করে।

সরমা তাকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে, ঝাপড় মিঞার কি খবর, অনেকদিন আর এদিকে আসছে না কেন। অসুখ বিসুখ করেনি ত?

কি জানি। কে খবর রাখে দিদিমণি। সে থাকে অনেক দূরে।

সরমা ভাবে আসলে সে না এলেই ওর সুবিধা। চারটে করে পয়সা ও পায়, তাই কথাটা এড়িয়ে যায়।

এমনি করে যখন চলে যাবার সময় আসন্ন হয়ে এলো তখন একদিন বাবার সঙ্গে 'মর্নিংওয়াক' করতে বেরিয়ে সরমা ঝাপড মিঞার বাড়ীর দিকে গেল। দূরে একটা ভাঙা মসজিদের চুড়ো দেখিয়ে ঝাপড মিঞা একদিন বলেছিল, আমার ঘর ওইখানে দিদিমণি!

তখনো ভাল করে রোদ ওঠেনি। রাস্তার ধারে একটা ক্ষেতে একজন সাঁওতাল মজুরকে দেখে সরমা প্রশ্ন করে, আচ্ছা, এখানে ঝাপড় মিঞার বাড়ীটা কোথায় বলতে পারিস?

আঙুল দেখিয়ে লোকটা বলে, ওই যে ওইখানে!

সরমা তাকিয়ে দেখে কয়েকটা চালাঘর যেন একজায়গায় জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আবার জিজ্ঞেস করে, ওখানে ত দেখছি অনেকগুলো বাড়ী, ওর মধ্যে কোন্‌টা ঝাপড় মিঞার?

লোকটা কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিল, হঠাৎ হাতটা থামিয়ে জবাব

দিলে, ওই সবগুলোই ঝাপড মিঞার !

এঁ্যা! বলে কি? ওদের বাপবেটির মুখে চোখে বুঝি অবিশ্বাসের ছবি ফুটে ওঠে। সরমা অস্ফুটকণ্ঠে বাবাকে বলে, বাজে কথা, হতেই পারে না। লোকটা 'গুল' মারছে।

লোকটা বোধহয় সরমার কথাটা বুঝতে পেরেছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, শুধু ওই বাড়ীগুলো কেন, ওর চারিপাশে যত ক্ষেত খামার জমি দেখা যাচ্ছে, সবই ওই মিঞার।

ওরা এবার চুপচাপ এগিয়ে গেল সেই চালাঘরগুলোর দিকে। কাছে যেতে দেখে, প্রকাণ্ড একটা উঠোন আর তার চারিদিকে অনেকগুলো পাতার ঘর এলোমেলোভাবে ছড়ানো। উঠোনের মাঝে মস্ত বড় একটা মাচা, তাতে লাউগাছ, সিমগাছ ও পুঁই গাছ রয়েছে ভরে। উঠোনের একদিকে একটা বড ইঁদারা, বালতিতে দড়ি বেঁধে একটা মেয়ে জল টেনে টেনে তুলে একটা মেটেকলসীতে ঢালছে। সারা উঠোনটা বিশ্রী রকমের নোঙ্‌রা!

একপাল মুরগীর সঙ্গে ছোট ছোট অনেকগুলো বাচ্ছা খুঁটে খুঁটে কি যেন খাচ্ছে, কয়েকটা ছাগল একটা পেঁপে গাছের তলায় বাঁধা, দু'টো গরুর গাড়ী ঘাড গুঁজে পড়ে আছে এককোণে, তার ওপরে কতকগুলো ভিজে ন্যাকড়া কানি শুকোচ্ছে। রোগা রোগা হাডবারকরা গোটা আষ্টেক গাই ও বলদ তার পাশে রয়েছে একটা খুটিতে বাঁধা, তারা দাঁড়িয়ে দাঁডিয়ে জাবর কাটছে। কতগুলো শুকনো জোয়ার ও ভুট্টা গাছের টুক্‌রো পডে রয়েছে, তাদের মুখের সামনে।

একটা মেটে ঘরের দাওয়ায় একজন বুড়ী ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে বসে বসে হুঁকো টানছিল। তার হাতের তেলোয় মেদীপাতার রংয়ের ছোপ।

ঝাপডমিঞা আছে? সরমা কঞ্চির বেড়াটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে বুড়ীটাকে।

বুড়ী হুঁকো থেকে মুখটা একবার তুলে বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলে, এখানে সে থাকে না।

কোথায় থাকে?

ওই যে পুকুরের ধারে ছোট চালাটা দেখা যায়, ওইখানে।

সরমার বাবা বলেন, চল ফিরে যাই, আবার ওদিকে যেতে হবে না, অনেক বলা হল্যো।

সরমা বলে, এতটা যখন এসেছি, এতটুকু যেতে আর কতই বা দেরী হবে, ওই ত দেখা যাচ্ছে ঘরটা।

এই বলে যখন তারা পিছন ফিরতে যাচ্ছে দেখে অনেক কৌতূহলী চোখ, এঘর ওঘর সেঘরের জানলা থেকে উঁকি মারছে। কতকগুলো লেংটিপরা ছেলেমেয়ে উঠোনের এক কোণে জড় হয়ে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে যেন এর আগে কখনো শহুরের লোক দেখেনি! ওদেব লক্ষ্য করে তারা নিজেদের ভাষায় কি সব বলছে, আর ফিক্ ফিক্ করে হাসছে।

পুকুরের কাছে যেতে সরমারা দেখে সেই চালাঘরটার চারিদিকে রাংচিতে, গাবভেরেণ্ডা, ফণিমনসা এবং আরো কত কিসব বুনো গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার ওপর লতিয়ে উঠেছে সিমগাছ, থোকা থোকা সিম ঝুলছে এখানে ওখানে। কোথায় সিমের ফুলের ওপর ছোট্ট ছোট্ট প্রজাপতির মত তিন চারটে সাদা রঙের পতঙ্গ বসে ছিল, ওদের দেখে হঠাৎ উড়ে গিয়ে খানিকটা তফাতে অন্য ফুলের ওপর গিয়ে বসলো। গাছের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল। চালাঘরটার সামনে যে মেটে উঠোন, তার ওপর একটা খাটিয়ায় ময়লা কাঁথা ও ছেঁড়া ছেঁড়া চটের থলের ওপর চুপ করে শুয়ে আছে ঝাপড মিঞা। তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা ন্যাকড়া বাঁধা।

ঝাপড় মিঞা আছো? বলতে বলতে সরমা ও তার বাবা ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালো।

সরমার ডাক কানে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো ধড়মড করে খাটিয়াব ওপর উঠে বসে আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে দিদিমণি, তোমরা যে এখানে!

সরমা বলে, এইদিকে বেড়াতে এসেছিলুম, তাই ভাবলুম তোমার খবরটা নিয়ে যাই, আমাদের ওদিকে যাও না কেন?

পুকুরে নাইতে গিয়ে পায়ে একটা শামুক ফুটে গিয়েছিল দিদিমণি। এত দরদ যে হাঁটতে চলতে পারি না, পা ফুলে গিয়েছিল। আজ ক'দিন ত শুধু শুয়ে আছি, থোড়া বখার, জরও হয়েছিল, তবে আজ দু রোজ ভাল আছি, পায়ের দরদও আর নেই, থোডা চলাফেরাও করছি।

সরমা বলে, ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছো ত?

কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে ঝাপড় মিঞা, আমরা জংলী আদমী, ডাঁকতর, হকিম দেখাতে পারি না দিদিমণি, এই চুন হলুদ, জংলী পাতা, শিকড এইসব লাগিয়েছি। এই আমাদের দাওয়াই।

বলতে বলতে মুখটা হঠাৎ ঘুরিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে এ আমিনা, একঠো চৌপাই লে আও, দেখ্‌তা নেহি বাবুলোক সব খাড়া হ্যায়।

সরমার বাবা বলেন, থাক থাক, আমরা এখনি চলে যাবো, খাটিয়া আনার দরকার নেই।

দড়ির একটা ছোট খাটিয়া, তার কয়েকটা দড়ি ছেঁড়া, কাঁধের ওপর হাতে করে তুলে ধরে বাইরে নিয়ে এলো সরমার বয়েসী একটা মেয়ে।

সরমা প্রশ্ন করে, এ তোমার মেয়ে না নাতনী।

বুড়ো সগর্বে উত্তর দিলে, নেহি ও আমার জরু, নয়াবিবিজান।

এ্যাঁ, এ তোমার বউ। কথাটা কানে শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারে না সরমা।

হাঁ দিদিমণি!

এর পর কি বলবে, কিছুক্ষণ যেন কথা খুঁজে পায় না, বোবা হয়ে যায় সরমা। স্থির দৃষ্টিতে শুধু বুড়োর ওই পাকা দাড়ি-গোঁফগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

উঠোনের এক কোণে বসে ভাঙা কলাইয়ের শান্‌কিতে করে কি খাচ্ছিল একটা ছোট ছেলে ও মেয়ে। ছেলেটার বয়েস বোধহয় আড়াই কি তিন, আর মেয়েটা তার চেয়ে দেড় দু বছরের বড় হবে খুব বেশী হলে! হঠাৎ তারা দু'জন উঠে এসে বুড়োকে বলে, বাজান, আর কি খাবো?

বুড়ো এক ধমক লাগায়, যাও আম্মাকে পুছো।

বলতেই তারা ছুটে ঘরের ভেতরে পালাল।

সরমা এবার তাদের দিকে আঙুল দেখালে, ওরা কে?

হামার লেড়কা লেড়কী দিদিমণি।

ওরা কি তোমার এই বৌয়ের ছেলে?

হাঁ দিদিমণি, এদের জন্যেই আমার যত ভাবনা।

কেন, তোমার ত বাড়ীঘর জমিজমা অনেক, তবে ভাবনা কিসের?

লেকিন্ খাবার লোকভি ত অনেক আছে, দিদিমণি! বলতে গিয়ে হঠাৎ বুড়োর মনে পড়ে যায়, তারা তখনো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। তাই সরমার বাবার দিকে হাত তুলে বলে, জেরা বৈঠিয়ে বাবুজী। আমি গরীব আদমি, আব্‌লোক আমীর হ্যায়।

এবার আর না বসে উপায় রইলো না। তবু সরমার বাবা মুখে বললেন,

আমরা এখনি চলে যাবো। তারপর সরমার বাবা প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, ওই যে মসজিদের কাছে ঘরগুলো দেখে এলুম এবং তার আশেপাশে যে সব ক্ষেতখামার সব কি তোমার ?

হাঁ বাবুজী ! বিরস কণ্ঠে জবাব দেয় বুড়ো। এবং কি যেন একটু চিন্তা করে আবার বলে, লেকিন্ শুধু নামে, এখন আর ওতে আমার কোন অধিকার নেই।

কেন ? সরমার কণ্ঠ থেকে প্রশ্ন ছিট্‌কে বেরোয়।

ও সব ত বি'বদের দিয়ে দিয়েছি। তাদের বালবাচ্ছাদের খেতেই কুলোয় না।

বিবিদের কথাটা সরমার কানে কেমন যেন আঘাত হানে। ঠোঁটের প্রান্তটা ঈষৎ বাঁকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, তোমার ক'টা বিবি ঝাপড় মিঞা ?

চারঠো দিদিমণি !

কণ্ঠের বিস্ময় চেপে সরমা বলে, এই নতুন বিবিকে নিয়ে চারটে ?

না। একে ধরলে পাঁচটা। একটা ত মরে গেল দিদিমণি।

ও, সে মরে যেতেই বুঝি একে বিয়ে করেছো ?

না দিদিমণি ! দু'নম্বরটা মরে গেছে, আজ বিশবছর হলো। আর এই আমিনাকে সাদি করেছি, বলে মনে মনে সালটা হিসেব করতে গিয়ে হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। যেন হিসেবটা গুলিয়ে যাচ্ছে, আমিনাকে তখন কয়েকটা আতা ও পেয়ারা আঁচলে নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে বুড়ো প্রশ্ন করলে, কেত্‌না রোজ হুয়া, হামলোক সাদি কিয়া আমিনা ?

সাত সাল ! অর্থাৎ এই সাত বছর হলো !

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ কণ্ঠে এনে সরমা প্রশ্ন করে, তা তোমার ত ছেলে-মেয়ে দেখছি এ পক্ষের দু'টো। ও তরফে ক'জন ?

বুড়ো আবার একটু চুপ করে রইলো। বোধহয় সব মনে করতে পারছিল না। তাই আবার আমিনাকেই ডেকে জিজ্ঞেস করে, এ আমিনা, বাতাও জল্‌দি দিদিমণিকো, ক'জন হোগা।

আঁচলে সেই ফলগুলো নিয়ে সরমার কাছে সরে এসে দাঁড়ালো আমিনা। তারপর বললে, হোগা দিদিমণি, এক কুড়ি ন'।

তার মানে উনত্রিশজন ?

হাঁ, তবে সব এখন জিন্দা নেই। বুড়ো বললে, চারটে বেটা ত মরে গেল !

তাহলে বেঁচে আছে ও তরফে মোট পঁচিশ জন আর এই দু'জন, না?

হাঁ দিদিমণি, ওহি হোগা!

বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকে সরমা। ওর বাবা এবার নীরবতা ভঙ্গ করে বলেন, চল সরো, এখন যাওয়া যাক্।

হাঁ চলো বাবা। বলে উঠে দাঁড়াতেই আমিনা তার আঁচল থেকে সেই আতা ও পেয়ারাগুলো ওর হাতে দিলে।

বাঃ, ভারী সুন্দর আতাগুলো ত। এর দাম কত? সরমা প্রশ্ন করে।

বুড়ো বলে ওঠে, না, না, এর কোন দাম দিতে হবে না দিদিমণি! এ আমার গাছের চীজ। তোমরা এত কষ্ট করে আমার গরীবখানায় এলে, কত ভারী আমীর আদমি তোমরা—তোমাদের যোগ্য মর্যাদা দেবার মত আমার কি সাধ্য আছে!

না না—তা হয় না ঝাপড় মিঞা! তুমি গরীব মানুষ! বলে সরমার বাবা পকেট থেকে পয়সা বার করতে গেলে ঝাপড় মিঞা দু'হাত জোড করে মিনতি জানায়, মাফ্ কিজিয়ে! তোমাদেরই নিয়ে ত খাচ্ছি পরছি বাবুজি! বলে হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। ছেলেমেয়েগুলো যদি মানুষ হতো, তাহলে আমার ভাবনা ছিল না, উল্টে তারা সব আমার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। মায়ে বেটায় সব জোট বাঁধলো, আমায় খেতে দেবে না, পরতে দেবে না। আমি যেন পর, ওদের সকলের গলগ্রহ।

তাই নাকি?

খোদা সাক্ষী দিদিমণি! বলে আকাশের দিকে হাতটা উঁচু করে বললে, একবার খুব অসুখ হলো, তিনরোজ কেউ আমার ঘরে ঢুকলো না, জিজ্ঞেস করলে না কিছু খাবো কিনা, যেন মরে গেলে ওদের হাড় জুড়োয়! তাই ভাল হয়ে উঠে ওদের সব সম্পর্ক কেটে দিয়ে চলে এসেছি এখানে। আমি মরদকা বাচ্ছা, আমার হিম্মত আছে কিনা, দেখবার জন্যে আমিনাকে সাদি করে আবার নতুন করে এই ঘর বেঁধেছি দিদিমণি! বড় ভালো মেয়ে আমিনা। ওর জন্যে দু'টো খেতে পাই, রোগ হলে কত সেবা করে। এই বলে কিছুক্ষণ মৌন থেকে সে প্রশ্ন করলে, ঠিক করেছি কিনা বলো ত দিদিমণি! আমি মরদকা বাচ্ছা!

সরমা এর জবাবে কি বলবে ভেবে পায় না। তার দীর্ঘ পরমায়ু যে এর জন্যে দায়ী, এটা বুঝতে পারে। তাই মনে মনে বৃদ্ধের এই অসহায় অবস্থার

কথা কল্পনা করে সে শুধু বলে, হাঁ, ঠিকই করেছো। নইলে এই বয়েসে কে তোমায় দেখবে!

সরমার ওই কথার মধ্যে বুঝি কিসের সান্ত্বনা লুকনো ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর মুখখানা সেই পাকা দাড়ি গোঁফের ভেতর থেকে যেন অস্তগামী সূর্যের আলোকচ্ছটার মত শুধু শেষ একবার রক্তিম হয়ে উঠেই ধীরে ধীরে আবার পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করলে।

ফিরে আসবার সময় সারা পথ সরমার কানে শুধু বুড়োর সেই একটা কথা যেন ধ্বনিত হতে থাকে, আমি মরদকা বাচ্ছা দিদিমণি!

সরমার বাবা নিঃশব্দে সিগারেট টানতে টানতে আসছিলেন। হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন, অদ্ভুত তেজী মানুষ, না? এরকম বড় একটা চোখে দেখা যায় না।

সরমা মুখে শুধু 'হুঁ' বলেই যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সহসা তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে বুঝি আর একজনের স্মৃতি, সে তুল্‌হা সর্দার!

॥ ৩৩ ॥

ঝাপড় মিঞা কয়েকদিন পরেই আবার আসে মুরগী কাটতে। লাঠি ও ছুরিটা রেখে বাঁধানো কুয়োটার চাতালে বসে সে হাঁপায়। মিনিট কয়েক জিরিয়ে সে ডাক দিলে, দিদিমণি!

এর আগে সরমা কোনদিন তাকে এমনভাবে কাজ করতে এসে আগে-ভাগে বিশ্রাম নিতে দেখেনি। তাই আপন মনেই বলে উঠে, আহা বেচারা! অসুখের পর এতটা পথ হেঁটে এসেছে!

কাছে এসে সে বলে, কি বুড়ো, তোমার পায়ের দরদ সেরে গেছে?

হাঁ, দিদিমণি! আমি ত দু'তিন রোজ হলো, কাজ করছি। এতটা দূরে আজই প্রথম এলুম।

বিপিনবাবু বাজারে গিয়েছিলেন। ফটকের মধ্যে ঢুকে বুড়োকে দেখে প্রশ্ন করেন, কি মিঞা, তবিয়ৎ আচ্ছা ত?

হাঁ বাবুজি। খোদা মেহেরবান্! বলে হাতটা আকাশের দিকে একবার তুলে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, আর কতদিন তোমরা থাকবে বাবুজি?

আর থাকছি না। পরশুদিনই আমরা চলে যাচ্ছি মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে।

নিমেষে বুড়োর চোখ দুটো যেন স্থির হয়ে যায়। তারপর একটু ভেবে বলে, এত্‌না জলদি ?

সরমা বলে, ওমা জলদি কোথায়। দু'টো মাস পুরো হবে কাল।

হাঁ, ও ত ঠিক। লেকিন আরো কিছুদিন থাকলে তোমার শরীরটা বনে যেতো দিদিমণি। এখানে জলহাওয়া সব্‌সে আচ্ছা ফাগুন্‌, চৈত্‌মে।

হেসে ওঠে সরমা। বলে, তোমাদের এখানের লোকদের কারুর কথার ঠিক নেই. আগে শুনেছিলুম শীতকালটা না কি এখানে সবচেয়ে ভাল! আবার এখন বলছো ফাল্গুন চৈত্র মাস!

সরমার বাবা বলেন, আরে, এখানে যতদিন থাকে, ওর শরীর ত আচ্ছাই থাকে, কিন্তু কলকাতায় গেলেই আবার কিছুদিন পরেই যে কে সেই!

ওই জন্যেই ত বাবুজি বলছি, আরো দু'টো মাস থাকতে! থোড়া রোজ রহেনে সে কুছ্‌ ফায়দা নেহি মিল্‌তা!

বিপিনবাবু বলেন, আমাদের যে আপিসে চাকরী করে খেতে হয়, তা জানো ত? মেয়ের অসুখের দোহাই দিয়ে ছুটি নিয়েছি অনেক কষ্টে। তাও মাইনে পাবো অর্ধেক।

হাঁ, উয়ো ত ঠিক বাত্‌! লেকিন্‌ ফিন্‌ কভি ইধার আনা ত বাবুজি, ফাগুন চৈত্‌মে আনা! পুরো মালুম হোগা কেইসা আচ্ছা পানি হিঁয়াকা!

আচ্ছা দেখা যাক, ভবিষ্যতে যদি সুযোগসুবিধা হয় এদিকে আসার!

হাঁ, জরুর আ যায়েগা। বলে সরমার মুখের ওপর চোখ দুটো রেখে বুড়ো বলে, আমার ঘর ত দেখেছ দিদিমণি। আবার যখন আসবে আমায় 'তলব' করবে, আমি এসে তোমার মুরগী জবাই করে দিয়ে যাবো!

এর জবাব দিতে গিয়ে কথার বদলে সরমার ওষ্ঠ ভেদ করে শুধু ছিটকে পড়ে এক টুকরো হাসি।

কেয়া বাত্‌? হাসছো যে দিদিমণি! বুড়োর কণ্ঠস্বরে যেন প্রচ্ছন্ন অপমান ও হতাশা জড়ানো!

মুখটা চট্‌ করে ঘুরিয়ে নিয়ে সরমা বলে, না, না, ও কিছু নয়! বুঝি সেই মুহূর্তে নয়াবিবিজান ও তার দু'টি বাচ্চার মুখ ওর চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে। বার দুই ঢোক গিলে সে বলে, আল্লা, তোমাকে আরো অনেক

কাজ বাঁচিয়ে রাখুন। আবার যখন আসবো, তুমি যেন আমাদের কাজ করতে পারো!

জরুর! বলে একটা সান্ত্বনার নিঃশ্বাস ফেলে ঝাপড় মিঞা।

একটা টাকা পকেট থেকে বার করে বিপিনবাবু তার হাতে দিয়ে বলেন, এই নাও বকশিশ।

টাকাটা নিয়ে পুরো মুসলমানী কায়দায় ঘাড় নীচু করে একটা হাত কপাঁলের কাছে তুলে, সে বলে, সেলাম বাবুজি! সেলাম দিদিমণি! আমার নামটা যেন ভুলে যেয়ো না। আমার ঘরটাও ত দেখেছো, মনে রেখো। আবার যখন আসবে শুধু একটু খবর দেবে, ব্যস্, আমি এসে তোমার সব মুরগী বানিয়ে দেবো!

বলতে বলতে বুড়ো লাঠিটাকে সজোরে চেপে ধরে দেহটাকে তেমনি সামনে ভেঙে দিয়ে, বড় বড় পা ফেলে ফটক ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বুড়োর দেহটা, বনের পথে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় তাকিয়ে থাকে সুরমা নিঃশব্দে। চকিতে ওর মনে হয় বুঝি আমিনা তার চেয়ে অনেক সুখী!

॥ ৩৪

বলা বাহুল্য এর পরে আর কখনো ওখানে যায় নি সরমারা। তবে যেখানে গিয়েছিল সে এক অদ্ভুত জায়গা। ফাল্গুন চৈত্র মাসে এখানে পাহাড়ে যখন পলাশ ফোটে, কৃষ্ণচূড়া, রঙন আর গুল্‌মোরের ডালে ডালে শুরু হয় হোলিখেলা, মহুয়ার গন্ধ মাতাল হয়ে লুটোপুটি খায় শাল সেগুনের বনে, পাখীদের গলা ভাঙে ঝোপে ঝাড়ে গান গেয়ে গেয়ে, দেবদারুর উন্নত বলিষ্ঠ দেহে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ জাগে, তখন এ অঞ্চলে লোক আসে না। 'অফ্-সিজিন'! বাড়ী ঘর সব বন্ধ পড়ে থাকে। বাগান বাগিচার ফটকে ফটকে ঝোলে লোহার চেনের সঙ্গে বড় বড তালা।

বাবুদের আসার সময় এটা নয়। তারা আসে পূজোর ছুটিতে। আপিসে লেট্ হবার ভয়ে যেমন বাদুড ঝুলতে ঝুলতে যায় ট্রামে বাসে, এখানেও আসে তেমনি ভাবে। ট্রেনের কামরাগুলো ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয় মালবোঝাই গুদামের মত। পূজোর ছুটির একটা দিন, একটা ঘণ্টা, যেন কেউ নষ্ট করতে রাজী নয়। ওদের মেয়াদ কারুর সাত দিন, কারুর দশ দিন, কারুর বা বডজোর দু'টো হপ্তা! এরই মধ্যে মেরামত করে নিতে হবে হৃতস্বাস্থ্য—শরীরের যার যতটুকু ক্ষয়ক্ষতি।

এদের অধিকাংশই দশটা পাঁচটার কেরানী।

ওরই মধ্যে যারা একটু ভ্রমণবিলাসী, কেউ মুরগী খেয়ে 'বিউটি-স্পট্' খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। কেউ বা পিক্‌নিক করতে ছোটে দল জুটিয়ে পাহাড়-জঙ্গলে, কিংবা কোন ঝর্নার ধারে। আবার কেউ বা কোন পাহাডের মাথায় চড়ে 'সানরাইজ' আর 'সানসেট্' দেখে উচ্ছ্বাস করে 'ওয়ানডারফুল'!

একদল আসে শুধু খিদে করতে আর খেতে। এরা যেন দুর্ভিক্ষের দেশের মানুষ, কতকাল কিছু খেতে পায়নি! কোন খাবার জিনিস যেন চোখে দেখেনি জীবনে। শাক থেকে তরিতরকারী, মাছ, মাংস, দুধ, মিষ্টি, ডিম যা দেখে দু'চোখে, একেবারে হামলে পড়ে কেনার জন্যে। বলে 'ড্যাম্‌চীপ্'!

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এরা শুধু গিলে চলেছে গোগ্রাসে, সব কিছু। কিসের পর কি খাওয়া উচিত, কোনটার পর কোনটা খেলে হজম হয়, সেসব নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর নেই তাদের। শুধু কে কত তাড়াতাড়ি, একটা

খাওয়া হজম করে আর একটা খাবে, তারই জন্তে উদরে স্থান সঙ্কুলান করতে ব্যস্ত। তাই ভোর হতে তর সয় না, খাকী প্যাণ্ট পরে, পাই পাই করে চক্কোর মেরে আসে একসঙ্গে তু'তিন মাইল। তারপর চা, ডিম, তুধ, মিষ্টি কতকগুলো একসঙ্গে পেটে পুরে আবার বেরিয়ে পড়ে সেগুলো হজম করতে। এটা তাদের মধ্যাহ্নের ভুরিভোজের প্রস্তুতি-পর্ব।

তারপর তুপুরে মুরগী, কালিয়া, পোলাও, ক্ষীর, পায়েস ও আরো সব কি একসঙ্গে খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে কোমরের লুঙ্গিটা আল্‌গা করে কেউ দিবানিদ্রা দেয়। আবার কেউ বা বৈকালিক চা জলখাবার পুরোদস্তুর সদ্‌ব্যবহার করার আশায় না ঘুমিয়ে সারা তুপুর বাগানে, রাস্তায়, গাছের তলায় টো টো করে ঘুরে বেড়ায়।

বলে, বিশ্রাম ত সারা বছর রইলই। এই ক'টা দিন, একটু তু'চোখ ভরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে নিই।

আর-একদল আসে পেট রোগা, অম্ল অজীর্ণে ভোগা কেরানী। টনিক, কবিরাজী গুলি, হোমিওপ্যাথি খেয়ে খেয়ে যাদের পেটে চড়া পড়ে গেছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। তারা বলে, জল নয় যেন সালসা জীবন রসায়ন! এক গ্লাস পেটে পড়লেই নাড়ী শুদ্ধ যাকে বলে হজম! কোন্ পাহাড়ের দৃশ্য ভাল, ঝর্না কোন্ দিকে, কোন গাছে ফুল ফুটল কিনা, সে খবর রাখাব চেয়ে, কোন্ বাংলার কুয়োর জল কত হজমী, সে খবর তাদের কণ্ঠস্থ।

বেড়াতে বেরোয় তারা হাতে একটা জলের পাত্র নিয়ে।

সমব্যথী কাউকে দেখলে পথে থমকে দাঁড়ায়। প্রকৃতির দিগন্তবিস্তৃত শোভা নিরীক্ষণ না করে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তোবড়ানো ভাঙা চোয়াল-বার-করা গাল, কোটরগত চক্ষু, অসংখ্য বলিরেখা সম্বলিত সেই বদনমণ্ডলে যেন কি খোঁজে। একজন আর একজনের মুখের ওর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে যেন পরীক্ষা করে এই ক'দিন কার শরীরের কতটুকু উন্নতি হয়েছে।

বলাবাহুল্য সব সময়ই একজনের চোখে আর একজনকে ভাল মনে হয়। তখন সেই এক এবং অদ্বিতীয় প্রশ্ন, কোন্ কুয়োর জল খাচ্ছেন আপনি? বলেন কি, তুধ হজম হচ্ছে, 'উইণ্ড' হয় না?

তারপর কোন্‌দিকে, কতদূরে সেই কুয়ো, কোন্ বাংলায়, তার পথ জেনে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চড়াই উৎরাই পথে, সেই দিকে পা চালায়। সকাল

থেকে রাত্তির পর্যন্ত এদের মনে, শুধু ওই এক চিন্তা কোন্ কুয়োর জল বেশী হজম করায়।

চারটে বাজতে না বাজতে, গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে পায়ে মোজা এঁটে, লাঠি হাতে নিয়ে বেড়াতে বেরোয় এরা। এদের ভ্রমণের সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। বার দুই তিন পায়চারী করে, তারপর ক্লান্ত দেহটা নিয়ে বসে পড়ে, কোন একটা বেঞ্চিতে, ওরই মত আরো কয়েক জনের পাশে। প্রত্যহের দেখা সেই পরিচিত মুখ। পাশে বসে চলে সেই একই আলাপ-আলোচনা। এরা বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি। এক অদ্ভুত ধরনের জীব। শহরের খাঁচায় মানুষ, শহর ছাড়া আর কিছু চেনে না, জানে না। খাঁচার বাইরে তাই এক পা দিতে নারাজ।

নেহাত এ জায়গার জল হাওয়া ভাল, খেলে হজম হয়, লোকের মুখে তাই শুনে ছুটে এসেছে। নইলে এমন জায়গায় ভদ্রলোক আসে! না ইলেকট্রিক না সিনেমা, না রেস্তোরাঁ। এমন কি একটা পাকা রাস্তা পর্যন্ত নেই। মোটর ট্যাক্সি না হোক, সাইকেল রিক্সা নেই, এমন স্থান বোধ হয় আজকের দিনে বিরল। সভ্যতার কোন আলো এখনো এসে পৌঁছয়নি এখানে। আজো তাই কোথাও যেতে হলে হয় চরণজুড়ি, নয়ত গোযান। তাও আগে থাকতে ব্যবস্থা না করলে মেলা দায়।

তাও কি রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থা আছে। গরুর ল্যাজটা মুলে মুখে হেট হেট শব্দ করলেই সে ছুটে চলবে। চারিদিক উঁচু নীচু পাথুরে জমি, তারই মাঝে মাঝে এখানে ওখানে চাষের ক্ষেত, কোথাও বা শুধু বন জঙ্গল।

একদিন গো-যান চড়লে সাতদিন লাগে গায়ের ব্যথা মরতে।

পথে কোথাও একটা কেরোসিনের আলো পর্যন্ত নেই। সন্ধ্যা লাগার অনেক আগে থেকেই এখানের পথে-ঘাটে যেন অন্ধকার নামে। গা ছম্‌ছম্ করে। বাবুরা তাই টর্চ হাতে করে বেড়াতে বেরোয় এবং ভ্রমণের স্বাদ মেটায় ওই রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে।

ছোট্ট স্টেশন। 'হুশ' করে মেল ট্রেন চলে যায়। তবু তাকে চোখে দেখেও বুঝি বাবুদের মনে পুলক জাগে। কোন্ ট্রেন যাচ্ছে, কামরার ওপরে লেখা দেখে পড়তে পড়তে আনন্দে তাদের চোখ দুটো যেন জ্বল জ্বল করে। এই ট্রেনটা কলকাতা থেকে আসছে, এর গায়ে যেন কলকাতার গন্ধ লেগে আছে। শহরের জীব, ওই ট্রেনটা দেখে যেন শহরের সঙ্গে একাত্মবোধ করে। এ এক

অদ্ভুত প্রশ্নের মনোবিকলন।

ট্রেনটা যতক্ষণ না চলে যায়। ঠায় বসে থাকে সেই সব লোকেরা। যদি কোনদিন লেট করে, তাহলেও যতক্ষণ না ট্রেনটা হুইসিল বাজিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে চলে যায়, ততক্ষণ তারাও বসে থাকে সেইখানে!

যেই ট্রেনটা চলে যায়, অমনি সবাই উঠে দাঁড়ায়। আর কারুর বসে থাকার প্রয়োজন নেই। ওই ট্রেনটার সঙ্গে যেন তাদের যত সম্পর্ক। ট্রেনটা লেট্ করলে তেমনি তাদের যেন মাথা ব্যাথার অন্ত থাকে না। বারে বারে ষ্টেশনমাষ্টারকে গিয়ে উত্ত্যক্ত করে, আজ মেলটা ক'মিনিট লেট মাষ্টার মশাই?

আরো একবিষয়ে তাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। সেটা ডাক ঘর। ছোট্ট একটা চালাঘরের বাইরে বিবর্ণ একটা টিনের প্লেটে লেখা ইংরিজীতে পোস্ট অফিস আর তার নীচে হিন্দীতে ডাকঘর। মেটে ঘর, খোলার চাল, রাস্তার দিকের দেওয়ালে রঙচটা পুরানো একটা 'লেটার বক্স' ঝোলে।

এখানে দেখা যায় একশ্রেণীর কৌতূহলী জনতা। চিঠি পিওন গিয়ে যদিও প্রত্যেক বাড়ীতেই দিয়ে আসে, তাতে হয়ত পেতে একটু দেরী হয় বেলা সাড়ে এগারোটা কি বারোটা, কিন্তু সেটুকু ধৈর্য ধারণ করার মত মনের অবস্থা তাদের নয়। যেমন অসহিষ্ণু, তেমনি অধৈর্য।

সকাল আটটা বাজতে ত্বর সয় না, পোস্ট অপিসের দরজায় গিয়ে 'হত্যে' দিতে থাকে তারা। মেল ব্যাগ খুলে চিঠি সর্টিং করতে যতটুকু বিলম্ব, তাও সহ্য করতে তারা পারে না। চিঠি বাছাই করে, তার ওপর যখন সীলমোহর করতে থাকে পিওন, তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ে সবাই তার ঘাড়ের ওপর! যেন বাড়ী থেকে যে জরুরী খবর আসছে, একমুহূর্ত লেট হলে বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু নিলাম হয়ে যাবে।

সবচেয়ে হাসির কথা, এরা হয়ত কেউ দু'দিন কেউ বা আটদিনের জন্য শহরে ছেড়ে বেড়াতে এসেছে এখানে। কলকাতা থেকে বড় জোর দেড়শো কি দু'শো মাইলের দূরত্ব। ট্রেনে পাঁচ ছ' ঘণ্টার পথ।

পিওনকে ঘিরে তারা দাঁড়িয়ে থাকে, তীর্থের কাকের মত। আবার ওরই মধ্যে কে তার কাছ থেকে আগে চিঠিখানা আদায় করবে, তার জন্যে চলে প্রতিযোগিতা।

আগেভাগে হয়ত কেউ একটা সিগারেট, কেউ বা একখিলি পান খাইয়ে এই পিওনকে হাত করে রাখে। কেউ বা পথেঘাটে যখনই দেখা হয়, তার

সঙ্গে যেচে আলাপ করে তার অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। বলে, কাল কিন্তু আমার চিঠিটা আগে চাই। কেমন?

বলাবাহুল্য, সকলকেই সমান আশ্বাস দেয় পিওন। বকশিশের লোভে! যা করে এই ক'টা দিন! তারপর ত সব ভোঁ ভাঁ। লোকজনের আর মুখটি দেখার জো নেই। কে কার কড়ি ধারে!

আবার কেউ বা পোষ্টমাস্টারকে জমায়। তাঁর দেশ কোথায়, কোন্ জেলার লোক, আগে কোথায় ছিলেন, এখানে কতদিন আছেন ইত্যাদি ইত্যাদি সাত-গুষ্টির হিসেবনিকেশ নিতে থাকে।

এছাড়া সংবাদপত্র যদি কারুর হাতে একখানা দেখল ত আর রক্ষা নেই! ভাগাড়ে মড়া পড়লে শকুনির দল যেমন ছেঁড়াছিঁড়ি শুরু করে তেমনি ভাবে সবাই মিলে ঘিরে ধরে খবর পড়ে।

কলকাতায় থাকলে, দিনে রাতে একবার যাদের সংবাদপত্রের পাতা ওল্টাবার সময় হয় না, তাদের এমন একটা ভাব মুখে-চোখে যেন ভূমিকম্পে বোধহয় সমস্ত কলকাতা শহরটা ধ্বংস হয়ে গেছে কিংবা চীনেরা এতক্ষণে কলকাতা পর্যন্ত এসে গেছে। এখন কোন্ দিকে তারা পালাবে, সেই মহা চিন্তা।

শহরের এই অদ্ভুত জীবগুলির চালচলন, আচার-আচরণ সবই যেন কেমন উদ্ভট। শহরকে তারা কত ভালবাসে, এই দেড়শো দু'শো মাইল দূরে এসে যেন বেশী করে বোঝাতে চায় অপরকে। যেখানে প্রেমটা গভীর, তার যথার্থ প্রকাশ বিরহে। অথচ মজার কথা এই যে এদের অধিকাংশই কলকাতার প্রকৃত বাসিন্দা নয়। যাকে বলে 'খাস কলকাত্তাই' তা নয়। ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কেউ বাস করে, কেউ বা মেস-হোটেলে! হয়ত কারুর কারুর শহরতলীতে বাড়ীঘর আছে!

আবার সন্ধ্যা লাগবার অনেক আগেই উঠে পড়েন কেউ কেউ। বিশেষ করে যাঁদের পায়ে মোজা, গলায় কমফর্টার, গরমের ওভারকোট দিয়ে সর্বাঙ্গ মোড়া, তাদেরই তাগাদা বেশী।

কেউ বা বেঞ্চি ছেড়ে উঠতে উঠতে বলেন, যাই বলুন মশাই, আমি অনেক জায়গায় ঘুরলুম, গিরিডির জলের তুলনা হয় না।

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে, আর একজন বিজ্ঞের মত হয়ত উত্তর দেন, রামো! জল-হাওয়ার কথা যদি বললেন, ত ভুবনেশ্বরের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। যা ইচ্ছা খান, যত খুশি খান; তারপর একটি গেলাস দুধ কুণ্ডের জল, বাস্,

দু'টো বাজতে আর তর সইবে না, পেটের মধ্যে চাঁই চাঁই করবে খিদে! নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত হজম করে দেয় মশাই!

বলেন কি! উঠে দাঁড়িয়েছিলেন যে ভদ্রলোক ধপ্ করে বসে পড়েন আবার। তারপর, কোন্ জায়গায় তিনি ছিলেন, বাড়ী-ঘরদোরের ভাড়া কত, কোন্ জিনিসের কি রকম দাম ইত্যাদি ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে থাকেন। যেন এখনি ছুটে চলে যাবেন সেখানে, এমনি ভঙ্গী করেন।

এমনি ভাবে লোকের মুখে শুনে শুনে পরের বারে পূজোর ছুটিতে কে কোন্ জায়গায় যাবেন, তখনি তার একটা প্রোগ্রামও স্থির করে ফেলেন। আবার হয়ত পরদিন সকালেই সে মত পরিবর্তন করেন অপর কারো মুখে চুনারের জল-হাওয়ার গুণাগুণ শুনে।

বলেন কি! চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে প্রশ্ন করেন, আপনি নিজে গিয়েছিলেন, না অন্য কারুর মুখে শোনা? আমি মশাই অনেক ঠকেছি, এইভাবে লোকের মুখে ঝাল খেয়ে।

এই ত উনি রয়েছেন আপনার সামনেই, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন না। বলে নিজের স্ত্রীর দিকে চোখ ফেরান।

দু'পা পিছনে দাঁড়িয়ে তখন তিনি বিরক্তিতে জ্বলছিলেন স্বামীর উপর। একবার গল্প পেলে হয়। বেড়াতে যাওয়া মাথায় উঠে যাবে। কে কোথাকার মানুষ তার ঠিকঠিকানা নেই। বকর-বকর করেই চলেছে। অনেকদিন স্বামীকে তিনি এই নিয়ে তিরস্কারও করেছেন, তোমার এই পরকে উপদেশ দেওয়ার অভ্যাসটা ছাড়বে কি?

তাই কণ্ঠে বিরক্তি চাপতে চাপতে ভদ্রমহিলা সেই অপরিচিত পুরুষের মুখের দিকে না তাকিয়ে, স্বামীকে উদ্দেশ করেই জবাব দেন, তোমার দেহ ওখানকার জল হাওয়া নিয়েছে বলে যে সবাইকার উপকার হবে, সে তুমি কেমন করে জানলে! তাহলে লোকে আর অন্য কোন দেশে না গিয়ে দলে দলে সবাই ওই চুনারে যেত!

ঠিক্, আপনি ঠিক্ বলেছেন। সকলের ধাত ত সমান নয়। এই কথাই আসলে লোক বুঝতে পারে না। আর সকলের পেটের কম্‌প্লেন্-ও একরকম নয়। নইলে এখানকার জলহাওয়া ত কম ভাল নয়। কিন্তু আমার সত্যি কথা বলতে কি এতটুকু উপকার হয়নি। আর আমারই সামনের বাড়ীতে যারা এসেছেন, বললে বিশ্বাস করবেন না, ডজন ডজন মুরগী, সেরে সেরে ক্ষীর

রাবড়ী খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে প্রত্যেকদিন, বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকে আবার চলতে শুরু করেন।

সাঁওতাল পরগণার শেষ ও মুঙ্গের জেলার শুরু—দু'য়ের সংমিশ্রণে অপূর্ব অদ্ভুত প্রাকৃতিক পরিবেশ এই ধানোয়ার রোড জায়গাটার। চারিদিকে অসংখ্য পাহাড়, ছোট বড় নদী, ঝরনা, জঙ্গল বিচিত্র ও মনোমুগ্ধকর। শহর ত নয়ই, এমন কি গ্রামও বলা চলে না এ জায়গাটাকে। এ শুধুই স্বাস্থ্যনিবাস। স্বাস্থ্যান্বেষীদের জন্যে যেন কতগুলি বাংলো ও বাগানবাড়িকে তৈরী করে রেখেছে এখানে ওখানে, পাহাডের গায়ে, ওপরে নীচে, পায়ের তলায়—পাহাডের সানুদেশে, বাঁকাচোরা পথের ধারে, শাল-মহুয়ার ফাঁকে-ফাঁকে। অবগুণ্ঠনবতী নারীর মত, হয়ত তাদের কিছুটা চোখে পড়ে, কিছুটা বা বৃক্ষপত্রের অন্তরালে অদৃশ্য থাকে।

হাট-বাজার, দোকান-পাট, বলতে যা বোঝায়, তার অভাব বললে, সত্যের অপলাপ করা হয়। যা কিছু আছে সবই ওই স্বাস্থ্যান্বেষীদের প্রয়োজনে। ছোট্ট রেল স্টেশনটা থেকে বেরিয়ে এসেই সামনে যে পথটা, তারই কাছে-ভিতে টিম্ টিম্ করে গোটাকতক টিনের ঘর। পূজোর সময়, যাকে বলে এরা 'সিজিন,' তখন মরা গাঙে জোয়ার আসে সেখানে। এইসব দোকানে তখন পেট্রোম্যাক্স-এর আলো জ্বলে ওঠে, সামনে বেঞ্চি পেতে রাখে দোকানীরা, খরিদ্দারদের বসিয়ে আপ্যায়িত করার জন্যে।

তাই সিজ্‌ন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পেট্রোম্যাক্সটা তারা ভেতরে তুলে রাখে। খরচ পোষায় না। তার বদলে কেরোসিনের লণ্ঠন ঝোলে দোকানের ঝাঁপে, ঝড়তি পড়তি মালপত্তর যার যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাই নিয়ে চলে বিকিকিনি। শুধু শ্মশান আগলে পড়ে থাকার মত।

এ সময়টা সকলেরই দুর্দিন। কেবল স্থানীয় লোক নয়, আরো বহু দরিদ্র চাষী মজুর অধিকাংশেরই দিন কাটে অর্ধাশনে বা অনশনে।

মাথায় করে কাঠ নিয়ে পাহাড়ের দিক থেকে যারা বিক্রী করতে আসে, তারা ক্রেতার অভাবে যেমন ফিরে যায় মুখ শুকিয়ে, তেমনি দেহাতি, গোয়ালা, চাষী, কামার-কুমোর, যারা পাহাড় ডিঙিয়ে কাঁধে বাঁক ঝুলিয়ে মাল বয়ে নিয়ে আসে, তারাও খরিদ্দারের অভাবে হতাশ হয়ে চলে যায়। অথচ এই ফাল্গুন, চৈত্র সময়টা নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। তাই শুনেই সরমারা ছুটে এসেছিল এখানে। লোক যে এ সময়ে কেউ একেবারে থাকে না, তা নয়,

দীর্ঘদিনের রোগে ভোগা, ডাক্তারের 'এলে' দেওয়া 'ক্রনিক' রুগী যারা, তাদেরই অধিকাংশ পড়ে থাকে এই সময়ে। সিজ্‌ন্‌ চলে যায়, শীত শেষ হয়, ফাগুনও যায়-যায় করে তবু তারা যায় না। বুঝি তাদের আর কোন চুলোয় যাবার ঠাঁই নেই। কিংবা তাদের ঘর থেকে বিদায় করে বেঁচেছে তাদের অভিভাবকরা ও আত্মীয়স্বজনরা।

কত দীর্ঘশ্বাস, কত হা-হুতাশ এইসব বড় বড় বাগানবাড়ীর অন্দরে কন্দরে হয়ত লুকিয়ে আছে! কে জানে।

নির্জন পথে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে এক একটা বড় বাড়ীর দিকে তাকিয়ে এমনি কত সব অনুভূতি জাগে সরমার মনে।

॥ ৩৫ ॥

মুদীর সঙ্গে সরমার আলাপ হয়েছিল আগেই। রামলাল সাউ, মাড়োয়ারীর দোকানটা ওখানে সবচেয়ে বড়। তাই প্রথম দিন থেকেই সরমা বাবার সঙ্গে ওই দোকানে আসে জিনিস কিনতে। প্রৌঢ়, বছর চল্লিশ আগে এখানে এসেছিল বাপের দোকানে কাজ করতে। বাপ মরে গেছে তাও হলো বিশ বছর। তারপর থেকে সে-ই মালিক ঐই দোকানের, তবু কিন্তু এ দোকানের উল্লেখ করতে গেলে লোকে বলে কিষণলালের দোকান। রামলালের বাপের নাম ছিল কিষণলাল। কিন্তু সে নামটা এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও লোকের মন থেকে মুছে যায়নি দেখে অবাক লাগে সরমার।

একদিন সোজাসুজি সে জিজ্ঞেস করে বসলো, আচ্ছা, সাউজী তোমার বাবা তো মরে গেছে কুড়ি বছর হলো। তবু লোকে কেন বলে কিষণলালের দোকান, তোমার নাম করে না কেউ?

দাঁড়ি পাল্লায় মাল ওজন করতে করতে মুদী বলে, বাবা যখন এখানে দোকান করে তখন কোথাও আর কোন বড় দোকান ছিল না। তিলুয়ার হাট থেকে পর্যন্ত লোকেরা আসতো এখানে মাল কিনতে। সকলে তাই এখনো এ দোকানের নাম ভুলতে পারেনি, এটা আমার কারবারের পক্ষে খুব ভাল। বাবার সেই সুনামটা এখনো যাতে থাকে তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি, ভাল চীজ ছাড়া খারাপ কিছু রাখি না।

ছাই ভালো চীজ। চালে কাঁকর, ডাল সিদ্ধ হয় না, ঘিয়ে দালদার গন্ধ!

এ তো পাথরের জায়গা দিদিমণি চালমে দু'একটা পাথর থাকবেই। তবে ডাল কেন গলবে না? এখানের অড়হড় ডাল ত সবচেয়ে আচ্ছা।

হাঁ। অড়হড় ডাল খেয়ে মরি আর কি পেটের অসুখে। তারপর এই বিদেশে কে দেখবে শুনি!

এখানের অড়হড় খেলে পেটের কোন অসুখ করবে না দিদিমণি। এ তোমার বাংলা দেশের জল নয় যে অম্বল হবে খেলে। এখানে ত সব কুঁয়োতে ঝরনার জল। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেমালুম সব হজম হয়ে যাবে। তুমি কিছু ভয় করো না দিদিমণি। আচ্ছা, একরোজ আমার কথা শুনে এক পোয়া ডাল নিয়ে গিয়ে দেখো।

বেশ দাও দেখি, তারপর যদি অসুখ করে, তখন কিন্তু তোমার কাছ থেকে ডাক্তারের খরচা আদায় করবো। বলে হাসে সরমা।

হাঁ, হাঁ জরুর!

হ্যাগো সাউজী, তোমাদের এখানে ভাল ডাক্তার আছে?

হাতের দাঁড়িটা থামিয়ে রামলাল জবাব দেয়, হাঁ দিদিমণি, থাকবে না কেন, তবে ভাল কি মন্দ জানি না!

সে কি! বলে মুখ টিপে হাসে সরমা।

হাঁ, সত্যি বলছি দিদিমণি। এখানে ওই একটাই ডাক্তার আছে—বোসবাবু। বড বড় অনেক ডাক্তার ত এসেছিল লেকিন্ কেউ টিঁকতে পারলো না। দু'এক বছর দেখে সরে পড়লো।

সরে পড়লো, কেন?

কি করবে দিদিমণি, বসে বসে খালি ধুলো ঝাড়বে টেবিলের? রুগী-পত্তর কোথায় মিলবে? জল হাওয়া এখানের এত ভাল যে লোকের অসুখ ত করে না বরং দু-চার রোজ থাকলেই রোগ ভাল হয়ে যায়!

তাই নাকি? তাহলে তোমাদের এখানে রোগ বলতে কিছু নেই বলতে চাও!

হাঁ, আছে। এই 'বসন্ত'টা খুব হয় বছরে একবার করে, আর কখনো কখনো কলেরা হয় গ্রামের দিকে। এ ছাড়া আর কোন অসুখের কথা ত শুনিনি।

তোমরা তাহলে খুব সুখে আছো। শহরে লোকেরা রোগের জ্বালায় অস্থির, তার পিছনেই তাদের অর্ধেক খরচ হয়ে যায়!

খরিদ্দারদের জিনিস ওজন করে দিতে দিতে, হঠাৎ একটু থেমে রামলাল বলে, সেইজন্যেই ত দিদিমণি আমাদের এ জায়গায় তোমরা আসো। নইলে শহরের লোকেদের নজর পড়বে কেন এরকম জংলী জায়গা? দুনিয়ায় কত বড় বড় জায়গা রয়েছে! এর নাম ক'টা লোক শুনেছে! আমাদের কাজ কারবার ব্যবসা যা কিছু দেখছো সবই চলে তোমাদের কৃপায়!

সরমা ঠাট্টা করে বলে, তাহলে তোমরা চাও শহরের লোকেদের খুব অসুখ করুক, এই ত?

রামকহোজী! বলে সাউজী জিব কামড়ালে। নোটের চেঞ্জ খরিদ্দারকে গনে দিচ্ছিল, হাত বন্ধ করে বলে, না দিদিমণি, এই টাটে বসে বলছি আমি চাই তোমার মত লোকেদের অসুখ এখানে এসে ভাল হোক। কিন্তু তোমাদের শহরের লোকেরা এখানে আসে না। যদি বা আসে তাহলে থাকতে চায় না। বলে, বিজলী বাতি নেই, সিনেমা নেই ট্রামবাস গাড়ী নেই, এখানে ভদ্দর আদমী কি থাকতে পারে? দেহাতি লোক যারা জিনিস কিনছিল তাদের মধ্যে একজন হেসে উঠলো। ই ত জংলী দেশ, ইখানে উসব কুথাকে পাবেক!

মুদী বলে, কিন্তু সে লোকেরা একথা বোঝে কৈ! আমার দোকানে মাল কিনতে এসে, কত নিন্দা করে এ জায়গার, সব শুনি। আচ্ছা দিদিমণি, একটা কথা আমায় সত্যি বলো ত, আমি ঠিক বুঝতে পারি না, তোমার শহরের লোকেরা কি হররোজ সিনেমা দেখে!

না। তা দেখে না বটে তবে নতুন বই এলেই দেখতে ছোটে ভাল মন্দ বিবেচনা না করেই, এমন লোকের অভাব নেই।

মুদীর মুখে এবার একটা করুণ হাসি ফুটে ওঠে। বলে, রোগের চেয়ে বড় ত সিনেমা নয় দিদিমণি!

ফিক্ করে হেসে জবাব দেয় সরমা, কে বলেছে, ওটা ও যে একটা শহুরে লোকের রোগ!

লেকিন সব্‌সে পহ্‌লা ত জান বাঁচানা, দিদিমণি! জীবনের চেয়ে বড় আর কি আছে দুনিয়ায়॥ বললে তুমি রাগ করো না দিদিমণি, এত লোক আসে রোগ ভাল হয়ে চলে যায়, কিন্তু তোমার বাঙ্গালী লোকেরা বড় অধৈর্য, বড় অসহিষ্ণু, সব সময়ই এ নাই—ও নাই—মাছ নাই, রাবড়ী নাই, পটল পাওয়া যায় না কেন, রোজ রোজ কি বেগুন খেতে ভাল লাগে? তাদের অভিযোগের অন্ত নেই!

সরমা আর চুপ করে থাকতে পারে না। সাউজীকে থামিয়ে জবাব দেয়, কি করবে বাঙ্গালীদের জিবে যে ভগবান স্বাদ দিয়েছে, রুচি দিয়েছে। তোমাদের মত শুধু দিনের পর দিন ছাতু খেয়ে কিংবা গম চিবিয়ে থাকতে শেখেনি ত তারা!

হাঁ। ও ত ঠিক দিদিমণি। বাঙ্গালীর সবসে আচ্ছা খানা-পিনা, পরনা, সবদিক থেকে দেখলে, ওর তুলনা হয় না আর কোন জাতের সঙ্গে। লেকিন্ বাত্ ইয়ে হ্যায় যে, দু'তিনটা মাস যদি একটু কষ্ট করে থাকে, এখানে যা মিললো তাই খেলে, তাহলে ত রোগটা সেরে যায় দিদিমণি। আর রোগটা সারলে তখন যত ইচ্ছা ভাল খাও না, এটা তোমার লোকেরা বোঝে না কেন? দু'তিনটে মাস এখানে থেকে দেখো, কি ভাল এখানকার জল হাওয়া। কত দেশ থেকে কত ভারী ভারী রুগী সব আসে, তারপর সুস্থ হয়ে চলে যায়, এখানে যা মিলছে, ওই খাচ্ছে তারা। কেউ বলে না, পটল চাই, রাবড়ী চাই। পটল এখানে কোথায় মিলবে। এ পাহাড়ী জায়গায় ত পটল ফল্‌তা নেই। এখানের মাটিতে বেগুন, লাউ, কুমড়ো, ভিণ্ডি, এইসব জন্মায় কিন্তু তোমার লোক এসব খেতে চায় না। আর তারা আসে খারাপ সময়। পূজার সময়। তাই তখন আমাদের এখানে 'সিজিন' লেগে যায়, সব কুছ জিনিস মেলে ওই সময়। কিন্তু জল হাওয়া সব থেকে ভাল এই সময়টা দিদিমণি। ফাগুন চৈত্র এই দুটো মাস এখানে থাকো তোমার চেহারা লাল বনে যাবে!

তাই নাকি? ওকথা যখন যেখানে চেঞ্জ-এ গেছি, সেখানকার লোকেরা বলেছে, কিন্তু ওই পর্যন্ত! বলে সরমা একটু ম্লান হাসে।

সাউজী বলে, আমার এ ধানোয়ার রোডে তুমি ত কখনো আসোনি দিদিমণি। আচ্ছা, দু'মাহিনা বাদ দেখো, হামার বাত্ সাচ কি ঝুটা! একদম নতুন জীবন নিয়ে এখান থেকে চলে যায় কত মেয়ে তোমার মত।

নতুন জীবন, কথাটা কানে যেতে হঠাৎ ধক্ করে ওঠে সরমার বুকটা! কি হবে নতুন জীবন নিয়ে, শয়তান বিশ্বাসঘাতক পুরুষের কামনার আগুনে ইন্ধন যোগাবার জন্যে! ঘেন্না ধরে গেছে তার পুরুষদের ওপর, তার চেয়ে এই মূর্খ অশিক্ষিত, জংলী মানুষগুলো ঢের ভাল! এদের বোঝা যায়, জানা যায়! বিশ্বাসঘাতক শুভেন্দু তার জীবনটা চিরদিনের জন্যে নষ্ট করে দিয়ে গেছে।

বিপিনবাবুর এ জায়গাটা সব চেয়ে ভাল লাগে। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মেয়েকে বলেন, তুই যাই বলিস সরো, এ জায়গার তুলনা হয় না! ফুলডিহী, কুসুমতলা, লাগে না এর কাছে।

সরমা হেসে ওঠে। আসল কথা এখানে বেশী চড়াই উৎরাই তোমায় ভাঙতে হয় না, পথঘাটগুলো ধীরে ধীরে এমনভাবে ওপরে উঠে গেছে যে হাঁটবার সময় মনেই হয় না, এত উচুঁতে উঠছি। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কারণ হলো, আমরা যে এসেছি বসন্তকালে। চারিদিকে কতরকমের ফুল ফুটে রয়েছে! পলাশ ফুলের নাম বইয়ে পড়েছিলুম, কখনো চোখে দেখিনি, এত সুন্দর যে, কে জানতো তা। সত্যি, মনে হয় যেন বনে বনে, আগুন ধরে গেছে। যেদিকে তাকাও শুধু লাল, আর লাল।

রবীন্দ্রনাথের সেই গানটার কথা মনে পড়ে সব সময়, না বাবা? সখি রে, আগুন লেগেছে বনে বনে।

সরমার মা বলে ওঠেন, কেন ওই কনিকার ফুলগুলোর শোভা কি কম! হলুদ রঙের ঝুরি ঝুল্‌ছে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে। মনে হয় যেন গাছের ডালগুলো সব কানবালা পরে সেজেছে।

বিপিনবাবু বলেন, আর মহুয়া গাছগুলোকে দেখেছিস সরো। কোথাও একটা পাতা নেই। শুধু থলো থলো মহুয়া ফল ধরে আছে, ডালে ডালে। সোনালীরঙের ওই ফলগুলোকে অনেকটা আঙ্গুরের মত দেখতে। রসে ডুবডুব করছে। আর তেমনি সুগন্ধ, অনেক দূর থেকে নাকে ভেসে আসে। ফলগুলো পেকে পেকে সারাদিন রাত ধরে কেবল টুপ-টাপ করে পড়ছে— গাছের তলাটা বিছিয়ে থাকে।

সরমার মা বলেন, আমি কালকে অনেকগুলো কুড়িয়ে এনেছিলুম, আজ গরম ভাতের হাঁড়ীর ভেতর কয়েকটা ফেলে দিয়েছি। ঠিক যেন পায়েসের চালের খোশবাই ছাড়ছে!

তাই নাকি?

হাঁ, খাবার সময় দেখিস!

সরমা বলে, জানো বাবা, সাউজী সেদিন বলছিল, এখানে কোন ডাক্তার

নেই। যারা আসে, দু'চারদিন দেখে নাকি সরে পড়ে। রোগ ব্যায়রাম বলতে কিছু নাকি নেই এখানে।

কথাটা ঠিকই। বিপিনবাবু বলেন, আমার দু'চারজন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাঁরা বারো মাসই এখানে থাকেন। তাঁরাও ওইকথা বলেছিলেন। কলকাতার ঘর বাড়ী ফেলে এখানেই তাঁরা বসবাস করছেন অনেকদিন ধরে।

সত্যিকথা বলতে কি, সরমারও মনে এক-একদিন এমনি সাধ জাগে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না সেকথা কাউকে। প্রথম দু'চারদিন মনে হয়েছিল এরই মধ্যে কি করে দীর্ঘদিন কাটবে। জনহীন, পরিত্যক্ত কতগুলো শুধু বড় বড় বাড়ী আর বাগান পড়ে আছে। অন্য অন্য জায়গায় যেমন আদি-বাসীদের সব ঘর ছিল নিকটেই, এখানে সে রকম কিছু ছিল না। ওই এক-একটা বাগানে একজন করে যে মালী থাকে তাদেরই পথে-ঘাটে নজরে পড়তো, তাছাড়া হো, মুণ্ডা, সাঁওতাল আদিবাসী যারা অনেক দূরে পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে বাস করে, তাদের কারুর কারুর সাক্ষাৎ মিলতো বাজারের দিকে গেলে। পথে ঘাটে ফেরি করতে আসতো তারা কোন কোন দিন।

এই নির্জন বাস প্রথমটা তার কাছে বনবাস বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কয়েকটা দিন যেতে না যেতে সরমার কাছে সেই নির্জনতার অভিশাপ ঈশ্বরের আশীর্বাদে রূপান্তরিত হয়। এত ফুল, এত গন্ধ, চতুর্দিকে এত শোভা, সব যেন তার জন্যেই কে সেখানে সাজিয়ে রেখেছে বলে মনে হয় সরমার।

ফুল ফুটে আছে গাছের ডালে ডালে, তোলবার লোক নেই। ফল পেকে পড়ে থাকে মাটিতে, মালীর নজরে না পড়া পর্যন্ত ধুলোতে গড়াগড়ি যায়।

সরমাদের বাগানের মালি নান্দুয়ার একটা ছোট ছেলে ছিল। বাপের সঙ্গে সঙ্গে সব সময় সে বাগানে ঘুরে বেড়াতো। গাছের ফলটা, ক্ষেতের ফসলটা তুলে নিয়ে চলে যেতো সে বাড়ীতে। অনেক দূরে, পাহাড়ের দিকে যেখানে পথটা মনে হয় যেন হারিয়ে গেছে সেইদিকে।

ছেলেটার নাম দামধাড়া, বাপ বাড়ীতে খেতে যায় না, সে-ই বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে আসে গামছায় বেঁধে।

নান্দুয়া গামছা পরে বাগানের কুয়োতলায় স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরে যখন নিদ্রা দেয়, ছেলেটা তখন এ-গাছে ও-গাছে উঠে দৌরাত্ম্য করে। কখনো কোন গাছের ডালে বাদুড়ের মত চুপ করে ঝুলে থাকে, কখনো দোল

খায়, কখনো বা কোন উঁচু গাছের একেবারে মগ ডালে উঠে চুপচাপ বসে থাকে, হয়ত কোন একটা পাখী কোথা থেকে ডেকে উঠলে, কণ্ঠে সে স্বর নকল করে সে তখনি তার সাড়া দেয়।

তাকে চা খাইয়ে ভাব জমিয়ে নিয়েছিল সরমা খুব।

দুপুর বেলা তাকে সঙ্গী করে সে বেরিয়ে পড়তো ঘুরতে এ-বাগান, সে-বাগান। এ ঘোরার মধ্যে একটা নতুন উন্মাদনা ছিল সরমার। এক একটা বাগানের কাছ এসে সে থমকে দাঁড়াতো, এক এক রকমের ফুলের শোভা তার দৃষ্টি যেন কেড়ে নিতো জোর করে।

ওটা কি ফুল রে দাম্‌ধাড়া? বলে সেই অজানা ফুল গাছটার দিকে আঙ্গুল দেখায় সরমা।

ধাতুপ্‌ ফুল।

আর ওই যে তার পাশে, ওটা?

দেবকাঞ্চন!

আম গাছগুলোতে নতুন পাতা কাঁপে। আমের বোল ঝরে গিয়ে গুটি ধরেছে। সবুজ রঙের ছোট ছোট আম এক একটা গাছে অসংখ্য ধরেছে। নতুন পাতার গন্ধের সঙ্গে ফুলের বিচিত্র সৌরভ ক্ষণে ক্ষণে সচকিত করে তোলে সরমাকে।

রাস্তার দু'পাশে বাগান! সব বাগানেই নানা রকমের ফল ও ফুলের গাছ। কত নাম-না-জানা বন্যকুসুম লতা বড় বড় গাছের ডালে জড়িয়ে রয়েছে! হাওয়ায় দুলছে কোনটা, কোথাও বা ফুলগুলো যেন শিউরে শিউরে উঠছে।

একটা বেলগাছের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে সরমা। একটা পাতা নেই গাছটার দেহের কোথাও। শুধু মনে হচ্ছে যেন কতকগুলো বেল কে সেই শুকনো গাছটার ডালপালার মধ্যে আটকে দিয়েছে। এত বড় বড বেল, একসঙ্গে যে কত ফলে, তা চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না।

ছেলেটার শ্যেন দৃষ্টি ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করেছিল একটা পাকা বেল কোথায় যেন পড়ে আছে। চোক্ষের নিমেষে পাঁচীলটার একটা ভাঙা গর্তের ভেতর দিয়ে বাগানে ঢুকে, বেলটা কুড়িয়ে এনে সরমার সামনে ধরে সে বলে, লিবে দিদিমণি?

না-না—তুই নে। আমি চাই না।

প্রত্যাখ্যান করামাত্র ছেলেটা ছুটে পাঁচীলের কাছে গিয়ে বেলটা ধরে

ইঁটের ওপর সজোরে ঘা মারতেই সেটা ফেটে দু'খানা হয়ে গেল। তখন দু'হাতের চাপে খানিকটা অংশ ভেঙ্গে নিয়ে খেতে শুরু করে দিলে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বোধহয় মিনিট দশেকের মধ্যে সেই বৃহৎ ফলটার সবটুকু শাঁস নিঃশেষে খেয়ে খোলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে রাস্তায়।

হাঁরে দামধাড়া, তুই বাড়ীতে আজ কি খেয়েছিস? জিজ্ঞেস করে সরমা।

খেয়েছি এই ঘাটাই, শাকসিদ্ধ, বলে মুখে একটা সুর টানে।

সরমা আরো কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামনের বাগানে তারই বয়সী একটি তরুণীকে একটা আমগাছের ওপরে উঠে কাঁচা আম পাডতে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কি দস্যি মেয়ে রে বাবা! পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙার ভয় নেই!

ওদিকে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল ছোট ছোট দুটি ছেলে-মেয়ে। তারা আম কুড়োচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে কাঁচা আমে কামড় দিচ্ছিল।

গাছের ওপর থেকে মেয়েটি ধমকাচ্ছিল তাদের, এই এখন খাসনি, আমি গিয়ে কেটে নুন মাখিয়ে আচার করে দেবো তোদের!

সরমাকে দেখতে পেয়ে গাছের ওপর থেকে একটা লাফ দিয়ে নীচে নেমে আসে মেয়েটি। তারপর কেমন একটু অপ্রস্তুত ও লজ্জিত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে সরমার দিকে।

সরমাই প্রথম কথা বলে, এটা বুঝি আপনাদের বাড়ী?

না ভাই, আমরা ভাড়া এসেছি, এখানে।

সরমা বলে, কতদিন এসেছেন?

তা, পনেরো ষোল দিন হয়ে গেল।

ওমা আপনারা এতদিন রয়েছেন এখানে, একদিনও ত আপনাদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে দেখা হয়নি।

মেয়েটি বলে, আমরা ত এর আগে অনেকবার এসেছি, তাই নতুন লোকদের মত প্রত্যেকদিন নিয়ম করে বেড়াতে বেরোই না!

সরমা বলে, আপনারা বুঝি আগেও এসেছেন এখানে?

হাঁ, এই নিয়ে আমার চার বার হলো। এই এক বাড়ীতেই প্রতিবারে আসি আর এক মাস, দেড় মাস থেকে চলে যাই। এখানে অনেক লোকের ধারণা, এটা বুঝি আমাদের নিজেদের বাড়ী। বলে ফিক করে হেসে, মেয়েটি প্রশ্ন করে, আপনারা কোন্ বাড়ীতে উঠেছেন?

লাল কুঠিতে!

ও সেই পদ্মপুকুরের ধারে যে বড় শালবাগানটা তার সামনের বাড়ীটায় না?

হাঁ।

কিন্তু আমরা ত তিন চার দিন আগে ওই দিকেই গিয়েছিলুম বেড়াতে, কৈ আপনাদের ত দেখতে পাইনে। আপনারা কতদিন হলো এসেছেন?

এই এক হপ্তা পুরো হলো। তবে আমরা ত কেউ-ই বিকেলের দিকে বাড়ী থাকি না! সাড়ে চারটে বাজতে ত্বর সয় না, বাবা তাড়া লাগাবেন বেড়াতে বেরুবার জন্যে। এখানের লোকরা তাঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে যত ঘুরে বেড়াবেন বাইরে বাইরে, তত তাড়াতাড়ি শরীর সকলের সুস্থ হয়ে উঠবে। বলতে বলতে হেসে ফেলে সরমা।

মেয়েটি বলে, হ্যাঁ, তিনি ঠিকই বলেছেন। এই সময় এখানে একরকম হাওয়া ওঠে। লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, ঠিক সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাত একটা দমকা হাওয়া জোরে বইতে শুরু করে শন্‌শন্‌ শব্দে এবং সেই হাওয়া সারা দুপুর ধরে চলে। আবার ঠিক সাড়ে তিনটের সময় বন্ধ হয়ে যায়। এখানের লোকেরা এই হাওয়াটাকে বলে 'পশ্চিমাই'। খুব স্বাস্থ্যকর নাকি এই হাওয়া। যত নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা যায় তত নাকি শরীরের সব ব্যাধি দূর হয়।

আপনার কি অসুখ ভাই?

অসুখ! বলে' একটু থেমে সরমা জবাব দেয়, এই হজমের গোলমাল। যা খাই কিছুই হজম হয় না! অথচ যে ক'দিন এই রকম বাইরে বাইরে থাকি, কোন 'কম্‌প্লেন্‌' নেই। মাংস, ডিম থেকে পায়েস—সবই খাচ্ছি একসঙ্গে। দিব্যি আছি।

এতদিন কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় ঘুরেছেন জানি না, তবে এই বারে ঠিক স্থানে এসে পড়েছেন। কিছুদিন চেপে থাকুন এখানে। দেখবেন সব রোগ পালাবে; এত ক্ষিদে যে শেষ পর্যন্ত খাদ্য যোগানো দায় হবে!

তাই নাকি!

হাঁ, সেই জন্যে ত আর কোথাও নয়, বার বার এইখানেই আসি!

সরমা এবার বলে, আপনারও কি আমার মত পেটের ব্যায়রাম?

মুচকি হেসে মেয়েটি জবাব দেয়, না।

তবে?

মাথার ব্যায়রাম।

সেকি! বলে কণ্ঠে যখন বিস্ময় প্রকাশ করে সরমা তখন হেসে ফেলে মেয়েটি, আমার নয়।

তবে, কার?

আমার কর্তার! বলে হাসতে থাকে।

কর্তার! তার মানে আপনার বিয়ে হয়েছে নাকি? ওমা, আমি এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি, আপনার সিঁথিটা চুলে ঢেকে আছে কিনা? তা কতদিন হলো বিয়ে হয়েছে ভাই আপনার?

এই ছ'বছর পূর্ণ হলো।

ওমা, আপনাকে দেখলে কিন্তু মনেই হয় না যে এতদিন বিয়ে হয়েছে!

আমার কর্তারও তাই বক্তব্য। তিনি বলেন যে কলকাতার এই বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে সম্ভব হলে প্রত্যেকটা লোকের অন্ততঃ বছরে একটা কি দু'টো মাস বাইরের কোন পাহাড় জঙ্গলে-ভরা স্বাস্থ্যকর স্থানে কাটানো উচিত। তাই বিয়ের পর থেকেই প্রত্যেক বছর আমি বাইরে আসি শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে।

ছোট ছেলেমেয়ে দু'টির দিকে তখন আঙুল দেখিয়ে সরমা প্রশ্ন করে, এটি কি আপনার নাকি?

রক্ষে করো। এরা আমার বড় ননদের ছেলেমেয়ে। তিনিও এসেছেন কিনা শাশুড়ীর সঙ্গে।

যাই বলুন, আপনার স্বামীর এই 'আইডিয়াটি' কিন্তু চমৎকার।

ঠোঁটের কোণে হাসি টিপে মেয়েটি এবার জবাব দেয়! তিনি বলেন, মেয়ে-ছেলে, বিশেষ করে কোন তরুণী যুবতী অসুস্থ, এ তিনি নাকি কল্পনাও করতে পারেন না! তাই প্রতি বছর তাঁর হুকুমে একটা মাস বনবাসে কাটাতে বাধ্য হই। নইলে রোগ বলতে সত্যি ভাই আমার কোন কিছু নেই। এটা স্রেফ ওঁর মনের একটা ব্যাধি!

সরমা মুহূর্ত কয়েক নীরব থেকে পুনরায় বলে, এই ভাবে প্রতি বছর বাইরে স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকেন বলেই হয়ত আপনি এত সুস্থ আছেন। এবং সত্যি কথা বলতে কি আপনাকে দেখে কেউ বলবে না যে বিবাহিতা। আবার একটু ভেবে, সরমা বলে, আপনার স্বামী বোধহয় খুব রোম্যাণ্টিক না? নইলে আমাদের ঘরে বৌ সম্বন্ধে এরকম উক্তি ষড় একটা সাধারণ লোকের মুখে শোনা যায় না?

রোমান্টিক না ছাই, তবে এটা তাঁর একটা মানসিক ব্যাধি। তিনি চান, তার বৌয়ের অসুখ করবে না কখনো! সব সময় সুস্থ, সবল, চঞ্চল হাসিখুশী মুখ যেন দেখতে পান তিনি!

ভালই ত! তা আপনি রাগ করছেন কেন, ভাই। এর মধ্যে আমি ত ভদ্রলোকের ওপর কোন অপরাধ দেখতে পাচ্ছি না। স্বাস্থ্যই ত সম্পদ!

এখন আপনি পাবেন না। আপনার যখন বিয়ে হবে তখন বুঝতে পারবেন আমার এ কথার অর্থ কি? বলে একটু মুচকী হাসল। তারপর বললে, আপনি বুঝি খুব লেখাপড়া করেন?

কি করে জানলেন?

ফিক্ করে হেসে, মেয়েটি উত্তর দিলে, আমার শ্বশুরমশায়ের ধারণা আজকাল ঘর ঘর এই যে সব বড় বড় মেয়ে বিয়ে না করে কেবল মোটা মোটা বই মুখস্থ করে তিনটে চারটে পাশ করছে, এটাই নাকি যত রোগের গোড়া! এই যে আপনার বদহজম, চোখে চশমা—এ সবই তার লক্ষণ!

সরমা জবাব দেয়, অবশ্য লেখাপড়া একদিন করতুম, উপস্থিত বেকার, কিছুই করি না।

আপনি কি পাশ ভাই?

বি, এ—আপনি?

শুধুই স্কুল ফাইন্যাল! লেড়াপড়া করার খুব সাধ ছিল, কিন্তু তাতে বাদ সাধলেন শ্বশুর ও শ্বশুরপুত্র—দু'জনেই।

শ্বশুরপুত্রও? বলে হেসে ফেলে সরমা।

হাঁ, তিনি বলেন, তুমি তিন-চারটে পাশ করে কি করবে? আমায় উপার্জন করে খাওয়াবে, না, আমায় লেখাপড়া শেখাবে? তাঁর ধারণা, ওই একটা পাশই নাকি যথেষ্ট মেয়েদের পক্ষে। সংসারধর্মই এদেশের মেয়েদের আসল কাজ। চাকরী করা নয়। মেয়েদের এই চাকরী করার ফলেই নাকি সংসারে যত গণ্ডগোল, যত অশান্তি!

সরমা হাসে। বলে, আজকাল এরকম লোক আছে নাকি? জানেন, আমরা যে বাড়ীতে ভাড়া থাকি, দু'তালায় তিনতালায় আরো তিনঘর ভাড়াটে আছে। তাদের বাড়ীতে দেখেছি, মেয়ে দেখতে এসে, ভদ্রলোকেরা আগে প্রশ্ন করেন, মেয়ে কি করে?

তার মানে?

অর্থাৎ মেয়ে চাকরী-বাকরী কিছু করে কিনা! আর যখন শোনেন—না, তখন আর মেয়ে পছন্দ হয় না। মেয়ে কালো কিংবা দাঁতটা একটু উঁচু কিংবা চোখ দু'টো বড্ড ছোট ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে চলে যান। আর একশ্রেণীর লোক দেখেছি যাঁরা ঠিক ওই ভাবে স্পষ্টাস্পষ্টি মুখের ওপর চাকরী করে কিনা জিজ্ঞেস না করে মেয়ে ক'টা পাশ করেছে, অর্থাৎ চাকরীর যোগ্যতা কতখানি সে অর্জন করেছে বি. এ, বি. টি, কি এম. এ, বি. টি কিংবা শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং জানে কিনা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে।

তার মানে শুধু বৌ পেলে চলবে না, রোজগারী বৌ হওয়া চাই! আর বাপের বাড়ীতে যদি রোজগার না করে, তাহলে অন্তত শ্বশুরবাড়ী এসে উপার্জন করতে পারবে, কিনা সেটা আগে থেকে যাচাই করে নেয়!

একটু থেমে মেয়েটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, বাবা, খুব জোর বেঁচে গেছি।

সরমা প্রশ্ন করে, কেন?

তাহলে কেবল স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হলে চলতো না। সারাদিন আপিসে গিয়ে আরো দশটা পুরুষের মনোরঞ্জন করে টাকা এনে, স্বামীর রুগ্ন সন্তানদের ওষুধপথ্যের ব্যবস্থাও করতে হতো! ভাগ্যিস বেশী লেখাপড়া শিখিনি! ঈশ্বর রক্ষা করেছেন!

সরমা হাসি চেপে জবাব দিলে, সত্যি, খুব ভাল করেছেন!

এতই যদি জানেন ত এ ভাল কার্যটা আপনিও ত করতে পারতেন!

সকল অভিভাবকের মত ত এক রকম নয় ভাই! বলেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায় সরমা।

মেয়েটি তখন প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে, আলাপ ত হয়ে গেল, এবার আপনার মা-বাবাকে নিয়ে একদিন আসবেন। কেমন?

সরমা বলে, আপনারাও ওদিকে গেলে, একবার আমাদের বাসায় 'ঢুঁ' মেরে যাবেন, কেমন?

নিশ্চয়ই। বলে মেয়েটি যেমন বাচ্ছা দুটোর হাত ধরে বাড়ীর ভেতর যাবার জন্যে পা বাড়ালে, অমনি তারা দু'জনে কচিকচি গলায় বলে উঠলো, 'টা-টা', আবার আসবেন কিন্তু।

সরমা হাসতে হাসতে হাতটা উঁচু করে তাদের 'টা-টা' করে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। বললে, নিশ্চয় আসবো। তোমরাও যেয়ো কিন্তু মামীমাকে নিয়ে আমাদের বাড়ী, বুঝলে?

দিন তিনেক পরে বেড়াতে বেরিয়ে মা বাবাকে নিয়ে সরমা এই দিকে এলো। বললে, সেদিন অনেক করে আসতে বলেছিল, চলো আজ ওদের সঙ্গে একটু আলাপ করে যাই।

কিন্তু ফটকের ভেতর ঢুকে থমকে দাঁড়ায় সরমা। দেখে, তালা ঝুলছে ঘরে।

ওমা! এরি মধ্যে বেড়াতে চলে গেল নাকি! তবে যে সেদিন বললে, ওরা বেড়াতে বেরোয় না। নিজেদের এই বাগানেই ঘোরাফেরা করে!

ওর মা ও বাবাকে ফটকের কাছে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে সরমা ভেতরে ঢুকেছিল। ফিরে আসছে, এমন সময় পিছন থেকে মালীর ডাক কানে যেতে ঘুরে দাঁড়াল সরমা।

মালীটা তার কাছে এগিয়ে এসে বললে, ওরা ত কেউ বাড়ী নেই।

তা ত বুঝতেই পেরেছি, দরজায় তালা দেখে।

ওরা কখন বেড়াতে বেরিয়েছেন?

বেড়াতে বেরোন নি ত। ওঁরা আজ সকালের গাড়ীতে গিয়েছেন সুন্দরপুর! দু'তিন দিন পরে আসবেন বলে গিয়েছেন।

সুন্দরপুর! সেটা কোথায়?

সে আমি বলতে পারবো না। বলে মালীটা বোকার মত চোখে তাকাল।

আচ্ছা। তাহলে আমরা এখন যাচ্ছি, আবার একদিন আসবোখন।

কোন্ বাংলাতে এসেছো তোমরা, দিদিমণি? এবার জিজ্ঞেস করে মালীটা।

সরমা সংক্ষেপে উত্তর দেয়, সে অনেক দূরে, ওই দিকে লালকুঠিতে। বলতে বলতে সরমা ফিরে আসে ফটকের কাছে।

সরমার মা বলেন, কিরে, বাড়ী নেই বুঝি?

ওরা নাকি সব বেড়াতে গেছে সুন্দরপুর।

সেটা কোন্ দিকে?

তা কে জানে। তবে এখানে নয়। সকালের ট্রেনে চলে গেছে। দু'তিন দিন পরে আসবে।

বিপিনবাবু সিগারেটটা মুখ থেকে সরিয়ে জবাব দেন, হাঁ জানি। সেখান

থেকে শুরু হয়েছে বিরাট জঙ্গল। 'সারেণ্ডা ফরেস্ট'। বাঘ, ভাল্লুক, হাতী, বন্য জন্তুজানোয়ার কি নেই সেখানে?

সরমার মা মুখটা বেজার করে উত্তর দেন, তবে সে জায়গায় মানুষ শখ করে মরতে যায় কি জন্যে। জন্তুজানোয়ারদের হাতে প্রাণ দিতে?

আঃ, তুমি ত দেখছি তেমনি বোকা। মানুষ কি জঙ্গলের ভেতর বাস করে! ওই যে দূরে, তোমার সামনে যে সব পাহাড় আর জঙ্গল দেখছো, ওর মধ্যে কি বলতে চাও যে বাঘ ভাল্লুক নেই! তবে আমরা কি তাদের সঙ্গে বাস করছি নাকি! আমি এখানে আসবো শুনে, আমাদের আপিসের সান্যালবাবু সেদিন বলেছিলেন, শুনেছি ওখানে নাকি এখনো বাঘ ভাল্লুক বেরোয়?

সরমা হেসে ওঠে, কলকাতার লোকের ধারণা পাহাড় বনজঙ্গল যেখানে, সেখানেই বাঘ ভাল্লুক আছে। তাই ভয় পায় তারা এসব জায়গায় আসতে! তারা ছোটে কাশী, গয়া, লক্ষ্নৌ, মধুপুর, দেওঘর। এসব জায়গার নামও শোনেনি কেউ!

বিপিনবাবু মুখ থেকে এবার সিগারেটের শেষ টুকরোটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে বলেন, কিন্তু বাগচীবাবু মিথ্যে বলেননি। পরশুদিন সেই মুদীর দোকানে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি থাকেন এখানে বারোমাস। তবে অনেক দূরে। ওই যে উঁচু পাহাড়টা দেখছিস তারই নীচের দিকে। তিনি সেদিন গল্প করছিলেন তাঁর বাগানে ঢুকে সব কলাগাছ হাতীতে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। শীতকালে ভাল্লুক নাকি আসে সেখানে কুল খেতে, আর গরমের সময় যখন নদীনালা সব শুকিয়ে যায়, তখন ওর বাড়ীর পিছনের দিকে যে ঝরনাটা, তার জল তখনো শুকোয় না! গভীর রাত্রে ওঁর ঘর থেকে কখনো কখনো দেখা যায় বাঘ জল খেতে নামছে ধীরে ধীরে, পাথরের বড় বড় চাঁইগুলোর ওপর পা ফেলে ফেলে, অন্ধকারে জ্বলতে থাকে তার চোখ দুটো, কখনো বা তার হুঙ্কারধ্বনিতে কেঁপে ওঠে বন জঙ্গল। লম্বা টর্চের আলো জানলার ভেতর দিয়ে ফেলে এক একদিন দেখেন তিনি রীতিমত বড় বাঘ—গায়ে লম্বা লম্বা ডোরা কাটা, চিতা বা নেকড়ে নয়।

বাবা! ভয়ে শিউরে উঠে সরমা। বলে, এরকম জায়গায় প্রাণ হাতে করে কেউ বাস করে?

বিপিনবাবু বলেন, জন্তু-জানোয়ারদের কিছু না বললে, তারাও সাধারণত লোকের অনিষ্ট করে না। তাদেরও ত প্রাণের ভয় আছে। মানুষ যে

তাদের শত্রু তা তারা বোঝে, তাই মানুষ দেখলে তারাও পালায়।

সরমা বলে, নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের বন্দুক-টন্দুক আছে।

তা জানি না। তবে তিনি ওখানেই জমিজমা নিয়ে নিজেই চাষবাস করে বাস করেন। আমায় একদিন দেখতে যেতে বলেছেন। বেশ অমায়িক ভদ্রলোক, নাম পরিমলবাবু। মাসে একদিন কি দু'দিন এদিকে আসেন ওই মুদীর দোকানে জিনিসপত্র কিনতে।

সরমা বলে, আমি যাবো বাবা তোমার সঙ্গে!

না। অতদূর তুই হাঁটতে পারবি না। আমায় বলেই দিয়েছেন তিনি, বেশ বেলা থাকতে বেরুবেন, নইলে সন্ধ্যের আগে ফিরে আসতে পারবেন না। পথঘাট ওদিকের ভাল নয়, জঙ্গল আর পাহাড চতুর্দিকে। অবশ্য মাঝে মাঝে হো মুণ্ডা সাঁওতালদের বস্তীও আছে কয়েকটা, ভয়ের তেমন কিছু নেই, তবে আমরা শহরের লোক পথঘাট হারিয়ে যদি অন্য কোনদিকে চলে যাই, তাই আগে থাকতে সাবধান করে দিয়েছেন।

বলি, কি দরকার অমন জায়গায় যাবার? চারটে হাত বেরুবে কি সেখানে গিয়ে! তারপর বিদেশবিভুঁই জায়গায়, যদি এদিক সেদিক কিছু হয়, তখন কে সামলাবে!

সরমা বলে, জায়গাটা নাম কি?

গুরুজল! সেখানে গিয়ে শুধু বাগচীবাবু কোথায় থাকে বললে, সবাই দেখিয়ে দেবে, বলেছেন।

॥ ৩৮ ॥

এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে সরমা যে পথ চলতে বিশেষ কষ্ট হয় না। কেবল ওর একার ক্ষেত্রে নয়, ওর যেমন হয় না, ওর বাবা-মারও তেমনি। অন্য জায়গায় বেশী হাঁটতে চাইতেন না ওঁদের দু'জনের কেউই। বিশেষ করে সরমার মা। একটু চললেই যেন হাঁপিয়ে পড়তেন। অথচ এখানে সে ভাবটা একেবারেই নজরে পড়ে না! চড়াই উৎরাই অন্য জায়গার মত এখানে খুব বেশী না থাকলেও আছে। এবং প্রতিদিন-ই বেশ ওঠানামাও করতে হয়। তবুও যে তার জন্যে পথশ্রম ও কোন ক্লেশ বোধ করেন না সরমার মা-বাবারা,

তার কারণটাও সে অনুমান করতে পারে। জলহাওয়া ওখানকার খুবই ভাল সন্দেহ নেই কিন্তু তার প্রভাবেই যে ওর মা-বাবার দেহে এই ক'দিনে নব যৌবন ফিরে এসেছে, তা নয়। আসলে দায়ী প্রকৃতি। বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবে বন উপবন, পাহাড় জঙ্গল সব যেন অপরূপ সাজে সেজেছে। যেদিকে তাকাও আনন্দে বিস্ময়ে মন ভরে ওঠে।

বাস্তবিক পথের এপাশে লাল হয়ে আছে পলাশ শিমুলের বন, তার রং চোখ থেকে মুছতে না মুছতে, আর এক দিক থেকে গোলগোলি কর্ণিকার যেন হলুদ রঙের শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কোথাও ঝোপের মাথায় রাধালতার ফুল ফুটে রয়েছে রাশি রাশি। আবার কোন জায়গায় শুধু বড বড় কুচিফুলের অরণ্য সব। গাছ থোপা থোপা সাদা ফুলের পসরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সহাস্য মুখে। কোথাও বা মুচকুন্দ চাঁপার গন্ধে আকুল বনপথ। রাস্তার ওপর ঝরে পড়ে রয়েছে অসংখ্য ফুল।

ওরই মধ্যে এক এক জায়গায় আবার কালো কালো পাথরের চাঁই আর তার মধ্যে কে যেন জল বেঁধে রেখেছে। দীর্ঘ গাছের ছায়া কাঁপছে তার স্তব্ধ বুকে। হঠাৎ শন্ শন্ হাওয়া লেগে টুপ্ টুপ্ করে বন্য ফুল ঝরে ঝরে পডছে জলের ওপর।

চলতে চলতে সেদিন একটা শিরীষ গাছের তলায় এসে থমকে দাঁড়ায় সরমারা। স্তম্ভিত হয়ে তারা তাকিয়ে থাকে গাছটার দিকে। একটা গাছ যেন চতুর্দিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে একটা অরণ্যের গভীরতা সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক ডালে পল্লবে পল্লবে ফুল ধরেছে. মনে হয় যেন প্রিয়া-মিলনের পুলকটুকু এখনো জেগে আছে সারা দেহের রোমাঞ্চ কন্টকে। পাতা দেখা যায় না। শুধু আলপিনের মত সরু সরু ঈষৎ রক্তিম ফুল, যত গাছে ফুটে আছে তার চতুর্গুণ যেন বিছিয়ে রয়েছে বনতলে। ফুলগুলো কোথাও যেন বৃক্ষলতায় উল্লাসে নৃত্য করছে, কোথাও আবার তেমনি গম্ভীর ধ্যানমগ্ন, যেন কেউ দু'হাতে পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে দেবতার চরণে উৎসর্গ করতে বসে আছে।

এমনি সব বনপথ দিয়ে হাঁটার তুলনা হয় না। পথ চলার কথা তখন বুঝি আর মনে পড়ে না। ভ্রমরের মত চোখ দু'টো শুধু উড়ে যায় একফুল থেকে আর একফুলে। গাছপালা থেকে চোখ মাটিতে নামাও, সেখানে আর এক সৌন্দর্যের রাজত্ব। কোথাও ছোট-খাটো পাহাড়, কোথাও লেকের মত

অনেকটা জল, কোথাও বা পাহাড়ী ঝর্ণার শীর্ণ ধারা উপলখণ্ডে ব্যাহত হয়ে মৃদু কলধ্বনি তুলছে। সমস্ত অরণ্যপ্রকৃতি যেন স্তব্ধ হয়ে সেই স্বর শুনছে। বাস্তবিক এ জায়গায় এমন মজা যে বেড়াতে বেরুলে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না ঘরে, যদিচ ঘরের চতুর্দিকে গাছপালা অরণ্যভূমির অভাব নেই। কিন্তু সে মানুষের হাতে গড়া, কৃত্রিম ফুলফুলের বাগান, পাঁচীল ঘেরা সীমিত আয়তন তার।

ফটকের বাইরে, পথে পা দেওয়ামাত্র সরমা চোখের সামনে সব যেন একাকার হয়ে যায়। ওই দূরের পাহাড়ের সঙ্গে নিকটের পাহাড়, দূরের বন জঙ্গলের সঙ্গে কাছের নদী-নালা, প্রতিটী গাছপালা, প্রতি ঝর্ণার কুলুধ্বনি, পাখীর কলকূজন কোথাও যেন আর কোন দূরত্ব থাকে না।

কেমন একাত্মতা বোধ করে সরমা। পুলকে তার সর্বাঙ্গ বার বার রোমাঞ্চিত হয়, যখনই মনে পড়ে ওই সুদূর পাহাড়ের বুক ছোঁয়া যে হাওয়া লেগে দূরের গাছপালা ফুল ফল আন্দোলিত হচ্ছে, ওরই স্পর্শ এসে লাগছে তার বুকে, তার মুখে-চোখে, তার সর্বদেহে, তখন কেমন যেন একটা আত্মসমাহিত ভাব দেখা দেয় সরমার।

সেদিন এমনি এক বিহ্বল মুহূর্তে বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় দেখা হয়ে যায় সরমার সঙ্গে সেই মেয়েটির।

একি, আপনি যে!

আমি একা নয়, আমার শাশুড়ী, ননদ, তাঁর ছেলেমেয়েরাও আছেন। ওই যে উঁচু পাথরটা, তার পাশে বসে আমরা অনেকক্ষণ থেকে গল্প করছিলুম। হঠাৎ আপনাকে দেখে চলে এলুম।

সরমা প্রশ্ন করে, তারপর কবে এলেন সুন্দরপুর থেকে?

সেকি! কে বলেছে আমরা ত সুন্দরপুর যাইনি। পাঁচ বছর আগে সেখানে গিয়েছিলুম বটে!

তবে যে আপনার মালীটা বললে, সুন্দরপুর গেছেন আপনারা!

ও বেটা ভুল শুনেছে, গিয়েছিলুম আমরা পীরপুর! সেখানে আমার পিস্‌-শ্বশুর চাকরী করেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম তিনদিনের জন্যে। ফিরেছি পাঁচদিন হলো।

সরমা বলে, তাই নাকি! আমরা সবাই মিলে গিয়েছিলুম সেদিন আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে। এই আমার মা, এই বাবা।

মেয়েটি দু'হাত তুলে নমস্কার করলে সরমার মা বলেন, ওমা, তোমার এরই

মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে দেখছি। তা বেশ বেশ। মেয়েছেলের সিঁথিতে সিঁদুর না থাকলে কি ভাল দেখায়! তা তুমি একা এসেছো কেন মা, স্বামীকে বাদ দিয়ে!

তিনি রেখে গেছেন, আবার আসবেন নিয়ে যাবার দিন।

তবে যাই বলো মা, মেয়েদের একটা বয়েস আছে, এই সময়টায় যেন একলা তাদের মোটেই মানায় না।

তুমি থামো দেখি মা! সরমার কণ্ঠে ধমকের সুর।

দেখো দেখি মেয়ের কথার ছিরি। বলো ত মা, মেয়েছেলের জীবনে এর চেয়ে বড় আর কি আছে! এখন মার কথা খারাপ লাগছে, একদিন বুঝবি এর মূল্য!

কথাটা সেই মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বললেও ওর মার আসল উদ্দেশ্য যে তাকে জ্ঞান দেওয়া, এটা ভাল করেই জানতো সরমা। ইদানীং এটা যেন ওর মায়ের একটা রোগে দাঁড়িয়েছে, কোন বিবাহিতা মেয়ে দেখলেই তাকে উপলক্ষ্য করে ওকে কিছু না কিছু খোঁচা দেওয়া।

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে সরমা বলে ওঠে, চলো মা ওর শ্বশুর-শাশুড়ীরা সব ওখানে বসে আছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

হাঁ, তাই চলো।

বিপিনবাবু উঠে দাঁড়াতেই মেয়েটি বলে ওঠে, না না আপনারা বসুন, আমি বরং ওঁদের ডেকে আনছি।

না—না—সেকি! তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী বুড়ো মানুষ, তাঁদের ডাকতে হবে না মা, আমরা যাচ্ছি। ওই পথেই ত বাড়ী ফিরবো একটু পরে।

এমনি করে সেদিন যেমন আরো পাঁচ জনের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে পথে আলাপ হয়, ওদের সঙ্গেও তেমনি হয়ে গেল। তবে এ পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়ে অন্তঃপুরে যে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারেনি, তার কারণ ওই মেয়েটির শ্বশুর। ভদ্রলোকের যেমন পয়সার দেমাক তেমনি সবজান্তা ভাব যেন একটা দূরত্বের সৃষ্টি করেছিল। তাই পথে যে আলাপটা জমে উঠতো, পথেই আবার তা যেত ভেঙ্গে।

ভদ্রলোকের নাম চিন্তাহরণবাবু। আর সেই মেয়েটির নাম মঞ্জু।

চিন্তাহরণবাবু একটু বক্তার বেশী। চুপ করে থাকা তাঁর ধাতে সয় না, চুরুট টানতে টানতে তাই অনেকদিন পরে বিপিনবাবুর মত একজন বোদ্ধা

শ্রোতা পেয়ে উৎসাহে জলে ওঠেন। রাজনীতি, সমাজনীতি থেকে কাশ্মীর সমস্যা, জওহরলাল নেহেরুর ভুল পররাষ্ট্রনীতি, রাশিয়া, চীন, আমেরিকা কিছুই বাদ দেন না।

সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে ফেরবার পথে বিপিনবাবুর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি বলেন, এসব জায়গার এই বড় অসুবিধে, কথা বলার লোকের অভাব! শুধু ভালো মন্দ খাও, বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াও, আর মুখ বুজে পড়ে থাকো!

বিপিনবাবু বলেন, ভালই ত, সারা বছর ত কথা বলেন, না হয় একটা মাস চুপচাপ বিশ্রাম নিলেন।

বিধানবাবুও সেদিন আমায় ঠিক এই কথাই বলেছিলেন।

বিপিনবাবু চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করেন, বিধানবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি?

মোটা চুরুটটা মুখ থেকে সরিয়ে ধোঁয়ায় ছাড়তে ছাড়তে তিনি একটু উচ্চাঙ্গের হাসি ঠোঁটের কোণে চেপে বলেন, বিলক্ষণ! কলকাতার কোন বড়লোকের সঙ্গে আলাপ নেই তাই বলুন! তাছাড়া বিধানবাবুর সঙ্গে ত আমার আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে।

বিপিনবাবু বলেন, কি রকম?

আরে তিনি আমার ভাগ্নীজামাইয়ের পিসেমশাই হন! এই ত সেদিন আমার ভাগ্নীর মেয়ের বিয়েতে এক টেবিলে বসে আমরা দু'জন খেলুম। আমি ত সেদিন স্পষ্টই তাঁকে বললুম, আপনার নেহেরুজীর এই পররাষ্ট্রনীতিকে আমি পরতোষণ নীতি ছাড়া আর কিছু মনে করি না।

এ্যাঁ! তাঁর মুখের ওপর একথা বললেন? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন বিপিনবাবু।

হাঁ, আমি কারুর তোয়াক্কা করি না। যত বড় প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী হোন না কেন তাঁরা। বলে সগর্বে তাকালেন বিপিনবাবুর মুখের দিকে।

এইভাবে এক একদিন এক একটা বিষয় নিয়ে তাঁরা যখন আলোচনায় মত্ত হতেন, তখন সরমা আর মঞ্জু একটু তফাতে গিয়ে ফিস ফিস করে গল্প শুরু করত।

ঠিক তেমনি আবার মঞ্জুর শাশুড়ী ননদের সঙ্গে সরমার মা একত্রে বসে, সংসারের কথা থেকে শুরু করে নানা মেয়েলী আলোচনায় রত হতেন।

ছোট ছেলেমেয়ে দুটো কখনো আপন মনে খেলা করে। কখনো বা এ-দল, ও-দল, সে-দলের কাছে গিয়ে তাদের কথাগুলো গেলবার বৃথা চেষ্টা করে আবার সরে এসে নিজেরা নিজেদের খেলায় মনোযোগ দিত।

একদিন মঞ্জু চেপে ধরে সরমাকে, বলতেই হবে কেন বিয়ে করবে না প্রতিজ্ঞা করেছে, নিশ্চয় এর পিছনে কিছু আছে!

কি আবার থাকবে। কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে সরমা।

কিন্তু ওর চোখের ওপর গভীর দৃষ্টি ফেলে মুহূর্তকয়েক চুপ করে থেকে মঞ্জু বলে, একটা মেয়ে বি. এ. পাশ করে চুপচাপ ঘরে বসে শুধু শুধু দিন কাটাচ্ছে, এ আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া কেবল তিন-তিনটে পাশ নয়, এমন ফর্সা রং, এমন বাঁকানো ভ্রূর নীচে নীল কাজল টানা চোখ, যে কোন তপস্বীর ধ্যান ভাঙাতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

আঃ, চুপ করো, ভাল লাগে না ভাই ওসব কথা।

তাহলে বলো, কোথায় তোমার মন বাঁধা?

চুলোয়! বলে বিরক্তির সঙ্গে মুখটা ঘুরিয়ে নেয় সরমা।

এ আমি বিশ্বাস করি না। আমার মা বলেন, ভগবান যতগুলো মেয়ে সৃষ্টি করেছেন তাদের জন্যে ঠিক ততগুলো বরও পাঠিয়ে দিয়েছেন!

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি সরমা বলে, তোমার কথাটা হয়ত ঠিক। বিধাতা আমার বর গড়েছেন তবে তিনি কোথায় লুকিয়ে আছেন এখনো তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

আচ্ছা, কোথায় লুকিয়ে আছে তুমি না বললে কি হয়, আমি বার করতে জানি মাসিমার কাছ থেকে।

খপ্ করে মঞ্জুর হাতটা চেপে ধরে সরমা বলে, প্লীজ, মাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করো না ভাই।

কেন?

আমি পছন্দ করি না! ব্যস্, এর বেশী আর জানতে চেয়ো না কোনদিন!

যত ঠাট্টা-তামাশা করুক, সরমা বি. এ পাশ, অনেক বেশী লেখাপড়া জানে বলে মঞ্জুর মনের মধ্যে তার প্রতি কোথায় একটা যেন সম্ভ্রম লুকনো ছিল। তাই হঠাৎ তার এই মেজাজের পরিবর্তন লক্ষ্য করে সে থেমে গেলেও মনে মনে বলে, বুঝেছি, নিশ্চয়ই কোথাও কোন ব্যর্থতার ঘা আছে। একটু খোঁচা লাগলে জ্বালা করে ওঠে। নইলে বিয়ের কথা শুনে পুলকিত হয়ে ওঠে না এমন

কুমারী মেয়ে হাজারে একটা কেন, বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না।

তফাতে থাকলেও মঞ্জুর শ্বশুরের গলা বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল সরমা। ঠিক সেই সময় বিপিনবাবুকে তিনি বলছিলেন, দেখুন আমি বুঝি বিয়ের ব্যাপারে মেয়েটিই যখন আসল, তখন মেয়ের বাপের কাছ থেকে দশ বিশ হাজার টাকা নিয়ে কি হবে। বললে বিশ্বাস করবেন না, একেবারে গরীবের ঘর থেকে শাঁখা সিঁদুর দিয়ে আমি বৌমাকে এনেছি! একটি কানাকড়ি নিইনি! তবে হাঁ, শুধু মেয়েটিকে দেখে নিয়েছি। নইলে আমাদের সোসাইটিতে কি মেয়ের অভাব। এম. এ, বি. এ. গণ্ডায় গণ্ডায়! কিন্তু আমার ছেলের মত ঠিক আমার মতো। সে ওই সোসাইটি গার্লদের ঘেন্না করে। বলে, ওই পেণ্ট করা মুখ, কাজলটানা ভ্রূ, তলপেট বার-করা জামা পরে ঘরের বাইরে বেরুতে লজ্জা করে না ওদের! ছ্যাঃ, ঘরে চাকরবাকর আছে, শ্বশুর ও ভাসুর দেওর আছে, তারাও ত পুরুষ, তাদেরও ত দেহে রক্ত-মাংস আছে! সমাজের মাথায় মারো ঝাড়ু!

ওদিকে ভিন্ন দল থেকে মঞ্জুর শাশুড়ী যে বৌয়ের গল্প করেন সরমার মায়ের সঙ্গে, তারও টুকরো কানে আসে সরমার। তিনি বলেন, হাঁ, বৌমাকে আমি পেয়েছি মনের মত ভাই। তবে একটু ডাকাতে ধরনের মেয়ে। গাছে চড়তে ভালবাসে। পাহাড়ে তরতরিয়ে উঠে যায়, আবার পুকুর দেখেছে কি অমনি সাঁতার কাটার জন্যে ছটফট করবে! এইজন্যে এই সব বনজঙ্গল পাহাড়ী নদী ওর এত পছন্দ।

সরমার মা বলেন, ভালই ত! আমার মেয়ের কথা আর বলবেন না, একটা আরশোলা দেখলে এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠবে যেন ভূত দেখেছে!

মঞ্জুর ননদ বলেন, না সাহসটা সত্যিসত্যি বৌদির আছে খুব!

মঞ্জুর শাশুড়ী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, বাস্তবিক বলছি, এইসব বনজঙ্গলে এসে যে থাকি ওই সোমত্ত মেয়েকে নিয়ে, তার জন্যে আমার এতটুকু ভয় করে না। শুধু ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, ভয়-ডর কাকে বলে জানে না তাই।

এই বলে একটু থেমে আবার তিনি ফিরে আসেন বৌয়ের প্রসঙ্গে।

সরমার মাকে বলেন, ভাই, এমন দস্যি মেয়ে আমি জীবনে কখনো দেখিনি। ওদের বাড়ীর সামনে একটা বিরাট পুষ্করিণী আছে, আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, বড় বড় ছেলেদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দেয়!

সরমার মায়ের দু'চোখে বিস্ময় উপচে পড়ে, বলেন, তাই নাকি!

হাঁ, ওর বিয়েটা ত'ওই পুকুরঘাট থেকেই হয়েছে। বলে তিনি ফিক্‌ফিক করে হাসেন।

কি রকম ?

হাঁ, সে একেবারে নাটক নভেল বলতে পারেন। সেদিন কি একটা ছুটি ছিল, খোকা এসে বললে, চলো মা, আজ আমরা সকলে ফলতায় পিক্‌নিক্ করে আসি। সেখানে আমার এক বন্ধুর গঙ্গার ওপর সুন্দর বাগানবাড়ী আছে।

বললুম, আমার আপত্তি নেই, তোর বাবুকে রাজী করাগে আগে। আজ ছুটির দিন, বৈঠকখানায় একবার আড্ডা জমলে তিন-চার ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্ত। আর এক পা ওকে কোথাও নড়ানো যাবে না।

সরমার মা প্রশ্ন করেন, কেন ভাই ?

কেন আবার, স্বভাব! এই ক'দিনে দেখে বুঝতে পরেছেন না? কেবল তর্ক আর তর্ক! গেল দেশ, গেল সমাজ, গেল সব! কলকাতার মান ইজ্জত সভ্যতা ভব্যতা বলতে আর কিছু রইলো না। যত বলি দেশে কি আর অন্য লোক নেই, কলকাতার শহরটা কি একলা তোমার, না এর ভালমন্দ সবকিছু রক্ষা করার দায়িত্ব একা তোমার ওপর, কিন্তু কে কার কথা শোনে! মরুকগে, ওসব বাজে কথায় কাজ নেই, হাঁ, যা বলছিলুম। ছেলে ত একটু পরে লাফাতে লাফাতে এসে খবর দিলে বাবু রাজী, তুমি তৈরী হও।

গাড়ী যখন ফলতার রাস্তায় ঢুকেছে, হঠাৎ পিছনের চাকাটা 'লিক্' হয়ে গেল। ড্রাইভার যন্ত্রপাতি বার করে চাকাটা যখন বদলাতে লাগল, আমরা তখন গাড়ী থেকে নেমে সামনেই একটা উঁচু মাটির ঢিপির ওপর একটা প্রকাণ্ড বাদাম গাছ দেখে তার তলায় বসতে গেলুম। ওমা, ঢিপির ওপর উঠেই দেখি ওটা একটা পুকুরের পাড়, সামনে প্রকাণ্ড পুকুর। সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে একদল ছেলেমেয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে এপারে এসে উঠলো, এই দলের ভেতর যে ফার্স্ট হয়েছিল, সে আমার বৌমা! খোকার যে কি নজরে ধরলো ওকে তখন বলতে পারি না। বললে, ওই মেয়েকেই বিয়ে করবে। গণ্ডায় গণ্ডায় কত যে আমাদের সমাজের বড় বড় ঘরের মেয়ে দেখিয়েছি, কোনটাই ওর চোখে লাগে নি।

ওর বাবু বলেন, বিয়ে করবে ও, ওর যখন চোখে ধরেছে, তখন আমাদের আপত্তির কি থাকতে পারে!

সরমার মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বললেন, ঠিকই ত!

মঞ্জুর শাশুড়ী বলেন, ওর বাপের অবস্থা যেমন খারাপ, তেমনি একটা কানাকড়িও আমরা নিইনি। ঘর থেকে গয়নাগাঁটি সব কিছু নিয়ে গিয়ে পরিয়ে বৌকে বরণ করে তুলেছি। তবে হাঁ, একটা কথা বলবো ভাই, ছেলের আমার নজর আছে! আজ মঙ্গলবার, বলে মাটিতে থুঃ থুঃ করে দু'বার থুতু ফেলে বলেন, এই ছ'বছর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু অসুখ কাকে বলে জানি না, একটা দিনের জন্যে মাথাধরা, কি পেট ব্যথা করা, কি একবার একটু গা গরম পর্যন্ত হয়নি বৌমার! স্বাস্থ্য যার নাম!

সরমার মা বলেন, আপনার ছেলে সত্যিকার বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে। আমি ত ভেবেই পাই না আজকালকার লেখাপড়া জানা ছেলেরা ওইসব শুঁটকী, চশমা পরা, গলার কণ্ঠা উঁচু করা ধাড়ী ধাড়ী মেয়েগুলোকে জাতকুল-ভেঙে বিয়ে করে কিসের লোভে!

মঞ্জুর ননদ খপ্ করে ফোড়ন কাটেন, যেমন কাজ করেন, তার জন্যে পস্তানও তেমনি তারা খুব! অবশ্য শেয়ান ঠকলে, বাপকে বলে না! তাই চেপে যায় বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে জ্বলে মরে!

যা বলেছিস মা! বলতে বলতে সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ান।

সন্ধ্যা আসন্ন, পাহাড়ের উঁচু শৃঙ্গটার ওপরে একটা দু'টো করে তারা সবে দেখা দিতে শুরু করেছে।

॥ ৩৯ ॥

মঞ্জু বলে, বনজঙ্গল যদি দেখতে চাও, তাহলে সুন্দরপুরে যাও। হ্যাঁ, গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে ভয়ে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে যখন সারেণ্ডা ফরেস্টের ভেতর জিপ্‌গাড়ী ঢুকবে।

তাই নাকি!

হাঁ, পথে ঘাটে দিন দুপুরে হাতী, বাঘ দেখা যায়, ওরে বাপ রে! যেদিন আমার দেওররা সব জঙ্গল দেখতে গেল, সে কি বিপদ, সরু পথ ঘুরে ঘুরে, পাহাড়ের ওপরে উঠতে হয়। বাঁদিকে যেমন অতলস্পর্শী খদ ডানদিকে তেমনি দুর্ভেদ্য নিবিড় ঘন বন। একটু এপাশ ওপাশ হয়েছে কি, আর রক্ষা নেই!

সন্ধ্যের তখনো দেরী কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলেই মনে হয় বুঝি অন্ধকার এলো বলে, আর বিলম্ব নেই।

হঠাৎ এক জায়গায় ড্রাইভার গাড়ীটা রুকে ফেললে, কি ব্যাপার ?

আমার ছোট দেওর খুব সাহসী। খপ্ করে যেই গাড়ী থেকে নামতে যাবে, ড্রাইভার তার হাতটা চেপে ধরে বলে, চুপ্, ওই সামনেই দেখছেন না পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বুনো হাতী। ওই ত ?

সে কি !

হাঁ, ওই দেখুন, বলে আঙুল দেখালে জঙ্গলের দিকে।

চমকে উঠলো তারা, দেখে ঠিক নীচের রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে একটা হাতী, গাছ থেকে ডাল ভেঙে খাচ্ছে !

তারপর ?

তারপর আর কি, বুঝতেই পারছো তাদের মনের অবস্থা ! যতক্ষণ না সেই হাতী খুশিমত সরে যাচ্ছে পথ ছেড়ে, ততক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে হবে ! ড্রাইভার বলে, অনেক সময় বুনো, পাগলা হাতীরা জিপ গাড়ী দেখে তেড়ে আসে এবং শুঁড়ে করে গাড়ীটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ওপর থেকে।

তাই নাকি ?

হাঁ, এরকম 'কেস' নাকি হয়েছে। তাই হাতীর মর্জির ওপর বরাত দিয়ে, চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল।

ওদিকে সবচেয়ে ভয়ের কথা, বেশী দেরী করলে সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে, ওই পাহাড় জঙ্গলে তখন বাঘ ভালুকের ভয় শুরু হয়। কাজেই বুঝতে পারছো ভাই ওদের মনের অবস্থা। আমার দেওর বলে বৌদি, একটি ঘণ্টা পুরো অপেক্ষা করার পরে হাতীটা হঠাৎ পথ ছেড়ে বনের ভেতরে ঢুকে গেল, মট্‌মট্ করে গাছপালা ভাঙার শব্দ হতে লাগল। তখন আর এক সমস্যা, কোন্ পথ দিয়ে তিনি হয়ত আবার তাদের সামনেই এসে দাঁড়াবেন। ড্রাইভার তাই উৎকর্ণ হয়ে রইলো, আরো কিছুক্ষণ। নিবিড় নিস্তব্ধ বন, কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু মট্‌মট্ করে গাছের ডাল ভাঙার আওয়াজ দূর থেকে যেন দূরে মিলিয়ে যায়।

হাঁ, অন্যদিকে চলে গেছে ! বলে ড্রাইভার এবার 'স্টার্ট' দিলে।

মঞ্জু বলে, হাঁ, একেই সত্যি জঙ্গল বেড়ানো বলে ! যার নাম রোমাঞ্চকর অনুভূতি ! নইলে এসব আবার জঙ্গল ? তার কাছে শিশু !

সরমা বলে, আমার ত এখানের বনে ঢুকলে এক একটা জায়গায় গা ছম্‌ছম্ করে। চারিদিকে বড় বড় বনস্পতি, গাছে গাছে এত নিবিড় যে আকাশের মুখ দেখা যায় না। বাইরে রোদ রয়েছে অথচ ভেতরে মনে হয় যেন সন্ধ্যা। আর জঙ্গলের মধ্যটা তেমনি ঠাণ্ডা, রীতিমত গা শিরশির করে!

মঞ্জু হেসে ফেলে। এখানেই যদি গা শিরশির করে তাহলে সেখানের অবস্থা কি রকম, অনুমান করতে পারো। সে জঙ্গলের তুলনায় একে পার্ক বলা যেতে পারে।

তাই নাকি?

হাঁ, বলছি ত। সে জিনিস চোখে না দেখলে, মুখে বোঝানো যায় না। যখন তুমি বন দেখতে ভালবাস একবার ওইখানে যেয়ো!

সরমা বলে, ওখানে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়?

খুব সম্ভব না।

তাহলে কি করে যাবো? তোমরা কোথায় উঠেছিলে ভাই?

সে আমার দেওর ঠিক করেছিল, এক ডাক্তারের বাড়ীর পিছনে দু'খানা ঘর।

বেশ ত, সেটাই দাও না ভাই আমাদের ব্যবস্থা করে। বাবাকে বলে রাখি সামনের বছর সেখানে যাবো তা'হলে!

না, সে হবার নয় ভাই। প্রথমত বাড়ী ভাড়া তারা দেয় না, দ্বিতীয়তঃ সেই ডাক্তার ভদ্দরলোক চান না যে কোন বাঙ্গালী তাঁর হাঁড়ির খবর জানুক!

সে আবার কি?

হাঁ, সে এক অদ্ভুত, বিচিত্র কাহিনী! স্বামী যেমন বাঙ্গালীদের চায় না, বৌটা ঠিক তার উল্টো, কোন বাঙ্গালী দেখতে পেলে তার সঙ্গে গল্প করার জন্যে পাগল, ওখানে বুনো জঙ্গলীদের ভেতর থেকে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে! আহা বৌটার জন্যে সত্যি দুঃখ লাগে। ভারী ভাল মেয়েটা! কেবল রূপসী সুন্দরী নয়, এত সুন্দর গলা, ভাল ভাল রবীন্দ্র সঙ্গীত কণ্ঠস্থ। শান্তিনিকেতন থেকে বি, এ পাস করেছিল। কিন্তু একটা দোষ, বড্ড রোগা! অথচ চোখ, মুখ, নাক, ভ্রূ, সবচেয়ে দাঁতগুলো, তার দেখবার মত! হাসলে যেন মুক্তোর পাঁতি ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

ওসব শুনে আর লাভ কি ভাই! বাড়ীঘর যখন মেলে না বলছো।

মঞ্জু বলে, বাড়ীঘর মেলে কি না জানি না কারণ বাঙ্গালী পরিবার সেখানে

বিশেষ ত দেখলুম না। তাছাড়া অধিকাংশই, টালির ঘর, খড় ও টিনের ঘর! নানা জাতের ব্যবসাদার জায়গাটাকে যেন ঘুলিয়ে তুলেছে। কেবল বড় বড় লরী ছুটছে রাস্তা দিয়ে, ধুলোয় ধুলো চারিদিকে! যে যা পাচ্ছে ওই পাহাড় থেকে নিয়ে চালান দিচ্ছে। কাঠের ব্যবসা, পাথরের নুড়ির ব্যবসা, কাঠ কয়লার ব্যবসা। কি নয়! এক-একটা কলকারখানাকে কেন্দ্র করে যেমন ছোট ছোট শহর গড়ে ওঠে, সেই রকম। এ শহর নয়, পল্লীও নয়, কতকগুলো ব্যবসায়ীর শোষণক্ষেত্র। পাঞ্জাবী, বিহারী, মাড়োয়ারী, গুজরাতী কে নেই! আর এদেরই প্রয়োজনে যত কুলী কামিন, লোকজন, দোকানদানি, বাজার হাট, যা কিছু। যেন ওই পাহাড়ের পায়ের তলায় গড়ে উঠছে একটা ছোট পল্লী।

ওই বিরাট পাহাড়ও জঙ্গলকে শোষণ করছে যারা, আবার তাদেরই শোষণ করছে অন্যসব লোকেরা। মহাজন থেকে গোলদার, কনট্রাক্টর থেকে ঠিকাদার, আবার তার থেকে ধাপে ধাপে শোষকশ্রেণী যেমন নেমে গেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি তাদের সাঙ্গো-পাঙ্গোরাও ভীড় করে এসেছে। যেমন ভাগাড়ে গরু পড়লে আগে আসে শকুনি, তারপর শেয়াল, তারপর কুকুর, চিল ও কাকের দল, তারপর কেউ মৃতদেহটা থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, কেউ বা সুযোগের অপেক্ষায় নিঃশব্দে তফাতে অপেক্ষা করে, কেউ বা একজনের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, কামড়াকামড়ি, চেল্লাচিল্লি লাগিয়ে দেয়। শবলুব্ধ জানোয়ারদের বীভৎস চীৎকারে শ্মশানভূমি যেমন মুখরিত হয়ে ওঠে, সারাদিন ধরে তেমনি ওই ছোট্ট জায়গাটা সরগরম থাকে। অথচ সন্ধ্যা হলেই একেবারে চুপচাপ, অরণ্যের ভয়াবহ স্তব্ধতা যেন সেখানে বিরাজ করে। বলতে বলতে একটু দম নিয়ে আবার ফিরে আসে মঞ্জু তার কথায়, ওই ডাক্তারও রয়েছেন ওখানে, সেইসব লোকেদেরই প্রয়োজনে। তবে ডাক্তারটা ভাই একটা 'ক্যারেকটার'—চরিত্র যাকে বলে। যেমন দেবা তেমনি দেবী! কি সুন্দর চেহারা। এম, বি শুধু নয়, তার সঙ্গে আরো অনেকগুলো লেজুড়, ওই জায়গায় যে কেন পড়ে আছে, সে এক বিচিত্র ইতিহাস!

তাই নাকি, কি শুনি শুনি? কৌতূহলে জ্বলে ওঠে সরমার চোখ দুটো।

আমার দেওর খুব স্পষ্টভাষী। ডাক্তারবাবুর মুখের ওপর একদিন বলেই ফেললে, এই জঙ্গলে পড়ে আছেন কেন বুঝতে পারি না। যে কোন বড় শহরে বসলে, আজকের দিনে আপনার মত 'কোয়ালিফায়েড' ডাক্তার হাজার হাজার

টাকা রোজগার করতে পারতো।

সিগারেটটা হঠাৎ ঠোঁটের কোণে চেপে ধরে, সিগারেটের ধোঁয়ায় জ্বালাকরা চোখটা কুঁচকে ডাক্তার উত্তর দেয়, হাঁ, তা হতো জানি, তারপর ?

আমার দেওর বলে, তারপর আর কি ? বাড়ীর পর বাড়ী, গাড়ীর পর গাড়ী, আর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স।

বাড়ীর পর বাড়ী হলে কি সুবিধে হতো বলুন ত ? একটা বাড়ীর যে কোন একটা ঘরে পাঁচফুট বাই সাতফুট একটা খাটে ত আপনি শোবেন, একসঙ্গে সবগুলো বাড়িতে ত বাস করতে পারবেন না ! আর গাড়ীর পর গাড়ী হলেও সেই একপ্রশ্ন, একটা গাড়ীর এক তৃতীয়াংশ সীট্ ছাড়া একসঙ্গে দু'টো গাড়ীতে ত চাপতে পারেন না। আর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স মানে, ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকী দেবো কেমন করে তারই চিন্তায় রাত্রের ঘুমটুকু নষ্ট করা। ফলে ব্লাড্‌প্রেসার, করনারী থ্রম্বসিস্ এবং আরো অনেক কিছু !

বলে আরো গোটা দুই টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ডাক্তারবাবু বলেন, সুস্থ শরীর নিয়ে একপাশে পড়ে আছি, তা কি সহ্য হচ্ছে না মশাই আপনার ? একখানা জিপ করেছি, তাতেই কাজ চলছে, এই ছোট বাড়ীটুকু কিনেছি, স্বামী-স্ত্রীর প্রয়োজনেরও অনেক বেশী জায়গা আছে এখানে, তবে মিথ্যে টাকার পিছনে ছোটাছুটি করে জীবনীশক্তি হ্রাস করি কেন ?

ওঁর স্ত্রী বলেন, ওঁকে একটু বলুন ত, আমরা সবাই বুঝিয়ে হয়রান হয়ে গেছি। আমার জামাইবাবু টাটায় চাকরী করেন, বলে বলে হদ্দ হয়ে গেলেন, এখানে এসো, টাকার ওপর শুয়ে থাকতে পারবে !

স্ত্রীর মুখের ওপর যেন ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন ভদ্রলোক। বলেন, আর যাই হোক সেটা সুখশয্যা হতো না, মাড়োয়ারী মহাজনদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি !

স্ত্রী বলেন, আসলে কি জানেন, ওই পাহাড় জঙ্গলে যে কি মধু আছে, তা উনিই জানেন। দু'দিনের জায়গায় যদি তিনটে দিন মা থাকতে বলেন ও কিছুতেই রাজী নয়। ওঃ বাবা, এই কলকাতার শহরে আমার ঘুম হয় না, পালিয়ে আসতে পারলে যেন বাঁচেন।

বাঃ, ওয়ান্ডারফুল মানুষ ত ? সরমার চোখ দু'টো দীপ্ত হয়ে ওঠে। সে মনে মনে এইরকম পুরুষই কামনা করে, যাঁর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে, সাধারণ লোকের ভীড়ে মিশে যাবে না !

হাঁ, ওয়ানডারফুল প্রথমটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন

জানলুম—বলে একটা ঢোক গিলে সহসা মৌন হয়ে যায় মঞ্জু।

কি জানলে ভাই?

না, থাক।

না না বলতেই হবে কি, ওইভাবে চেপে গেলে শুনবো না। ওইটুকু বলে, তাহলে আগ্রহ জাগিয়ে দিলে কেন? বল!

আজকাল প্রায়ই একসঙ্গে বেড়াতে বেরোয় ওরা, এবং প্রতিদিনের অভ্যাস মত সেদিনও ওরা দু'জনে একটু তফাতে, একটা বড কালো পাথরের ওপর আগেই উঠে বসেছিল।

বয়সের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে মানুষের মধ্যে।

তাই মঞ্জুর শাশুড়ী ও ননদ, সরমার মায়ের সঙ্গে একটা ছোট পৃথক দল যেমন গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি আবার সরমার বাবা ও মঞ্জুর বৃদ্ধ শ্বশুর এক জায়গায় বসে ধর্মতত্ত্ব রাজনীতি প্রভৃতি আলোচনা করছিলেন। ছোট ছেলেমেয়ে দু'টি তাদের কাছেই কতকগুলো পাথরের নুড়ি দিয়ে খেলাঘর তৈরী করছিল।

সূর্যাস্তের তখনো দেরী কিন্তু পশ্চিমের উঁচু উঁচু কয়েকটা পাহাড়ের মাথা এমনি তাকে আড়াল করে ফেলেছিল যে মনে হয় বুঝি সন্ধ্যা আসন্ন। নীচে অনেক দূরে, পাহাড়ের বেশ খানিকটা উৎরাই, তারপরে আবার চড়াই। ছোট ছোট কয়েকটা করে চালাঘর এখানে ওখানে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে। ঘন জঙ্গল, দীর্ঘশির বনস্পতির ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট সাঁওতালী পল্লীর আভাস।

বেশ একটুখানি চুপ করে থাকে তারা। তারপর মঞ্জু বলে, অবশ্য এ ব্যাপারটা আবিষ্কার করে আমার দেওর, ডাক্তারবাবুর জীপ-এ করে ইদানীং সে তার সঙ্গেই চলে যেতো. সকালে, আবার ফিরে আসতো সন্ধ্যায়। হপ্তায় দু'দিন করে ডাক্তারবাবুকে সেই পাহাড়ের ভেতর একটা জায়গায়, টিনের ছোট্ট একটা ঘরে দাতব্য চিকিৎসালয়ে রুগী দেখতে যেতে হতো। ওখানে পাহাড় কেটে, লোহা পাথরের টুকরো লরী বোঝাই হয়ে বাইরে চালান দেবার যে এক বিরাট কারবার, আছে তাতে বহু শ্রমিক মজুর স্ত্রী পুরুষ কাজ করে। আশেপাশে পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে তাদের বাস। এদের জন্যে কোম্পানী একটা দাতব্য-চিকিৎসালয় খুলে দিয়েছিল। সপ্তাহে দু'দিন ডাক্তারবাবু সেখানে রুগী দেখতে যেতেন। অবশ্য কোম্পানী থেকে মাইনা পেতেন এর জন্যে। তবে সে খুবই

সামান্য। কিন্তু এত সামান্য মাইনে যে লোকের মনে এত খুশি আনতে পারে, তা সেই ডাক্তারবাবুকে চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না।

যেদিন জঙ্গলে 'ডিউটি' দিতে যান, সকাল থেকে যেন খুশির পেয়ালা উপচে পড়ে। কারণে অকারণে হাস্যকলরবে তিনি মুখরিত হয়ে ওঠেন। সবচেয়ে বড় কথা জীপ্‌টা নাকি জঙ্গলের যত গভীরে ঢোকে তত ডাক্তারবাবুর মুখে চোখে একটা চাঁপা হিংস্র উল্লাস যেন ফুটে ওঠে। যেন তিনিও সেই জঙ্গলের একজন অধিবাসী, জোর করে তাঁকে ধরে রেখেছিল সভ্যসমাজে, এখন মুক্তি পেয়ে ফিরছেন আপনজনের মধ্যে। সেই পরিচিত আরণ্যক পরিবেশ, সেই গাছপালা, সেখানের প্রতিটি পশুপক্ষী, প্রতিটি পাথরের নুড়ি ও কেবল তার পরিচিত নয়, যেন একান্ত আপন!

মঞ্জু বলে, যেদিন আমি তাঁর জীপ্‌-এ করে বনে বেড়াতে যাই, সেদিন তাঁকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করেছিলুম এর কারণ কি! হো হো করে প্রাণ খোলা হাসি সেই পাহাড়, ও বৃক্ষলতায় বুকে সূর্যের হঠাৎ আলোক ঝলকের মত ছড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, এখানে বনজঙ্গল, পাহাড, নদী, এই সব বুনোলোকদের মধ্যেই যে মানুষ হয়েছি আমি বাল্যকালে, তাই এদের কাছে এলেই বেশী আপন মনে হয়।

বলে, তিনি সিগারেটের টুকরোটা মুখ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, আমার বাবাও যে একদিন এখানে ডাক্তারী করতেন। তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে আমিও আসা-যাওয়া করতুম এখানে নিয়মিত। তিনি রুগী দেখতেন, আর আমি গাছপালায় উঠে দৌরাত্ম্য করতুম, জংলী সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতুম। কোন কোন গাছের ছালে ছুরি দিয়ে সেদিন যে নাম লিখেছিলুম আজো তার চিহ্ন বিদ্যমান। আজো পাথরের গায়ে আমার নাম খোদানো আছে। খুঁজলে দেখতে পাওয়া যায় সেইসব ছেলে-খেলার নমুনা।

'এই রোকো'! বলে হঠাৎ জিপ্‌টাকে একজায়গায় থামাতে বলে, তিনি লাফিয়ে নেমে পড়লেন। তারপর নিকটেই কয়েকটা বড় বড় গাছের আড়ালে আমাকে ও আমার দেওরকে ডাকলেন। গিয়ে দেখি, সত্যি একটা বিরাট গাছের গুঁড়িতে, বড় বড় বাংলা অক্ষরে এখনো তাঁর নাম লেখা রয়েছে।

আপন মনেই হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু, দেখলেন ত নিজের চোখে, বিশ্বাস হলো এখন আমার কথা?

বললুম, অবিশ্বাস করছি যে আপনাকে, একথা কেমন করে মনে ধারণা জন্মালো।

না—এমনি, মানে আরো অনেকেই আপনাদের মত আমায় প্রশ্ন করে কিনা? এরকম জঙ্গলে যে কোন ভদ্রলোক বাস করতে পারে এ তাদের ধারণার অতীত!

বললুম, এর জন্যে কি তাদের দোষ দেওয়া যায় ডাক্তারবাবু?

হাঁ। সে কথাটাও অবশ্য বিচার্য। যে পরিবেশে মানুষ ছেলেবেলা থেকে বর্ধিত হয়েছে, সেটাই যে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, এ আমি কিছুতেই লোককে বোঝাতে পারি না। এই দুঃখ!

বললুম, যাই বলুন, আপনার এ দৃষ্টান্ত কেবল অস্বাভাবিক নয়, অবিশ্বাস্য! আমরা আপনাকে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না যে কোন সভ্য মানুষ আজকের দিনে এত লেখাপড়া শিখে এই জঙ্গলে পড়ে থাকতে এত ভালবাসে।

ডাক্তার বললেন, আপনাদের ধারণা সব মানুষকে বিধাতা একরকম ধাতু দিয়ে গড়েছেন। তাঁর রাজ্যে অনেক জায়গায় অনেক কিছু ব্যতিক্রম যে আছে, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি মানুষ কিছুতেই তা বুঝতে পারে না। তাই সংসারে এত গণ্ডগোল। মানুষ ভাবে, সব বুঝি এক ছাঁচে ঢালাই।

এই বলে তিনি একটু থেমে, চারিদিকের গাছপালা পাহাড় জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বললেন, একই জঙ্গলে তবে এত বিচিত্র ধরনের গাছ কেন? একই পাহাড়ের বুকে এত রকমের পাথর কেন? স্বভাবের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে যখন এত বিভেদ, মানুষের কাছে তার ব্যতিক্রম আশা করাটা কি অন্যায় নয়?

বললুম, আপনারা ডাক্তার মানুষ, লোকের বাইরেটা কেবল নয় ভেতরটাও দেখতে পান, কাজেই আমাদের পক্ষে ওইসব গভীর তত্ত্বকথা 'গ্রীক' ছাড়া কিছু নয়।

বেলা সাড়ে ন'টা নাগাত আমরা এসে পৌছলুম সেই হাসপাতালের কাছে। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। দেখলুম অদূরে লোহার পাহাড় কেটে কেটে টুকরো পাথরের নুড়ি জড়ো করছে অসংখ্য স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে-মেয়ে। অসভ্য, জংলী সেইসব নরনারীদের কুটির এখানে ওখানে ছিটিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে, ছোট ছোট পর্ণকুটির পাহাড়ের আঁকে-বাঁকে, বন-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে।

এই বলে মঞ্জু একটু থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করে। গাড়ী থেকে নেমে আমি ও আমার দেওর একটা টিলার ওপর বসলুম শালগাছের ছায়ায়।

আমাদের সামনে অল্পদূরে কুইনা নদী নেমে গেছে। এখানে নদীতে জল খুব কম বলে পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে যেন সে অস্ফুট কণ্ঠে গান গেয়ে চলে। এককালে নদীটা যে এখানে খুব প্রশান্ত ছিল, জলও ছিল প্রচুর তার চিহ্ন মাঝে মাঝে রয়েছে। আমরা ওইখান থেকে বসেই দেখতে পাচ্ছিলুম, ডাক্তারবাবুর ডিস্‌পেন্‌সারী আমাদের পিছনে, আরো দু' তিন ধাপ উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট টিনের ঘরে। সেখানে জংলী স্ত্রী পুরুষ কয়েকজন অপেক্ষা করছিল শিশি হাতে নিয়ে।

ডাক্তারবাবু যখন তাদের কারুর পেট টিপে, কারুর বা বুকে স্টেথস্‌স্কোপ বসিয়ে রোগ নির্ণয়ে ব্যস্ত, আমরা তখন টিলা থেকে নেমে ঘুরতে বেরুলুম।

ডাক্তারবাবু চেঁচিয়ে সাবধান করে দিলেন, বেশীদূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে যেন আমরা না যাই। কাছাকাছি থাকি!

মঞ্জু বললে, আমার দেওর কলকাতার ছেলে হলে কি হয়, বেশ সাহসী। এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে প্রাকৃতিক সৌন্দয উপভোগ করে আমরা বেড়াতে লাগলুম। বাসা থেকেই আমরা পরটা ও আলুচচ্চড়ী তৈরী করে নিয়ে গিয়েছিলুম। ওখানে কোন খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। ডাক্তারবাবুও যেদিন যান, বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে যান। একটা গাছের তলায় বসে আমরা দু'জনে আহার পর্ব সমাধা করে যখন হাতমুখ ধোবার জন্যে কুইনা নদীর পথে নামতে লাগলুম, তখন হঠাৎ দূর থেকে যে দৃশ্য আমার চোখে পড়লো, তা বিশ্বাস করা যায় না।

সরমার কণ্ঠ এবার উৎসাহে জলে ওঠে। কি কি দৃশ্য ভাই!

মঞ্জু—গলাটা খাটো করে সরমার কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে বললে, দেখি নদীটার মাঝে এক জায়গায় ছোট্ট একটা হ্রদের মত, উঁচু উঁচু কয়েকটা পাথরের চাঁই অনেকখানি গভীর জলকে যেন ঘিরে রেখেছে। কুইনা নদীর সরু সরু কয়েকটা ধারা পাহাড়ের ওপর থেকে বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে এসে একটা জায়গায় মিলিত হয়ে এই সুন্দর হ্রদটির সৃষ্টি করেছে। তার চতুর্দিকে শ্যামল বৃক্ষলতার ছায়া, অদ্ভুত দৃশ্য জায়গাটার।

হঠাৎ ডাক্তারের উচ্চকণ্ঠ হাসির সঙ্গে নারীর মধুর কলধ্বনি কানে আসতে সচকিত হয়ে উঠলুম। সব চেয়ে আশ্চর্য, মানুষ কৈ? কোথাও তাদের চিহ্ন মাত্র নেই। বনজঙ্গল ও পাথর দিয়ে সেই হ্রদটিকে প্রকৃতি এমনভাবে আড়াল

করে সঙ্গোপনে রেখেছে যে সেখানে কে কি করছে, কিছুই দেখার উপায় নেই !

এই পর্যন্ত বলে মঞ্জু একটু থামতেই সরমা প্রশ্ন করে, তারপর ?

কণ্ঠে হাসির ঝিলিক্ তুলে মঞ্জু বলে, তারপর আর কি ? বুঝতেই পারছো ! আমিও ছাড়বার পাত্র নই। পাথরের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে নীচে নেমে, একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াতেই দেখি, ডাক্তার একটা জাঙ্গিয়া পরে সাঁতার কাটছে সেই নীল স্বচ্ছ হ্রদের জলে, আর তিনটি জংলী মেয়ে, সকলেই তরুণী, যুবতী, প্রায় উলঙ্গ তার সঙ্গে একত্রে স্নান করছে। হাসিতে গড়িয়ে পড়ে, মস্করা করে তারা কখনো বা জল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে ডাক্তারের চোখের ওপর, কখনো বা পেছন থেকে তাঁর একটা পা টেনে ধরেছে, কখনো বা একটা মেয়ে কোন পাথরের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাঁর ঘাড়ের ওপর।

একটু পরে দেখি সহসা জল থেকে একটা মেয়ে পাথরের ওপর লাফিয়ে উঠতেই ডাক্তারও তার পিছু নিলে। তারপর সেও যত ছোটে ডাক্তারও তত ছোটে।

একটু পরেই ডাক্তার তার ভিজে দেহটাকে ধরে ফেলতেই হাসিতে লুটো-পুটি খেয়ে এলিয়ে দিলে যেন সে দেহটা ডাক্তারের বুকের ওপর। তারপর তারা দু'জনে নিকটেই একটা পাথরের আড়ালে লতাপাতায় ঘেরা, ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো !

এই পর্যন্ত বলে মঞ্জু যে চুপ করে গিয়েছিল, তা বুঝতে পারে নি সরমা। একটু পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরমা হঠাৎ বলে ওঠে, তারপর ?

তারপর আর কি ? সেইদিন রাত্রে তখন বোধহয় রাত দুটো কি আড়াইটে হবে, বাথরুমে উঠেছি, হঠাৎ মনে হল কে যেন কাঁদছে। চাপা গোঙানির আওয়াজ আসছে ডাক্তারের শোবার ঘরের দিকে থেকে।

কৌতূহল চাপতে না পেরে পা টিপে টিপে জানালার পাশে যেতেই কানে এলো ডাক্তারের স্ত্রীর কথা। আমি আর পারছি না, এইভাবে অভিনয় করতে ! সকলের ধারণা একই ঘরে একসঙ্গে আমরা বাস করি। অথচ তুমি যে আমাকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রেখেছো, তা কেউ জানে না। আমিও জানতে দিই না। কিন্তু আর পারছি না। আমারও ধৈর্যের সীমা আছে ! আমি আরো দশজনের মত ছেলেপিলের মা হতে চাই ! বলে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

ডাক্তার এবার দাঁতে দাঁতে চেপে অভিসম্পাত দেবার ভঙ্গীতে বললে, কিন্তু

কতকগুলো রুগ অসুস্থ সন্তানের আমি বাপ হতে চাই না। একশোবার তোমায় বলেছি, আবার আজ বলছি। 'গেট্ আউট্!'

আমায় দয়া করো। বলে যেমন ডাক্তারের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লো বৌটি, অমনি ডাক্তার তাকে ঘর থেকে ঠেলে বার করে দিয়ে ঘরে খিল এঁটে দিলে।

'ছিঃ!' মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো সরমার।

মঞ্জু বললে, অথচ এদের স্বামী-স্ত্রীকে দেখলে কে বলবে যে এদের মধ্যে এতখানি ফাঁকি রয়েছে আসল ব্যাপারে! আর ডাক্তারবাবু কি ভদ্র, কি মিষ্টভাষী!

একে তুমি ভদ্র বলো! আমি ত বলি ভদ্রতার মুখোশ আঁটা একটা পশু, জানোয়ার! আমি হলে অমন স্বামীর মুখে ঝাড়ু মেরে চলে যেতুম!

মঞ্জু বলে, তুমি রাগ করো না ভাই। ডাক্তারবাবুকেও খুব দোষ দেওয়া যায় না। আমি খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছি। বৌটি শিক্ষিত, দেখতে সুন্দরী, গানবাজনা জানে—সবই ঠিক, কিন্তু বড্ড রোগা।

সরমা প্রতিবাদ করে, তার এতগুলো গুণ সব ভেসে গিয়ে কেবল রোগা হওয়ার অপরাধটা সকলের চেয়ে বড় হয়ে উঠলো? যদি বিবাহের ব্যাপারে স্বাস্থ্যটাকেই তিনি এতখানি প্রাধান্য দেন, তাহলে ওই জংলী কোন মেয়ের গলায় মালা দিলেই পারতেন। এদিকে মনে ষোল আনা শখ, স্ত্রী শিক্ষিতা হবে, সুন্দরী হবে, গান গাইতে পারবে, নাচতে পারবে! এই শ্রেণীর ভণ্ড পুরুষ-গুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না!

একটু চুপ করে থেকে মঞ্জু জবাব দিলে, তুমি ভাই এখনো বিয়ে করোনি তাই এত সহজে ওকথা বলতে পারছো। আমার ধারণা বিবাহিতা হলে বলতে পারতে না। বাস্তবিক পক্ষে মেয়েদের স্বাস্থ্যটাই সর্বপ্রথম ও প্রধান, আর সবই গৌণ! ওই গুণগুলো আধুনিক মেয়েদের শুধু অলঙ্কারের সামিল। ওগুলো দেহের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলবার জন্যে, তার দৈন্যকে ঢাকবার জন্যে নয়!

সরমার কণ্ঠ এবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বলে, তার মানে বলতে চাও যে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা ভুল।

মঞ্জু একটু ভেবে জবাব দেয়, না, তবে লেখাপড়া শিখতে গিয়ে স্বাস্থ্যটাকে জলাঞ্জলি দেওয়াটা ভুল, এটাই আমি বলতে চাই।

অর্থাৎ দুধও চাই, আবার তামাকও চাই! এই ত!

ফিক্ করে এবার হেসে ফেললে মঞ্জু। কিন্তু লক্ষ্য করলে সরমার মুখটা সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে।

মঞ্জু আবার বলে, কিন্তু তুমি যাই বলো ভাই ডাক্তারবাবুকে চোখে দেখলে তোমাকে এ মত পরিবর্তন করতে হতো, এমন 'হেল্‌দি' পুরুষ সত্যি খুব কমই দেখা যায়।

থামো, থামো। ওরকম ঢের 'হেল্‌দি' পুরুষ দেখেছি! বলে সরমা মুখটাকে ঘুরিয়ে পাহাড়ের দিকে ফিরিয়ে নিলে। দপ্ করে তার চোখের সামনে এক লহমার জন্যে বুঝি শুভেন্দুর সেই বলিষ্ঠ দেহটা ফুটে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল!

॥ ৪০ ॥

স্টেশনের কাছ পর্যন্ত একসঙ্গে এসে তারপর দু'দল দুদিকে বেঁকে যায়। একদল যায় উত্তরে আর একদল তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে তাই রক্ষা। চিন্তাহরণবাবু ও বিপিনবাবু মেয়েদের পিছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গেলেও লেভেলক্রসিংটা দেখে যেমন থমকে দাঁড়ান তেমনি যতক্ষণ না মেয়েদের দল এসে পৌঁছয় চিন্তাহরণবাবুর মুখ থামে না। পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যাতে একটি মিনিটও বৃথা অপব্যয় না হয় সেদিকে তিনি সজাগ থাকেন।

যেদিন বেড়াতে বেরিয়ে চিন্তাহরণবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, সেদিন বিপিনবাবুর বেড়ানোর আনন্দটুকু যাকে বলে একেবারে মাটি। তাই তাঁকে এড়াবার জন্যে ইদানীং পূর্বে যাবার ইচ্ছা থাকলে বিপিনবাবু বলতেন, পশ্চিম দিকে যাবো মনে করছি। কিন্তু তাতেও সবদিন রেহাই পেতেন না। কোন্ যাদুমন্ত্রে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, সব দিকগুলো যে এসে একটা বিন্দুতে মিলে যেতো তা ঈশ্বর জানেন। বেশ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হয়ত দূর পাহাড়ের কোন একটি মাথায় অস্তগামী সূর্যের অপূর্ব বর্ণচ্ছটার দিকে তাকিয়ে আছেন অমন সময় পিছন থেকে হঠাৎ সেই ভারী গলার সম্বোধন, কি, সিনারী দেখছেন!

বলাবাহুল্য তারপরেই শুরু হয় বাজতে, ভাড়াকরা এম্‌প্লিফায়ারের রেকর্ডের মত, সেই পচা রাজনীতি, আর সমাজনীতির বক্তৃতা। সেই জওহরলাল, কাশ্মীর, ক্রুশ্চেভ, কেনেডী ইত্যাদি ইত্যাদি! প্রথম যেদিন চিন্তাহরণবাবুর সঙ্গে

আলাপ হয়, তাঁর মুখ থেকে যা শুনেছিলেন সেই একই বিষয়বস্তুর চর্বিত চর্বণ।

সেদিন বিদায় নেবার পূর্বে হঠাৎ পোড়া চুরুটের টুকরোটা মুখ থেকে টেনে নিয়ে তিনি বললেন, কাল কোন্‌দিকে যাবেন স্থির করেছেন বিপিনবাবু?

বিপিনবাবু একটু থেমে উত্তর দিলেন, মনে করছি কাল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যাবো। অনেক দূরে থাকেন তিনি। রোজই ভাবি যাবার কথা কিন্তু এতটা দূর পথ বলে আর হয়ে ওঠে না।

এত দূর যদি তাহলে যাবার দরকার কি কষ্ট করে! আপনার কি কোন 'রিলেটিভ্' হন যে যেতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে? বলে এক মুখ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে ডান হাতের লাঠিটার ওপর একটু কাত হয়ে দেহের ভারটা রাখতে রাখতে বলেন, আমি মশাই একটু বেয়াড়াধরনের লোক, কার সঙ্গে কোথায় একটু আত্মীয়তার সুর আছে কি নেই, অমনি তাই নিয়ে মাতামাতি একেবারে পছন্দ করি না।

বিপিনবাবু বলেন, না না। উনি আমার আত্মীয় নন, সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিন হঠাৎ সাউজীর দোকানে আলাপ হয়। আমি ত তাঁকে এখানকার কোন আদিবাসী ভেবেছিলুম, শেষে তিনি নিজে এসে বাঙ্গালী বলে যেচে আলাপ করেন এবং একদিন তাঁর বাড়ীতে যেতে বলেন। তিনি নাকি এখানে বারোমাস থাকেন!

মোটা লোমশ ভ্রূ কুঁচকে চিন্তাহরণবাবু তাকিয়ে থাকেন বিপিনবাবুর মুখের ওপর। তারপর বলেন, কে বলুনত? কি নাম তাঁর!

নামটা ঠিক জানি না। তবে বলে দিয়েছিলেন, যে ওই পাহাড়ের নীচে শুরুজল বলে জায়গায় তিনি থাকেন। সেখানে গিয়ে বাগচীবাবু কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করলেই লোকে দেখিয়ে দেবে তাঁর ঘর।

'আই-সি'। আরে তাই বলুন! আপনি প্রফেসর পরিমল বাগচীর ওখানে যাবেন। আমি ত আপনার কথা শুনে এতক্ষণ অবাক হয়ে ভাবছিলুম, কে এমন বাঙ্গালী এখানে থাকেন যাকে আমি চিনি না!

বিপিনবাবু বলেন, আপনি চেনেন নাকি তাঁকে? আলাপ আছে তাঁর সঙ্গে?

বিলক্ষণ! কেবল আমার সঙ্গে কেন। আমার স্ত্রী, বৌমা, সবাই চেনেন তাঁকে। তারপরে চুরুটটাতে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ওঠেন, 'ওঃ হি ইজ এ জিনিয়াস্, ইউ মাস্ট সি হিম্।'

এঁ্যা। উনি প্রফেসর নাকি ?

হাঁ। লণ্ডনের ডি, এস সি। এককালে সায়েন্স কলেজের নাম করা প্রফেসর ছিলেন। ডাঃ পি, সি, রায়ের হাতে গড়া ছাত্র। হঠাৎ মাথায় কি খেয়াল চাপলো, বললেন, ব্যাক্ টু নেচার! আবার সেই বনে জঙ্গলে ফিরে যেতে হবে! নইলে বিজ্ঞান যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে মানুষ বলতে শুধু কয়েকটা জৈবিক প্রবৃত্তিকে বোঝাবে, শিগগির মানুষ তার সুকুমার বৃত্তিগুলো সব হারিয়ে ফেলবে!

বলেন কি! কণ্ঠে বিস্ময় চেপে রাখতে পারেন না বিপিনবাবু। এত বড পণ্ডিত! বাইরে থেকে ত কিছু বোঝবার উপায় নেই। আমি ত আগে ভেবেছিলুম, এখানকার আদিবাসী হো মুণ্ডাদের মত কেউ হবে! বেশভূষা, এমন কি কথাবার্তাও সব তাদেরি মতন!

চিন্তাহরণবাবু আবার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। 'হি ইজ এ ওয়ানডারফুল ম্যান।' জীবনটাকে নিয়ে কিভাবে এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন চোখে না দেখলে, বোঝানো যাবে না। জানেন, ব্যাক টু নেচার থিওরীকে সপ্রমাণ করার জন্যে একটা অশিক্ষিত সাঁওতাল মেয়েকে বিয়ে করেছেন। সাত আটটি, কি আরো বেশী তাঁর সন্তান হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে মনে কোন দুশ্চিন্তা বা খেদ নেই। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, বাপ সবাই মিলে একসঙ্গে চাষ-আবাদ করে দিব্যি সুখে আছেন।

বিপিনবাবু বলেন, আশ্চর্য মানুষ ত! আমাকে আভাসেও এ সব কিছু জানতে দেননি। শুধু যখন শুনলুম এখানে বারোমাস বাস করেন, তখন জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এখানে কোন চাকরী-বাকরী করেন? একটু হেসে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর জবাব দিলেন, না। আবার প্রশ্ন করলুম, তাহলে কি করেন? বললেন, কি আর করবো। আমাদের পূর্বপুরুষরা যা করতেন। অর্থাৎ সেই কুলকর্ম করি।

বিপিনবাবু বলেন, যাতে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে চোখে দেখে আসি সেজন্যে বোধহয় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, আসল কথাটা চেপে গিয়ে।

আপনি ঠিক ধরেছেন। অসাধারণ ব্যক্তি! নিশ্চয়ই যাবেন সেখানে।

সরমা বলে ওঠে, বাবা, আমরাও যাবো।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। সকলকে নিয়ে যাবেন। এত বড একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার আজকের দিনে সকলের চোখে দেখা উচিত!

শিক্ষণীয় না ছাই! পিছন থেকে ফোঁস করে ওঠেন চিন্তাহরণবাবুর স্ত্রী। যাবেন না ভাই মিছিমিছি গাঁটের কড়ি খরচা করে গা-গতর ব্যথা করতে।

সঙ্গে সঙ্গে গলাটাকে খাদে নামিয়ে এনে সরমার মাকে তিনি বলেন, উনি যাই বলুন, আমি ত ভদ্রলোকের মধ্যে শিক্ষা বা পাণ্ডিত্যের লেশমাত্র কোথাও খুঁজে পেলুম না। একটা সাঁওতাল মাগীকে নিয়ে ওই দুর্গম জায়গায় আড্ডা গেড়েছেন! এক গাদা ছেলে মেয়ে। যেমন মাগীটার ছিরি, তেমনি কুচ্ছিত ছেলে মেয়েগুলোকে দেখতে। কালো কালো ঠোঁট পুরু, কোঁকড়ানো চুল মাথাভর্তি। ঠিক আদিবাসীদের সন্তান বলেই মনে হয়, কোথাও এতটুকু পার্থক্য নেই। বলি এতগুলো পেট ত ভরাতে হবে! তাদের যখন পৃথিবীতে এনেছো, তখন খেতে ত দিতে হবে! তাই সব চেয়ে সহজ সে পথ, সেটাই তিনি বেছে নিয়েছেন। চতুর ব্যক্তি। আমি ত ভাই এর ভেতরে এত আহামরি করার কি আছে বুঝতে পারলুম না। জমিজমার কি মূল্য এখানে বুঝতেই ত পারছেন। তাই প্রয়োজন মত যতটা পেরেছেন তিনি কিনে নিয়ে চাষবাস, ক্ষেত-খামার করেছেন। গরু ছাগল, হাঁস, মুরগী পুষতে ত এখানে কোন খরচ লাগে না। চতুর্দিকে বন-জঙ্গল দেদার পড়ে আছে, চরে খাও। আর যে আ-গণ্ডা ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছেন তাদের কাজ কি! সব সময় তারা তাই বিনা পয়সায় মজুর খাটছে!

আঃ তুমি থামবে কি! ধমক দিয়ে উঠেন চিন্তাহরণবাবু।

মঞ্জু ফিসফিস করে শাশুড়ীকে বলে, আপনি চুপ করুন না মা। উনি যখন বারণ করছেন।

মঞ্জুর ননদ বলে, হাঁ মিছিমিছি এই রাস্তাঘাটে চেঁচামেচির দরকার কি মা। ওঁরা, যখন যাচ্ছেন সেখানে, নিজেরাই চোখে দেখে আসবেন সব। তোমার তাতে কি!

থমকে দাঁড়িয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে চিন্তাহরণবাবু এক পর্দা গলা চড়িয়ে দেন। এখানকার কোন মেয়েকে যদি বিয়ে করেই থাকেন ত কি অন্যায়টা করেছেন শুনি? তোমার বাঙ্গালীর ঘরের কোন মেয়ের সাধ্য ছিল না, ওইভাবে স্বামীর সঙ্গে এগিয়ে এসে তাঁর গবেষণায় সাহায্য করতে। তাছাড়া, এও তাঁর একটা এক্সপেরিমেণ্ট-এর বিষয়! জাত কুল ধর্ম মেনে, ঠিকুজী কোষ্ঠি মিলিয়ে এই যে সব বিয়ে হচ্ছে, তাতে ছেলেমেয়েরা বেশী সুখ শান্তি পায়, না, কোন কিছু বিচার না করে শুধু নারী, যে কোন একটা স্ত্রীলোক নিয়ে ঘর বাঁধলে সুখ বেশী নিজের জীবন দিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে এর সত্যতা তিনি

সপ্রমাণ করতে চান! দুপুরে না ঘুমিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তিনি লিপিবদ্ধ করে চলেছেন নিজের এই সব অভিজ্ঞতা মোটা মোটা বই লিখে।

সরমা উৎসাহিত হয়ে প্রশ্ন করে, বই লিখেছেন?

হাঁ। তবে এখনো ছাপা হয়নি কোনটা। আমার বিশ্বাস যেদিন তা হবে, জনসাধারণের চোখের সামনে সেদিন সুখশান্তির এক নূতন দিগন্ত খুলে যাবে।

মঞ্জুর শাশুড়ী আবার ফোড়ন কাটেন, হাঁ, সবাই তখন ওঁকে মাথায় নিয়ে ধেই ধেই করে নাচবে, তুমি দেখতে এসো।

সরমা প্রতিবাদ জানায়, কেন মাসিমা, তা কি সম্ভব হতে পারে না? জগতের বহু মনীষীর জীবনে, এরকম ঘটনা ঘটেছে!

মনীষী না ঘোড়ার ডিম! গজগজ করতে থাকেন তিনি, আমার যেন কিছু জানতে বাকী নেই। বিলেত থেকে ফিরে উনি যখন সায়েন্স কলেজে প্রফেসারী করেন, সেই সময় ভবানীপুরের এক ব্যারিস্টারের সুন্দরী এম. এ. পাশ-করা মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু নিজের লেখাপড়া নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকতেন লাইব্রেরীতে যে প্রতিদিন শুতে আসতে অনেক রাত হয়ে যেতো। একদিন শরীর খারাপ বোধ হওয়ায় সকাল সকাল ঘরে ফিরে দেখেন স্ত্রীর পাশে খাটে শুয়ে আছে তাঁর হিন্দুস্থানী চাকরটা! ওঁর সাড়া পাওয়ামাত্র, সে ব্যাটা পিছনের জানলা টপকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে, দে ছুট্। তখন একটা চাবুক নিয়ে বৌটাকে উলঙ্গ করে বেত মেরে তার সারাটা দেহ দাগ্ড়া দাগ্ড়া করে, তাকে ঘর থেকে দূর করে দেন জন্মের মত!

এর পর অবশ্য আর অনেকদিন বিয়ে-থা করেননি। শেষে গবেষণারত নিজেরই এক ছাত্রীর প্রেমে পড়ে তার গলায় মালা দিয়ে আবার সংসার পাতলে কি হয়, বেশী দিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি। সেই মেয়েটি তার মনের মানুষকে নিয়ে একদিন ওঁর ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন সমাজে মুখ দেখাতে না পেরে, চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতার শহর ছেড়ে, বিলেত না আমেরিকায় চলে গেছেন এটাই রটে ছিল। কিন্তু তিনি যে এইভাবে এখানে এসে ওই বনজঙ্গলের মধ্যে অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করেছেন, কে, জানতো! তাই মুখে উনি যত বড় বড় আদর্শের বুলি আওড়ান না কেন, এই হলো তাঁর আসল কাহিনী, যা কেউ জানে না।

সরমা শিউরে উঠে, তাই নাকি! কিন্তু আপনি এত সব জানলেন কি করে? আগে কি পরিচয় ছিল ওঁর সঙ্গে!

মঞ্জুর শাশুড়ী বলেন, না না। আমার মেজদার মুখে সব শোনা। ওই যে ছাত্রীটিকে পরে বিয়ে করেছিলেন, সে ওর পিসতুতো শালী। দাদার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ওই প্রফেসরের হাড়হদ্দ সবই জানে। এখান থেকে ফিরে দাদার কাছে একদিন গল্প করতে, তিনিই ত হাটে হাঁড়ী ভেঙ্গে দিলেন।

সরমার মা বলেন, আপনার স্বামী কিন্তু গদগদ!

ওঁর কথা বাদ দেন। দুনিয়ার কোন্ খবরটা উনি রাখেন শুনি!

বিপিনবাবু ও চিন্তাহরণবাবু গল্প করতে করতে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। পিছন থেকে স্ত্রীলোকদের কথাগুলো তাঁদের ঠিক শ্রুতিগোচর না হলেও, চিন্তাহরণবাবুর ভারীগলার আওয়াজ কিন্তু বেশ স্পষ্ট কানে আসছিল সরমার। তিনি ঠিক সেই মুহূর্তে বলছিলেন, সকালে উঠে খবরের কাগজের পাতাটা খোলামাত্র আত্মগ্লানিতে মনটা ভরে ওঠে। চতুর্দিকে শুধু দেখুন, জাল, জোচ্চুরি অন্যায়, অত্যাচার, নারীধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি কি নয়। বাস্তবিক এক এক সময় ভাবি এ কোন্ জগতে আমরা বাস করছি! এভাবে বেঁচে থাকার অর্থ কি! এই পচা পলিটিক্স আর ভুয়ো সমাজনীতি নিয়ে মাথা গরম করে শেষে রাতদুপুর পর্যন্ত 'স্লিপিং পিল্' খেয়েও যখন চোখে ঘুম আসে না, তখন মনে পড়ে এই প্রফেসর বাগচীকে!

উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠেন চিন্তাহরণবাবু, বাস্তবিক বলছি। এক একদিন রাত্রে এই সব চিন্তা করে মাথায় এমন রক্ত চড়ে যায় যে মনে হয়, 'হোয়াট ইজ লাইফ্'! জীবনটা কি! বাঁচাবার উদ্দেশ্য কি, বলতে পারেন বিপিনবাবু? ভোর থেকে শুরু করে রাত্রে যতক্ষণ না ঘুম আসে চোখে, শুধু অর্থ, যশ, বৃথা সুনামের পিছনে ছোটাছুটি করে ব্লাডপ্রেসার, হার্টডিজিস্, করনারী থ্রমবসিস্-এ অকাল মৃত্যুর নাম জীবন, না পরিমল বাগচীর মত তিলে তিলে এই রূপ রস গন্ধে ভরা ধরিত্রীকে উপভোগ করা—কোন্‌টা সত্যি বলতে পারেন?

সরমা মেয়েদের দলে পিছিয়ে থাকলেও, সে তার একটা কান সব সময় খোলা রেখেছিল।

চিন্তাহরণবাবুর ওই মন্তব্যগুলো, ছিটকে এসে কেবল কানের ভেতর দিয়ে তার মনে শুধু প্রতিধ্বনি তোলে না, মাঝে মাঝে তাকে কেমন যেন উন্মনা করে দেয়।

ডক্টর বাগচীর সম্বন্ধে যত কটুকাটব্য করুন মঞ্জুর শাশুড়ী তার মায়ের কাছে, তাতে সরমাকে নিরস্ত করতে পারে না বরং ভেতরে ভেতরে আরো বেশী অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। এতবড় যিনি পণ্ডিত, তাঁর মধ্যে ভালমন্দ দুই বিপরীত চরিত্রের একত্র সমাবেশ কি করে সম্ভব ; নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত কৌতূহল যেন কিছুতেই সম্বরণ করতে পারে না সরমা। তাই বাবাকে ও মাকে অনেক তোষামোদ করে শেষে রাজী করিয়ে পরের দিন একটা গো-যান ভাড়া করে গুরুজল অভিমুখে রওনা হয়।

॥ ৪১ ॥

সত্যি, প্রফেসার বাগচীর জীবনযাত্রা দেখলে ঈর্ষা হয়, চিন্তাহরণবাবু মিথ্যা বলেন নি। ও অঞ্চলে অনেক সুন্দর জায়গা এই ক'দিনে দেখেছিল সরমারা, কিন্তু ঠিক এই স্থানটির তুলনা হয় না। তিনি যে কতবড় প্রকৃতিরসিক, যার চোখ আছে, সে-ই বুঝতে পারে। বিপিনবাবু ও সরমা ত মুগ্ধ, এমন কি তার মার মুখেও সুখ্যাতি ধরে না। দু'দিকে উঁচু উঁচু পাহাড়, মাঝে উপত্যকার মত সুন্দর শস্যশ্যামল অনেকটা জমি। আর তারি মধ্যে ছোট ছোট চালাঘর কয়েকটা, ঠিক আদিবাসীদের ঘরের মতই, মাটির দেওয়ালের ওপরে খড়ের চাল, খটখটে, পরিচ্ছন্ন, নিকানো মুছানো। একটা পাহাড়ীঝর্ণা ঘরের পিছনে দিয়ে চলে গেছে অনেকদূরে, তাতে জল বেশী নেই কিন্তু নদীর মত একটা শীর্ণধারা কুল কুল শব্দে পাথরের নুড়িগুলোর ওপর দিয়ে যেন ঝুমুর পায়ে নৃত্য করে চলেছে!

ওদের গরুর গাড়ীটা দেখতে পেয়ে প্রফেসার বাগচী আগেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। গাড়ীটা কাছে আসতেই তিনি বলে উঠলেন, আসুন, আসুন, আমি ভাবলুম বুঝি আপনারা চলে গেছেন কলকাতায়। নিশ্চয়ই আসতে খুব কষ্ট হয়েছে, পথঘাট বলতে ত কিছু নেই এদিকে। ওই চলতে চলতে আপনি যা তৈরী হয়েছে, তাও বর্ষার সময় ঠিক থাকে না। পাহাড়ের জল যখন প্রবল বেগে নামে, সব ভেঙেচুরে দিয়ে যায়, তখন আবার নিজেদের-ই মেরামত করতে হয়।

নমস্কার বিনিময়ের পর বিপিনবাবু কন্যা ও স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে

দিলে প্রফেসর বলেন, ভারী খুশি হলুম, এতদূর যে আপনারা কষ্ট করে এসেছেন।

সরমার মা বলেন, আপনার নাম অনেক শুনেছি, তাই একবার চোখে দেখতে এলুম আপনার কীর্তিকলাপ।

আপনাদের দেখার মত এখানে আর কি আছে বলুন।

কেন, জায়গাটি ত ভারী সুন্দর!

প্রফেসর হেসে বলেন, এখানে এরকম জায়গার ত অভাব নেই। পথে আসতে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন।

সরমা বলে, করেছি। কিন্তু আপনারটাই 'বেস্ট'।

মৃদু হেসে জবাব দেন তিনি, অবশ্য আরো অনেকে আমাকে একথাই বলেন। যাক আপনাদের যে ভাল লেগেছে তাতেই আমার আনন্দ! ওগো কোথায় গেলে তোমরা সব।

বলতে বলতে তাদের সঙ্গে করে বাড়ীর ভিতর গিয়ে ঢোকেন, তারপর চোখটা ঘুরিয়ে এঘর ওঘর যেন কাকে খুঁজতে লাগলেন।

একটু পরে খাটো সাড়ীর অর্ধেকটা পরে এবং বাকী অর্ধেকটায় দেহের সম্মুখভাগটা মাত্র ঢেকে একটি কালো কুচকুচে রঙের মেয়ে, মাটির কলসী মাথায় করে ঝর্ণার জল নিয়ে এসে দাঁড়ালো। তিন-চারটি সাত, আট, বারো বছরের ছেলে-মেয়েও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এসে হাজির হলো। সকলের-ই গায়ের রং কালো এবং নেংটিপরা! যেমন ওখানকার আদিবাসী ছেলেমেয়েরা হয়, ঠিক তেমনি দেখতে।

ডক্টর বাগচী বলেন, এই আমার স্ত্রী, জল আনতে গিয়েছিল ঝর্ণায়, আর এরা সব ছেলেমেয়ে বুঝতেই পারছেন।

ওরে যা একটা চৌপাই নিয়ে আয় ঘর থেকে, এঁরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখতে পাচ্ছিস না?

বৌটি জলের কলসীটা চট্ করে ঘরের মধ্যে রেখে যখন বেরিয়ে এলো, সরমা ও তার মা দু'জনেরই বিস্ময় চোখে মুখে। কি নিটোল আঁটসাঁট দেহ। কে বলবে এতগুলো সন্তানের মা!

বিপিনবাবু বলেন, না না থাক। এতক্ষণ ধরে গাড়ীতে বসেই ত আমরা এসেছি! একটু বেড়িয়ে দেখি আপনার ক্ষেত-খামারগুলো।

হাঁ—হাঁ— সেই ভালো। চলুন তাহ'লে।

প্রফেসরের সঙ্গে ওরা বাইরের দিকটা ঘুরে ফিরে দেখে এলে, তখন তাঁর স্ত্রী সরমা ও তার মাকে নিয়ে বাড়ীর ভেতরটা দেখাতে থাকে। এইটা ঢেঁকীশালা, এইটা গোয়াল ঘর, এইটা শোবার ঘর, এইটা রান্নার জায়গা ইত্যাদি ইত্যাদি। শোবার ঘরের ভেতরটায় ঢুকে চারিদিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে সরমার মা প্রশ্ন করলেন, তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি ভাই ?

আটটি, কোন রকম সঙ্কোচ না করেই উত্তর দিলে।

সবগুলিই তোমার কাছে থাকে ত ?

হাঁ। বলে সে হেসে ফেললে।

আচ্ছা ভাই, তোমার বয়েস এখন কত হবে ?

এই এককুড়ি সাত !

কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমাদের।

তা এই চোদ্দ বছর হবে।

এবার সরমা একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, কিছু মনে করবেন না ত ?

না না। মনে করবো কেন। কি বলুন ?

আচ্ছা, এত বড একজন বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তি, ডবলেরও বেশী যাঁর বয়েস, তাঁর সঙ্গে ঘর করতে কোন অসুবিধা হয় না !

অসুবিধা ! কিসের অসুবিধা ? কৈ আমার ত কোনদিন সেকথা মনে হয়নি ! বলে হেসে ফেলে বৌটি। সহজ, সুন্দর প্রাণোচ্ছল হাসি। তবে জানি না, ওঁর কিছু হয়েছে কিনা, সেকথা ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন ? বলে মুখের হাসি চাপতে গিয়েও পারে না। বরং আরো বাড়ে।

চকিতে সরমার মনে পড়ে, ঠিক এইরকম হাসি সে দেখেছিল, ফুলডিহীতে সেই সাঁওতাল বৌটার মুখে।

বাড়ীতে ফিরে এলে সরমার মনের মধ্যে সব যেন কেমন গণ্ডগোল হয়ে যায় ! সে নিজে যতটুকু চোখে দেখেছে তাতে বুঝতে পেরেছে যে প্রফেসর সত্যিকারের সুখী ! কিন্তু ওই বুড়ো এত বড় একজন পণ্ডিতব্যক্তি ওই জংলী নিরক্ষর মেয়ের সঙ্গে একত্রে সুখে-শান্তিতে দীর্ঘদিন কি করে বাস করছেন, এটা তার কাছে কেবল দুর্বোধ্য নয়, একটা হেঁয়ালীর মত মনে হয় !

॥ ৪২ ॥

চিন্তাহরণবাবুরা শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে কলকাতায় ফিরবেন শুনে সরমারা আগেই স্থির করে রেখেছিল, সেদিন বেড়িয়ে ফেরবার পথে একেবারে প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওদের বিদায়-অভিবাদন জানিয়ে আসবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিপিনবাবুর পেটটা সেদিন হঠাৎ খারাপ হওয়ায়, ওরা আর কেউ বেড়াতেই বেরোয় নি। সরমাকে তাই ওর মা বলেন, তুই বরং মালীকে সঙ্গে নিয়ে একবার যা, চট করে স্টেশন থেকে ওদের সঙ্গে দেখা করে চলে আয়। বলিস বাবার শরীরটা খারাপ বলে মাও আসতে পারলেন না।

সরমা জবাব দেয়, তোমরাই যখন যাচ্ছো না, আমি আর গিয়ে কি করবো।

না—না—তবু একটা ভদ্রতা আছে ত? সেদিন বড়মুখ করে মঞ্জুর শাশুড়ী আমায় বললেন, যাবার দিন দেখা হবে ত দিদি প্ল্যাটফর্মে?

সরমা বলে, হাঁ মা, মঞ্জুও আমায় বলেছিল, বেশ লাগে যদি অনেক লোক আসে প্ল্যাটফর্মে 'সি-অফ্' করতে। গাড়ী ছেড়ে দেবে, আমরা ভেতর থেকে হাত নাড়বো, আর বাইরে থেকে সবাই রুমাল নাড়তে থাকবে—ট্রেনটা ধীরে ধীরে সকলের চোখের ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

তবে, তোকেও ত বলেছিল। যা না?

অগত্যা নান্দুয়াকে সঙ্গে নিয়ে সরমা রওনা হয়।

ট্রেনের তখনো দেরী ছিল, পুল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে স্টেশন-প্রাঙ্গণে পা দিতেই সরমা চমকে ওঠে। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না। সত্যি ওকি শুভেন্দু, ওই যে টিকিট-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যানিব্যাগের মধ্যে টিকিট ভরে জামার ভেতরের পকেটে গুঁজে রাখছে! সহসা ওর বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ শব্দ শুরু হয়, এবং নিমেষে তা ঠেলে ওর গলা পর্যন্ত উঠে ওকে যেন বাক্‌রুদ্ধ করে দেয়।

ম্যানিব্যাগটা রেখে সামনের দিকে তাকাতেই শুভেন্দুর চোখের পাতাদুটো বুঝি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সেও বুঝি বিশ্বাস করতে পারে না চোখকে, তার সামনে কি দাঁড়িয়ে সরমা!

অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ!

মুহূর্তকয়েক দু'জনে তেমনি নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। প্রথম কথা

বললে সরমা, এ কি শুভেন্দু, তুমি যে এখানে ?

তোমার কাছে আমারও সেই একই প্রশ্ন, সরমা !

আমি এখানে চেঞ্জ-এ এসেছি দু'মাসের জন্যে।

আমার বাবা-মায়াও একমাস হলো এখানে এসেছেন, আজ ভোরের গাড়ীতে আমি এসেছি তাঁদের নিয়ে চলে যেতে। বলে একটু থেমে শুভেন্দু এবার প্রশ্ন করে, তোমরা কোন্ বাংলায় উঠেছো সরমা ?

এখন তা জেনে আর কি হবে তোমার !

না, এমনি। তবু কোন্‌দিকে তোমরা আছো, এ জায়গাটা আমার বিশেষ পরিচিত কিনা। বার কয়েক এসেছি ! তাই জিজ্ঞেস করছিলুম। আমরা এখানে এলেই উঠি কুসুম কাননে !

কুসুম কানন ! হঠাৎ যেন ইলেক্‌ট্রিকের 'শক্' খেয়ে শিউরে ওঠে সরমা। তার মানে চিন্তাহরণবাবুদের বাংলা !

হাঁ, উনিই ত আমার বাবা।

তাই নাকি ! বলে সঙ্গে সঙ্গে যেন নিষ্প্রভ হয়ে যায় সরমা। দীর্ঘ দিনের রোগে ভোগা অসুস্থ ব্যক্তির মত সমস্ত শরীরটার ভেতর যেন ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে ! এর পর কি বলবে যেন ভেবে পায় না সে। তবু শুষ্ক কণ্ঠে বলে ওঠে, তাহলে মঞ্জু তোমার—বাক্যটা আর সম্পূর্ণ উচ্চারণ করতে পারে না।

শুভেন্দু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, হাঁ সে আমার স্ত্রী ! তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি !

থর থর করে ঠোঁটের ভেতরের দিকটা কাঁপতে থাকে সরমার। বার কয়েক ঢোক গিলে শুকনো জিবটা ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নিয়ে সে শুভেন্দুর চোখের ওপর সোজা তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, সত্যি জবাব দেবে !

বলো, কি ?

মনে আছে একদিন তুমি বলেছিলে সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না কোন অভিজাত বংশের মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবে না ! অথচ প্রেমে পড়ে যার গলায় মালা দিয়ে ঘরে এনেছো, তার মধ্যে কি সেরকমের কোন গুণ আছে !

ঠোঁটের একটা কোণ চেপে শুভেন্দু কি যেন ভাবে। তারপর উত্তর দেয়, সে রকমের কোন গুণ নেই সত্যি। তবে তার চেয়ে বেশী অনেক বড় যে গুণের সে অধিকারিণী, সেটা বোধহয় তুমি লক্ষ্য করোনি !

কণ্ঠে বিদ্রূপ চেপে সরমা বলে, সেই বড় গুণটা কি, যা আমাদের কারুর চোখে পড়ে না কেবল তুমিই দেখতে পাও, তোমার মুখ থেকে শুনতে পারি কি ?

স্বাস্থ্যসম্পদ! স্বাস্থ্যশ্রী! শিক্ষাদীক্ষা, রূপ, আভিজাত্য সব কিছু তুচ্ছ যার কাছে বলে আমি করি।

মিথ্যে কথা! তাই যদি হতো তাহলে গোবর গামার মত কোন পালো-য়ানের ঘরে মেয়ে খুঁজতে যেতে! আমি সব জানি। সব শুনেছি। ছিঃ, তুমি এতো নীচে নামতে পারো আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। তোমার সম্বন্ধে আমার মনে যে উঁচু ধারণা ছিল এখন দেখছি সব ভুল।

একে যদি নীচে নামা বলো, তাহলে তার জন্যেও দায়ী তুমি এবং তোমাদের মত সব মেয়েরা।

'ইউ আর এ লায়ার'। ক্ষিপ্তের মত চেঁচিয়ে ওঠে সরমা। এর চেয়ে বড মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। আসলে তোমরা সব মাংসাশী জীব! 'ফ্লেশ এণ্ড ব্ল্যাড' ছাড়া আর কিছু বোঝো না, চাও না। মুখে শুধু ভণ্ডামীর বুলি আওড়াও, শিক্ষিতা, কার্লচার্ড মেয়ে চাই। থর থর করে কাঁপতে থাকে সরমার কণ্ঠ। বলে, ওই অসভ্য জংলীদের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই তোমাদের। বরং তারা একটা জায়গায় খাঁটি। যা চায়, মুখে তা স্পষ্ট করে বলে এবং কাজে দেখায়। তোমাদের মত সভ্যতার মুখোশ পরতে জানে না, শেখেনি!

বলেই, তার দিকে পিছন ফিরে তর তর করে পুলের সিঁড়িতে উঠে গেল।

শুভেন্দু নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো, মুখে একটা কথাও কইল না।

সরমা পুল পেরিয়ে যেমন এপারে এসেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই আবার ওপারে চলে যায়। পিছন ফিরে আর একবারও তাকায় না!

॥ ৪৩ ॥

সেদিন থেকে সরমার মনে কেমন একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। খাওয়া, বেড়ানো, ঘুমনো, কোন কিছুতেই যেন আর সে আনন্দ পায় না। সব কাজে কেমন নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম মনে হয়। শুভেন্দু তার মনের আদর্শ দৃঢ়তা সব কিছু যেন ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেছে।

শুভেন্দুর সঙ্গে তার বিয়ের কোন আশাই ছিল না। কিন্তু তবু সে যদি সরমার চেয়ে বেশী বিদুষী, বেশী রূপসী, কোন ধনীর কন্যাকে বিয়ে করতো, তাহলে হয়ত অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করতো সরমা। মঞ্জুর মত একটা নেহাতি অর্ডিনারী স্কুলফাইন্যাল পাশ দরিদ্রের মেয়েকে যেচে কেবলমাত্র স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে বিয়ে ক'রে, শুভেন্দু যেন ইচ্ছা করে অপমান করেছে সরমাকে। তার শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি মান সম্ভ্রম সব কিছুকে পা দিয়ে থেঁত্‌লে মাড়িয়ে, দলে দিয়ে চলে গেছে সে। তাই সে-জ্বালা কিছুতেই সে ভুলতে পারে না। সর্বক্ষণ কিসের একটা যন্ত্রণা যেন দেহের শিরায়-উপশিরায় অনুভব করে!

সপ্তাহখানেক এইভাবে কেটে যায়।

মনকে আবার এক-একদিন নিজেই বোঝায়, কি সম্পর্ক শুভেন্দুর সঙ্গে তার? বিয়ে করার একটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তাকে দিয়ে সে ডুব মেরেছিল। সে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড! প্রতারণা করেছে তার সঙ্গে। তারপর—তার রুচিমত একটা মেয়েকে সে বিয়ে করেছে। তাতে তার কি বয়ে গেল! এমন ত কত ছেলের সঙ্গে কত মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, প্রতিদিন। কৈ, তার জন্যে ত ওর মনে এতটুকু রেখাপাত করে না, তবে কেন এক্ষেত্রে এমন হয়!

শুভেন্দু তার সঙ্গে এতখানি প্রবঞ্চনা, এত বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও, কেন মনের মধ্যে থেকে তার বিষাক্ত স্মৃতি সে নির্মূল করে দিতে পারছে না! এ দুঃসহ যন্ত্রণার কথা কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারে না। শুধু যেন বুকের মধ্যে ইঁটের পাঁজার মত তা নিঃশব্দে পুড়তে থাকে।

সমস্ত ধানোয়ার রোডটা তার কাছে যেন বিষাক্ত হয়ে ওঠে। যে পাহাড়, যে গাছপালা, নদী, ফুল লতাপাতার সে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল আজ তাদের দিকে আর তাকাতে ভাল লাগে না। দীর্ঘশ্বাস পড়ে, বুকে একটা যন্ত্রণা অনুভব করে সরমা। ওখান থেকে যেন পালাতে পারলে সে বাঁচে।

ঠিক যখন এই রকম মানসিক অবস্থা তখন একদিন ভোর হতে না হতেই মাদলের সঙ্গে বেজে ওঠে বাঁশের বাঁশী। তার সঙ্গে গানের সুর দেখতে দেখতে পথে ঘাটে বাড়ীতে বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ে। উৎসবের বুঝি ধুম লেগে যায়।

এ তোমাদের কিসের উৎসব? সরমা জিজ্ঞেস করে নান্দুয়াকে।

নান্দুয়া বলে, 'বাহা' দিদিমণি।

'বাহা!' সে আবার কি!

ওর নাম ফুলের উৎসব!

সহসা সরমার মনে পড়ে যায় বসন্ত উৎসবের কথা। এখানের সমস্ত প্রকৃতি আজ ফুলের সাজে সেজেছে। তাই বাঁশী বাজছে, মাদলের তালে তালে নৃত্য গীতের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে দিক্‌-দিগন্তে। মেয়ে-পুরুষ যে যত পেরেছে হাঁড়িয়া গিলেছে! যুবক যুবতী দলে দলে চলেছে, নতুন সাজ পরে। হাঁড়িয়া খেয়ে তারা এত মাতাল হয়েছে যে রঙে রসে সব টলমল করছে। আনন্দের পেয়ালা যেন উপচে পড়ে তাদের দেহে মনে।

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আজ লজ্জা, সরম বলতে কিছু নেই। এ উৎসব সবাইকে যেন বেপরোয়া করে দিয়েছে। যার যাকে ভাল লাগে কোমর ধরে নাচছে, গাইছে, ঢলাঢলি করছে।

কিন্তু অদ্ভুত সে গানের ভাষা। কিছুই বুঝতে পারে না সরমা। তবু ভাল লাগে যেন শুনতে—

"হেসা মা চটেরে
যা গোঁসাই তুদে দয় রাগে কান্
বাড়ে মা লাড়েরে
যা গোঁসাই গোক্রত্ত্‌ দয় সাহেদা"

হঠাৎ মনে পড়ে সরমার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে পাঁচ টাকা, দশ টাকার টিকিট বিক্রী করে বিশ্বভারতীর 'বসন্ত উৎসব'এর কথা। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেখে তবে বোঝা যায় যে বসন্ত এসেছে! আর এখানে! বাস্তবিক সার্থক নাম এই উৎসবের। বাঃ চমৎকার! 'বাহা' অর্থাৎ ফুলের উৎসব! যেদিকে তাকাও ফুল ফুটে রয়েছে গাছে গাছে।

সরমা একসময় নান্দুয়াকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মাঝী, ওই যে গানটা গাইছে ওরা, ওর কি মানে বলতে পারো?

হাঁ—পারবো না কেন দিদিমণি। ও ত আমাদের পরবের গান। সবাই জানে। বলে সে নিজেই সুর ধরে—

'হেসা মা চটেরে।
যা গোঁসাই তুদে দয় রাগে কান্।'

অর্থাৎ: অশ্বত্থ গাছের ডালের ওপরে রে গোঁসাই পাখীটা বসে বসে কাঁদছে।

'বাড়ে মা লাড়েরে
যা গোঁসাই গোক্রত দয়—সাহেদা।

মানে:—বটগাছের কচি কিশলয়ের ওপরে রে গোঁসাই, ছোট পাখীটা বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে।

এই বলে একটু থেমে নান্দুয়া আবার বলে, এ গানটার মূল অর্থ হলো এই যে পাখীরা সব আজ বিলাপ করছে। কারণ তাদের দিন শেষ হয়ে গেল! এখন আবার নতুন ঋতু আসছে, নতুন পাখীরা আসবে তার গান করতে!

সরমা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, বাঃ চমৎকার 'আইডিয়া' ত! পাখীরা কাঁদছে তাদের দিন ফুরিয়েছে বলে। নতুন ঋতু আসছে, আবার নতুন পাখীরা আসবে তার গান করতে!

নিমেষে সরমা যেন এক নতুন প্রেরণা লাভ করে। তার মনের ভেতর বার বার সেই গানের বাণীগুলো নিয়ে সে লোফালুফি করতে থাকে……

'হেসা মা চটেরে'……

সন্ধ্যা লাগার সঙ্গে সঙ্গে উৎসবটার অর্থ যেন বাস্তব রূপ ধারণ করে। সরমার খেয়াল ছিল না যে সেদিন মধু পূর্ণিমা! মেঘহীন নির্মল আকাশে যেন জ্যোৎস্নার প্লাবন লেগেছে। আকাশের পেয়ালা ছাপিয়ে তাই ঝরে ঝরে পড়ছে স্বর্গের সুধা। পাহাড়ের মাথায়, শালবনের সর্বাঙ্গে, পথে-ঘাটে, জঙ্গলে, নদী-নালায়—যেদিকে তাকায় সব যেন জ্যোৎস্নার ধারায় অবগাহন করে ভিজে দেহে দাঁড়িয়ে আছে। ফুলের গন্ধে সুরভিত চারিদিক। এরই মধ্যে মাদল বেজে চলেছে বাঁশী বেজে চলেছে, নৃত্যগীতের ধ্বনিতে একটানা সুর ছন্দিত হচ্ছে।

কি এক মাদকতা আছে যেন সেই সুরে। রাত যত বাড়ে সরমার কানে সেই সঙ্গীতের ধ্বনি কেবল মধুর থেকে মধুরতর হয়ে ওঠে, তার বাণী যেন এক নতুন অর্থ জাগায় তার মনে। ঘুম ভেঙে যায় বারে বারে। বিছানা কণ্টকশয্যা মনে হয়। তাদের অনেক সুখী বুঝি ওই অশিক্ষিত, অসভ্য, জংলীরা।

জীবনের উদ্দেশ্য কি! চিন্তাহরণবাবুর সেই প্রশ্নটা সহসা বেজে ওঠে তার কানের কাছে। নিমেষে মনের সঙ্গে লড়াই বাধে। বিরোধ শুরু হয় শিক্ষার সঙ্গে অশিক্ষার। ভণ্ডামির সঙ্গে সত্যের। কোন্‌টা সত্য কে বলে দেবে! দু'হাতে মাথার চুলগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদে সরমা পাগলের মত।

॥ ৪৪ ॥

সেদিন মাঝরাতে হঠাৎ বিপিনবাবুকে চীৎকার করে ডেকে তোলেন তাঁর স্ত্রী, ওগো শুনছো, শিগগির ওঠো।

ধড়মড় করে তাঁর বিছানা থেকে নেমে এলেন বিপিনবাবু। কি হয়েছে?

যা হবার তাই হয়েছে। বিছানা শূন্য, মেয়ে কোথায় চলে গেছে। ওই দেখ, ঘরের দরজাও খোলা!

যা ভীতু মেয়ে, একলা এতরাত্রে বাইরে বেরুবার মত সাহস ত তার নেই! তবে গেল কোথায়?

টর্চলাইট জ্বেলে, লাঠিটা হাতে করে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন বিপিনবাবু ও তাঁর স্ত্রী।

সরো, সরমা, বলে ডাকতে ডাকতে, বাগানের এপাশ ওপাশ খানিকটা খুঁজে এলেন তাঁরা। মেয়েকে না পেয়ে তখন বিপিনবাবুর স্ত্রী বলেন, মালীকে ডেকে নিয়ে এখনি তুমি থানায় গিয়ে ডাইরি করে এসো। ওমা, এত রাত্রে সোমত্ত মেয়ে একা কোথায় গেল! কেউ চুরি-চামারি করলে না ত? বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেলেন।

আঃ চুপ করো তুমি, কাঁদছো কেন আগে থাকতে?

ক'দিন ধরেই আমি লক্ষ্য করছি-ওর মনে যেন কি হয়েছে। ভাল করে খায় না, হাসে না, চুপচাপ গম্ভীর হয়ে একটা বই মুখে দিয়ে বসে থাকে। কতবার জিজ্ঞেস করেছি, হ্যাঁরে কি হয়েছে তোর, শরীর-টরীর খারাপ বোধ হচ্ছে? কিছুই হয়নি, বলে কথা উড়িয়ে দেয়। কিন্তু মায়ের চোখকে কি ফাঁকি দিতে পারে কখনো! বলতে বলতে আবার তিনি চোখের জল মুছতে থাকেন।

আঃ, আবার তুমি কাঁদছো। চুপ করো। চলো দেখি মালীকে ডেকে তুলি,

সে কি বলে।

নান্দুয়ার ঘরের কাছে গিয়ে ডাকতেই সে দরজা খুলে একেবারে বাইরে এসে দাঁড়ালো। কি বাবু, কি হয়েছে ?

তখন বিপিনবাবুর মুখ থেকে সব শুনে নান্দুয়া বলে, দিদিমণি ত অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দায় চাঁদের আলোতে বসেছিল, আমি দেখেছি।

সেই সময় হয়ত কোন বদমাইশ লোক মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। এমন ত হামেশাই হয় শুনতে পাই। সরমার মা বলেন।

নান্দুয়া বলে, আমাদের এখানে ত মা এমন শুনিনি কখনো।

তাহলে গেল কোথায় মেয়েটা। পাঁচ বছরের কচি খুকী নয়। সোমত্ত মেয়ে। তাই বলছি বাবা এখনি তুমি বাবুকে নিয়ে থানায় গিয়ে ডাইরি করে এসো। বেশী দেরী করলে হয়ত হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। বলতে বলতে তিনি ভুকরে কেঁদে উঠলেন।

চুপ করুন মা। থানা ত এখানে নেই। তিন ক্রোশ দূরে। তার চেয়ে বরং আমরা একবার আমাদের মোড়লের বাড়িতে যাই, সে কি পরামর্শ দেয় শুনি।

মোড়লের বাড়ি ! সে কত দূর ?

বেশী দূর নয়। ওই যে মাদল বাজছে, গান হচ্ছে সেইখানে। আজ ত 'বাহা' উৎসব। সারারাত ধরে সেখানে নাচ গান হল্লা হবে। গাঁয়ের মেয়ে মদ্দ সব আজ রাত জেগে গান নাচ করবে।

বেশ তাই চলো।

সেখানে সেই গান-বাজনার আড্ডায় গিয়ে বিপিনবাবু ও তাঁর স্ত্রীর চক্ষু স্থির! দেখেন, সরমা কতকগুলো আদিবাসী মেয়েদের সঙ্গে নাচছে, আর মাদলের তালে তালে পা মিলিয়ে মুখে সেই গান গাইছে, 'হেসা মা চটেরে—'

এই সরো, সরো—তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ! লজ্জা করছে না এদের সঙ্গে এমনি করে নাচতে। বলে সরমার মা খপ্ করে যেমন মেয়ের একটা হাত চেপে ধরতে গেলেন, অমনি সে মাকে ঠেলে দিয়ে বলে, যাও দূর হয়ে যাও, এখানে এসেছো কেন ?

ওমা, তুই হাঁড়িয়া খেয়েছিস্ নাকি। তোর গা দিয়ে যে গন্ধ বেরুচ্ছে রে।

বেশ করেছি-খেয়েছি। আরো খাবো। তোমার কি ?

হাঁগো, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে মেয়ের এই মাতলামী! মেয়েকে ধরে টেনে নিয়ে এসো। ছি ছি, যদি কোন ভদ্দরলোক দেখে ফেলে, কি মনে করবে!

সরমা খিল খিল করে হেসে ওঠে বলে, তোমার ভদ্দরলোকের মুখে আমি মারি সাত ঝাড়ু।

বিপিনবাবু বলেন, কি করবো তোমার মেয়ে ত কচি খুকী নয় যে কোলে করে তুলে নিয়ে যাবো!

ও বাবা নান্দু, তুই মেয়েটাকে ধরে নিয়ে আয় বাবা, আমি তোকে পাঁচ টাকা বকশিশ দেবো। সত্যি সত্যি কি মেয়েটা নেশা করে সারারাত ধরে ওদের সঙ্গে এমনি নাচবে!

বিপিনবাবু ধমক দিয়ে ওঠেন, ওর মন যদি তাই চায় ত করুক। তুমি বাধা দিয়ে কি করবে।

ওমা, এমন সর্বনেশে কথা তুমি বাপ হয়ে বলতে পারলে। কেঁদে ফেলেন আবার বিপিনবাবুর স্ত্রী। নেশার ঘোরে ও মাতলামি করে যা বলছে, তুমিও তাতে সায় দিচ্ছো! ছি ছি তোমার লজ্জা করছে না, মেয়েকে ওইভাবে নাচতে দেখে!

আজ এদের উৎসব। এদের সঙ্গে মিলেমিশে যদি একটু আনন্দ ক'রে ও শান্তি পায় মনে ত বাধা দিয়ো না।

যাও, তুমিও তাহলে ওদের কোমর ধরে নাচোগে। নইলে মেয়ের উপযুক্ত বাপ বলে পরিচয় দেবে কি করে। থাকো তোমরা বাপ-বেটিতে। আমি এ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখতে পারবো না। বলে নান্দুকে নিয়ে তিনি তখনিই বাসায় ফিরে যান।

ওরা চলে গেলে, নাচে গানে সবাই যেন আরো উন্মত্ত হয়ে ওঠে। হাত তালি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কোমর ধরে গান করে সরমা "হেসা মা চটেরে—"

মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বিপিনবাবু। জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতির বুকে, সেই নৃত্যগীত তাঁকে যেন এই পৃথিবী ছাড়িয়ে এমন এক নতুন জগতে নিয়ে যায় যেখানে শুধু রূপ, শুধু রস, শুধু আনন্দ!

শেষ